একালের ছোটগল্প সঞ্চয়ন

প্রাক্-স্নাতক বাঙ্‌লা পাঠপর্ষৎ
কর্তৃক সংকলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০২

সূচীপত্র

গল্পসূত্র

১. লম্বকর্ণ : পরশুরাম গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ; ২. পয়োমুখম্ : জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ; ৩. পুঁই মাচা : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ; ৪. না : তারাশঙ্করের গল্পপঞ্চাশৎ ; ৫. অমিতাভ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ; ৬. ছোটলোক : বনফুল-এর গল্প-সংগ্রহ দ্বিতীয় শতক ; ৭. সারেঙ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্বনির্বাচিত গল্প ; ৮. তেলেনাপোতা আবিষ্কার : প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প ; ৯. অঙ্গার : প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ গল্প ; ১০. হারাণের নাতজামাই : উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১১. ছিন্নমস্তা : আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প ; ১২. ফসিল : সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ (২য় খণ্ড) ; ১৩. চোর : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প ; ১৪. চড়াই-উৎরাই : নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী (২য় খণ্ড) ; ১৫. রেকর্ড : লক্ষ্মীর ঝাঁপি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ; ১৬. কানাকড়ি : সন্তোষকুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প ; ১৭. নিষাদ : বিমল করের শ্রেষ্ঠ গল্প ; ১৮. কিম্‌লিস্ : শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৬০।

লম্বকর্ণ

রাজশেখর বসু

রায় বংশলোচন ব্যানার্জি বাহাদুর জমিন্দার অ্যাণ্ড অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বেলেঘাটা-বেঞ্চ প্রত্যহ বৈকালে খালের ধারে হাওয়া খাইতে যান। চল্লিশ পার হইয়া ইনি একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছেন ; সেজন্য ডাক্তারের উপদেশে হাঁটিয়া এক্‌সারসাইজ করেন এবং ভাত ও লুচি বর্জন করিয়া দু-বেলা কচুরি খাইয়া থাকেন।

কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া বংশলোচনবাবু ক্লান্ত হইয়া খালের ধারে একটি ঢিপির উপর রুমাল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘড়ি দেখিলেন—সাড়ে-ছটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। সিলোনে মনসুন পৌঁছিয়াছে। এখানেও যে-কোনও দিন ঝড়-জল হওয়া বিচিত্র নয়। বংশলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া হাতের বর্মাচুরুটে একবার জোরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে—'হঁ হঁ হঁ হঁ!' ফিরিয়া দেখিলেন—একটি ছাগল।

বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছাগল। কুচকুচে কালো নধর দেহ, বড় বড় লটপটে কানের উপর কচি পটলের মত দুটি শিং বাহির হইয়াছে। বয়স বেশী নয়, এখনও অজাতশ্মশ্রু। বংশলোচন বলিলেন—'আরে এটা কোথা থেকে এল? কার পাঁঠা? কাকেও তো দেখছি না।'

ছাগল উত্তর দিল না। কাছে ঘেঁসিয়া লোলুপনেত্রে তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। বংশলোচন তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া বলিলেন—'যাঃ পালা, ভাগো হিয়াসে।' ছাগল পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সামনের দু-পা মুড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রায়-বাহাদুরকে ঢুঁ মারিল।

রায়বাহাদুর কৌতুক বোধ করিলেন। ফের ঠেলা দিলেন। ছাগল আবার খাড়া হইল এবং খপ করিয়া তাঁহার হাত হইতে চুরুটটি কাড়িয়া লইল। আহারান্তে বলিল—'অর্‌-র্‌-র্‌', অর্থাৎ আর আছে?

বংশলোচনের সিগার-কেসে আর একটি মাত্র চুরুট ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া দিলেন। ছাগলের মাথা-ঘোরা, গা-বমি বা অপর কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। দ্বিতীয় চুরুট নিঃশেষ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'অর্‌-র্‌-র'? বংশলোচন বলিলেন—আর নেই। তুই এইবার যা। আমিও উঠি।'

ছাগল বিশ্বাস করিল না, পকেট তল্লাস করিতে লাগিল। বংশলোচন নিরুপায় হইয়া চামড়ার সিগার-কেসটি খুলিয়া ছাগলের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—'না বিশ্বাস হয়, এই দেখ্ বাপু।' ছাগল এক লম্ফে সিগার কেশ কাড়িয়া লইয়া চর্বন আরম্ভ করিল। রায়বাহাদুর রাগিবেন কি হাসিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—'শশালা'।

অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। আর দেরী করা উচিৎ নয়। বংশলোচন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ছাগল কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। বংশলোচন বিব্রত হইলেন। কার ছাগল কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না, নিকটে কোনও লোক নাই যে জিজ্ঞাসা করেন। ছাগলটাও নাছোড় বান্দা, তাড়াইলে যায় না। অগত্যা বাড়ি লইয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পথে যদি মালিকের সন্ধান পান ভালই, নতুবা কাল সকালে যা হ'ক একটা ব্যবস্থা করিবেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে বংশলোচন অনেক খোঁজ লইলেন, কিন্তু কেহই ছাগলের ইতিবৃত্ত বলিতে পারিল না। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে আপাতত নিজেই উহাকে প্রতিপালন করিবেন।

হঠাৎ বংশলোচনের মনে একটা কাঁটা খচ করিয়া উঠিল। তাঁহার যে এখন পত্নীর সহিত কলহ চলিতেছে। আজ পাঁচ দিন হইল কথা বন্ধ। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ বিনা আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। সামান্য একটা উপলক্ষ্য, দু-চারটি নাতিতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ, তার পর দিন কতক অহিংস অসহযোগ, বাক্যালাপ বন্ধ, পরিশেষে হঠাৎ একদিন সন্ধিস্থাপন ও পুনর্মিলন। এরকম প্রায়ই হয়, বিশেষ উদ্‌বেগের কারণ নাই। কিন্তু আপাতত অবস্থাটি সুবিধাজনক নয়। গৃহিণী জন্তু-জানোয়ার মোটেই পছন্দ করেন না। বংশলোচনের একবার কুকুর পোষার শখ হইয়াছিল, কিন্তু গৃহিণীর প্রবল আপত্তিতে তাহা সফল হয় নাই। আজ একে কলহ চলিতেছে তার উপর ছাগল লইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না, একে মনসা, তায় ধুনার গন্ধ।

চলিতে চলিতে রায়বাহাদুর পত্নীর সহিত কাল্পনিক বাগযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একটা পাঁঠা পুষিবেন তাতে কার কি বলিবার আছে? তাঁর কি স্বাধীনভাবে একটা শখ মিটাইবার ক্ষমতা নাই? তিনি একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বেলেঘাটা রোডে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিস্তর ভূসম্পত্তি। তিনি একজন খেতাবধারী অনারারি হাকিম,—পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, এক মাস পর্যন্ত জেল দিতে পারেন। তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা, কিসের নারভস্‌নেস? বংশলোচন বার বার মনকে প্রবোধ দিলেন—তিনি কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় যে সান্ধ্য আড্ডা বসে তাহাতে নিত্য বহুসংখ্যক রাজা-উজির বধ হইয়া থাকে। লাটসাহেব, সুরেন বাঁড়ুয্যে, মোহনবাগান, পরমার্থতত্ত্ব,

প্রতিবেশী অধর-বুড়োর শ্রাদ্ধ, আলিপুরের নূতন কুমির—কোন প্রসঙ্গই বাদ যায় না। সম্প্রতি সাত দিন ধরিয়া বাঘের বিষয় আলোচিত হইতেছিল। এইসূত্রে গতকল্য বংশলোচনের শ্যালক নগেন এবং দূর সম্পর্কের ভাগিনেয় উদয়ের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। অন্যান্য সভ্য অনেক কষ্টে তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

বংশলোচনের বৈঠকখানা ঘরটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত ; অর্থাৎ অনেকগুলি ছবি, আয়না, আলমারি, চেয়ার ইত্যাদি জিনিসপত্রে ভরতি। প্রথমেই নজরে পড়ে একটি কার্পেটে বোনা ছবি, কাল জমির উপর আসমানী রঙের বিড়াল। যুদ্ধের সময় বাজারে সাদা পশম ছিল না, সুতরাং বিড়ালটির এই দশা হইয়াছে। ছবির নীচে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা—CAT, তার নীচে রচয়িত্রীর নাম—মানিনী দেবী। ইনি গৃহকর্ত্রী। ঘরের অপর দিকের দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের তৈলচিত্র। কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন, একটি প্রকাণ্ড সাপ তাঁহাদিগকে পাক দিয়া পিসিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নাই কারণ সাপটি বাস্তবিক সাপ নয়, ওঁ-কার মাত্র। তা-ছাড়া কতকগুলি মেমের ছবি আছে, তাদের অঙ্গে সিল্কের ব্রাহ্মশাড়ি এবং মাথায় কাল সুতায় আলুলায়িত পরচুলা ময়দার কাই দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের মুখের দুরন্ত মেম-মেম-ভাব ঢাকা পড়ে নাই, সেজন্য জোর করিয়া নাক বিঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরে দুটি দেওয়াল-আলমারিতে চীনেমাটির পুতুল এবং কাঁচের খেলনা ঠাসা। উপরের শুইবার ঘরের চারিটি আলমারি বোঝাই হইয়া যাহা বাড়তি হইয়াছে তাহাই নীচে স্থান পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও নানাপ্রকার আসবাব, যথা—রাজা-রাণীর ছবি, রায়বাহাদুরের পরিচিত ও অপরিচিত ছোট বড় সাহেবের ফটোগ্রাফ, গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, অ্যালম্যানক, ঘড়ি, রায়বাহাদুরের সনদ, কয়েকটি অভিনন্দনপত্র ইত্যাদি আছে।

আজ যথা সময়ে আড্ডা বসিয়াছে। বংশলোচন এখনও বেড়াইয়া ফেরেন নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিনোদ উকিল ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। বৃদ্ধ কেদার চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছেন। নগেন ও উদয় অতি কষ্টে ক্রোধ রুদ্ধ করিয়া ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, একটা ছুতা পাইলেই পরস্পরকে আক্রমণ করিবে।

আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া উদয় বলিল—'যাই বল, বাঘের মাপ কখনই ল্যাজ-সুদ্ধ হ'তে পারে না। তা হ'লে মেয়েছেলেদের মাপও চুল-সুদ্ধ হবে না কেন? আমার বউ-এর বিনুনিটাই তো তিন ফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা?'

নগেন বলিল—'দেখ্ উদো, তোর বউ-এর বর্ণনা আমরা মোটেই শুনতে চাই না। বাঘের কথা বলতে হয় বল।'

চাটুজ্যে মহাশয়ের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। বলিলেন—'আঃ হা, তোমাদের এখানে কি বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ার নেই?'

এমন সময় বংশলোচন ছাগল লইয়া ফিরিলেন। বিনোদবাবু বলিলেন—'বাহবা, বেশ পাঁঠাটি তো। কত দিয়ে কিনলে হে?'

বংশলোচন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। বিনোদ বলিলেন—'বেওয়ারিস মাল, বেশীদিন ঘরে না রাখাই ভাল। সাবাড় ক'রে ফেল—কাল রবিবার আছে, লাগিয়ে দাও।'

চাটুজ্যে মশায় ছাগলের পেট টিপিয়া বলিলেন—'দিব্বি পুরুষ্টু পাঁঠা। খাসা কালিয়া হবে।'

নগেন ছাগলের উরু টিপিয়া বলিল—উঁহুঁ হাঁড়িকাবাব। একটু বেশী ক'রে আদা-বাটা আর প্যাঁজ।'

উদয় বলিল—'ওঃ, আমার বউ অ্যায়সা গুলিকাবাব করতে জানে!'

নগেন ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'উদো, আবার?'

বংশলোচন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'তোমাদের কি জন্তু দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে? একটা নিরীহ অনাথ প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল কালিয়া আর কাবাব।'

ছাগলের সংবাদ শুনিয়া বংশলোচনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা টেঁপী এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ঘেণ্টু ছুটিয়া আসিল। ঘেণ্টু বলিল—'ও বাবা, আমি পাঁঠা খাব। পাঁঠার ম—ম—ম—'

বংশলোচন বলিলেন—'যা যাঃ, শুনে শুনে কেবল খাই-খাই শিখছেন।'

ঘেণ্টু হাত-পা ছুঁড়িয়া বলিল—'হ্যাঁ আমি ম-ম-ম-মেটলি খাব।'

টেঁপী বলিল—'বাবা, আমি পাঁঠাকে পুষবো, একটু লাল ফিতে দাও না।'

বংশলোচন। বেশ তো একটু খাওয়া-দাওয়া করুক তারপর নিয়ে খেলা করিস এখন।

টেঁপী। পাঁঠার নাম কি বল না?

বিনোদ বলিলেন—'নামের ভাবনা কি? ভাসুরক, দধিমুখ, মসীপুচ্ছ, লম্বকর্ণ—'

চাটুজ্যে বলিলেন—'লম্বকর্ণই ভাল।'

বংশলোচন কন্যাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'টেঁপু, তোর মা এখন কি করছে রে?'

টেঁপী। এক্ষুণি তো কল-ঘরে গেছে।

বংশলোচন। ঠিক জানিস? তা হ'লে এখন এক ঘণ্টা নিশ্চিন্দি। দেখ, ঝিকে বল, চট্ করে ঘোড়ার ভোজানো-ছোলা চাট্টি এনে এই বাইরের বারান্দায় যেন ছাগলটাকে খেতে দেয়। আর দেখ, বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাস নি যেন।

উৎসাহের আতিশয্যে টেঁপী পিতার আদেশ ভুলিয়া গেল। ছাগলের গলায় ফিতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিল—'ওমা, শীগগির এস, লম্বকর্ণ দেখবে এস।'

মানিনী মুখ মুছিতে মুছিতে স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—'আ মর, ওটাকে কে আনলে? দুর দুর—ও ঝি, ও বাতাসী, শীগগির ছাগলটাকে বার করে দে, ঝাঁটা মার।'

টেঁপী বলিল—'বারে, ওকে বাবা এনেছে, আমি পুষব।'

ঘেণ্টু বলিল—'ঘোড়া-ঘোড়া খেলব।'

মানিনী বলিলেন—'খেলা বার ক'রে দিচ্ছি। ভদ্দর লোক আবার ছাগল পোষে। বেরো, বেরো—ও দরওয়ান, ও চুকন্দর সিং—

'হজৌর' বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো তার নাম—ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়ি রক্ষা করে।

অন্দরের মধ্যে হট্টগোল শুনিয়া রায়বাহাদুর বুঝিলেন যুদ্ধ অনিবার্য। মনে মনে তাল ঠুকিয়া বাড়ির ভিতরে আসিলেন। গৃহিণী তাঁহার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া দরোয়ানকে বলিলেন—'ছাগলটাকে আভি নিকাল দেও, একদম ফটকের বাইরে। নেই তো এক্ষুণি ছিষ্টি নোংরা করেগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

বংশলোচন পাল্টা হুকুম দিলেন—'দেখো চুকন্দর সিং, এই বকরি গেটের বাইরে যাগা তো তোমরা নোকরি ভি যাগা।'

চুকন্দর বলিল—'বহুত আচ্ছা।'

মানিনী স্বামীর প্রতি কয়েকটি অগ্নিময় নয়নবাণ হানিয়া বলিলেন—'হ্যাঁলা টেঁপী হতচ্ছাড়ী, রাত্তির হয়ে গেল—গিলতে হবে না? থাকিস তুই ছাগল নিয়ে, কাল যাচ্ছি আমি হাটখোলায়'। হাটখোলায় গৃহিণীর পিত্রালয়।

বংশলোচন বলিলেন—'টেঁপু, ঝিকে ব'লে দে, বৈঠকখানাঘরে আমার শোবার বিছানা ক'রে দেবে। আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। আর দেখ, ঠাকুরকে বল আমি মাংস খাব না। শুধু খানকতক কচুরি, একটু ডাল আর পটলভাজা।'

পুরাকালে বড়লোকদের বাড়িতে একটি করিয়া গোসাঘর থাকিত। ক্রুদ্ধা আর্যনারীগণ সেখানে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আর্যপুত্রদের জন্য সে-রকম কোনও পাকা বন্দোবস্ত ছিল না, অগত্যা তাঁহার এক পত্নীর সহিত মতান্তর হইলে অপর এক পত্নীর দ্বারস্থ হইতেন। আজকাল খরচপত্র বাড়িয়া যাওয়ায় এই সকল সুন্দর প্রাচীন প্রথা লোপ পাইয়াছে। এখন মেয়েদের ব্যবস্থা শুইবার ঘরের মেঝের উপর মাদুর অথবা তেমন তেমন হইলে বাপের বাড়ি। আর ভদ্রলোকদের একমাত্র আশ্রয় বৈঠকখানা।

আহারান্তে বংশলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একাকী শয়ন করিলেন। অন্ধকারে তাঁর ঘুম হয় না, এজন্য ঘরের এক কোণে পিলসুজের উপর একটা রেড়ির তেলে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া বংশলোচন উঠিয়া ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিলেন এবং একখানি গীতা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই গীতাটি তাঁর দুঃসময়ের সম্বল, পত্নীর সহিত অসহযোগ হইলে তিনি এটি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কর্মযোগ পড়িতে পড়িতে বংশলোচন ভাবিতে লাগিলেন—তিনি কী এমন অন্যায় কাজ করিয়াছেন যার জন্য মানিনী এরূপ ব্যবহার করেন? বাপের বাড়ী যাবেন—ইস, ভারী তেজ । তিনি ফিরাইয়া আনিবার নামটি করিবেন না, যখন গরজ হইবে আপনিই ফিরিবে। গৃহিণী শখ করিয়া যে-সব জঞ্জাল ঘরে পোরেন তা তো বংশলোচন নীরবে বরদাস্ত করেন। এই তো সেদিন পনরটা জলচৌকি, তেইশটা বঁটি এবং আড়াই শ টাকার খাগড়াই বাসন কেনা হইয়াছে, আর দোষ হইল কেবল ছাগলের বেলা? হুঃ, যতো সব—। বংশলোচন গীতাখানি সরাইয়া রাখিয়া আলোর সুইচ বন্ধ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন।

লম্বকর্ণ বারান্দায় শুইয়া রোমন্থন করিতেছিল। দুইটা বর্মা চুরুট খাইয়া তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছে। রাত্রি একটা আন্দাজ জোরে হাওয়া উঠিল। ঠাণ্ডা লাগায় সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বৈঠক-খানা ঘর হইতে মিটমিটে আলো দেখা যাইতেছে। লম্বকর্ণ তাহার বন্ধনরজ্জু চিবাইয়া কাটিয়া ফেলিল এবং দরজা খোলা পাইয়া নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

আবার তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে। ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া একবার তদারক করিয়া লইল। ফরাশের এককোণে একগোছা খবরের কাগজ রহিয়াছে। চিবাইয়া দেখিল, অত্যন্ত নীরস। অগত্যা সে গীতার তিন অধ্যায় উদরস্থ করিল। গীতা খাইয়া গলা শুকাইয়া গেল। একটা উঁচু তেপায়ার উপর এক কুঁজা জল আছে, কিন্তু তাহা নাগাল পাওয়া যায় না। লম্বকর্ণ তখন প্রদীপের কাছে গিয়া রেড়ির তেল চাখিয়া দেখিল, বেশ সুস্বাদু। চকচক করিয়া সবটা খাইল। প্রদীপ নিবিল।

বংশলোচন স্বপ্ন দেখিতেছেন—সন্ধিস্থাপন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ পাশ ফিরিতে তাঁহার একটা নরম গরম স্পন্দনশীল স্পর্শ অনুভব হইল। নিদ্রাবিজড়িত স্বরে বলিলেন—'কখন এলে?' উত্তর পাইলেন 'হুঁ হু হু হু।'

হুলস্থুল কাণ্ড। চোর-চোর—বাঘ হ্যায়—এই চুকন্দর সিং—জলদি আও—নগেন—উদো—শীগ্‌গির আয়—মেরে ফেললে—

চুকন্দর তার মুঙ্গেরী বন্দুকে বারুদ ভরিতে লাগিল। নগেন ও উদয় লাঠি ছাতা টেনিস ব্যাট যা পাইল তাই লইয়া ছুটিল। মানিনী ব্যাকুল হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নামিয়া আসিলেন। বংশলোচন ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। লম্বকর্ণ দু-এক ঘা মার খাইয়া ব্যা ব্যা করিতে লাগিল। বংশলোচন ভাবিলেন, বাঘ বরঞ্চ ছিল ভাল। মানিনী ভাবিলেন, ঠিক হয়েছে।

ভোরবেলা বংশলোচন চুকন্দরকে পাড়ায় খোঁজ লইতে বলিলেন—কোনও ভালা আদমী ছাগল পুষিতে রাজী আছে কি না। যে-সে লোককে তিনি ছাগল দিবেন না। এমন লোক চাই যে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবে, টাকার লোভে বেচিবে না, মাংসের লোভে মারিবে না।

আটটা বাজিয়াছে। বংশলোচন বহির্বাটীর বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আছেন, নাপিত কামাইয়া দিতেছে। বিনোদবাবু ও নগেন অমৃতবাজারে ড্যালহাউসি ভার্সস মোহনবাগান পড়িতেছেন। উদয় ল্যাংড়া আমের দর করিতেছে। এমন সময় চুকন্দর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।' তিনজন সহচরের সহিত লাটুবাবু বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বেশভূষা প্রায় একই প্রকার—ঘাড়ের চুল আমূল ছাঁটা, মাথার উপর পর্বতাকার তেড়ি, রগের কাছে দু-গোছা চুল ফণা ধরিয়া আছে। হাতে রিস্ট-ওয়াচ, গায়ে আগুল্‌ফলম্বিত পাতলা পাঞ্জাবি, তার ভিতর দিয়া গোলাপী গেঞ্জির আভা দেখা যাইতেছে। পায়ে লপেটা, কানে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

বংশলোচন বলিলেন,—'আপনাদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে।'

লাটুবাবু বলিলেন—আমরা বেলেঘাটা কেরোসিন ব্যাণ্ড। ব্যাণ্ড-মাস্টার লটবর লন্দী—অধীন। লোকে লাটুবাবু ব'লে ডাকে। শুনলুম আপনি একটি পাঁঠা বিলিয়ে দেবেন, তাই সঠিক খবর লিতে এসেছি।'

বিনোদ বলিলেন,—'আপনারা বুঝি কানেস্তারা বাজান?'

লাটু। কানেস্তারা কি মশায়? দস্তুরমত কলসার্ট। এই ইনি লবীন লিয়োগী ক্লারিয়নেট—এই লরহরি লাগ ফুলোট—এই লবকুমার লন্দন ব্যায়লা। তাছাড়া কর্লেট, পিকলু, হারমোনিয়া, ঢোল, কত্তাল সব লিয়ে উলিশজন আছি। বর্মা অয়েল কোম্পানির ডিপোয় আমরা কাজ করি। ছোট সাহেবের সেদিন বে হ'ল ফিষ্টি দিলে, আমরা বাজালুম, সাহেব খুশী হয়ে টাইটিল দিলে—কেরাসিন ব্যাণ্ড।

বংশলোচন। দেখুন আমার একটি ছাগল আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু—

লাট্টু। আমরা হলুম উলিশটি প্রাণী, একটা পাঁঠায় কি হবে মশায়? কি বল হে লরহরি?

নরহরি। লস্যি, লস্যি।

বংশলোচন। আমি এই শর্তে দিতে পারি যে ছাগলটিকে আপনি যত্ন ক'রে মানুষ করবেন, বেচতে পারবেন না, মারতে পারবেন না।

লাট্টু। এ যে আপনি নতুন কথা বলছেন মশায়। ভদ্দর নোকে কখনও ছাগল পোষে?

নরহরি। পাঁঠী লয় যে দুধ দেবে।

নবীন। পাখি লয় যে পড়বে।

নবকুমার। ভেড়া লয় যে কম্বল হবে।

বংশলোচন। সে যাই হোক। বাজে কথা বলবার আমার সময় নেই। নেবেন কি না বলুন।

লাট্টুবাবু ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন। নরহরি বলিলেন—'লিয়ে লাও হে লাট্টুবাবু লিয়ে লাও। ভদ্দর নোক বলছেন অত করে।'

বংশলোচন। কিন্তু মনে থাকে যেন, বেচতে পারবে না, কাটতে পারবে না।

লাট্টু। সে আপনি ভাববেন না। লাট্টু লন্দীর কথায় লড়চড় লেই।

লম্বকর্ণকে লইয়া বেলেঘাটা কোরোসিন ব্যাণ্ড চলিয়া গেল। বংশেলোচন বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—'ব্যাটাদের দিয়ে ভরসা হচ্ছে না!' বিনোদ আশ্বাস দিয়ে বলিলেন—'ভেবো না হে, তোমার পাঁঠা গন্ধর্বলোকে বাস করবে। ফাঁকে পড়লুম আমরা।'

সন্ধ্যায় আড্ডা বসিয়াছে। আজও বাঘের গল্প চলিতেছে। চাটুজ্যে মহাশয় বলিতেছেন, 'সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই। ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হ'তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ—আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকে জানা আছে। আমাদের রায়বাহাদুর ছাগলটা বিদেয় ক'রে খুব ভাল কাজ করেছেন। কেটে খেয়ে ফেলতেন তো কথা ছিল না, কিন্তু বাড়িতে রেখে বাড়তে দেওয়া—উঁহু।

বংশলোচন একখানি নূতন গীতা লইয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন—নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অর্থাৎ কিনা, আত্মা একবার হইয়া আর যে হইবে না

তা নয়। অজো নিত্যঃ—অজো কিনা ছাগলং। ছাগলটা যখন বিদায় হইয়াছে, তখন আজ সন্ধিস্থাপনা হইলেও হইতে পারে।

বিনোদ বংশলোচনকে বলিলেন—'হে কৌন্তেয়, তুমি শ্রীভগবানকে একটু থামিয়ে রেখে চাটুজ্যে মশায়ের কথাটা শোন। মনে বল পাবে।'

উদয় বলিল—'আমি সেবার যখন সিমলেয় যাই—'

নগেন। মিছে কথা বলিস নি উদো। তোর দৌড় আমার জানা আছে, লিলুয়া অব্‌ধি।

উদয়। বাঃ আমার দাদাশ্বশুর যে সিমলেয় থাকতেন। বউ তো সেইখানেই বড় হয়। তাই তো রং অত—

নগেন। খবরদার উদো।

চাটুজ্যে। যা বলছিলুম শোন। আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হ'ল ইয়া লাশ, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়ীতে ভোজ—লুচি, পাঁঠার কালিয়া, এইসব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম—দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর—কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হ'লে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খ'সে গেছে, মুখ একেবারে হাঁড়ি ; বর্ণ হয়েছে কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়—আঁজি-আঁজি ডোরা-ডোরা। ডাকা হ'ল—ভুটে ভুটে। ভুটে বললে—হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক'রে ফিরে এল।

'লাটুবাবু আয়ে হেঁ।'

সপারিষদ লাটুবাবু প্রবেশ করিলেন। লম্বকর্ণও সঙ্গে আছে। বিনোদ বলিলেন—'কি ব্যাণ্ড-মাষ্টার, আবার কি মনে ক'রে?'

লাটুবাবুর আর সে লাবণ্য নাই। চুল উশ্‌কো খুশ্‌কো, চোখ বসিয়া গিয়াছে, জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সজল-নয়নে হাঁউমাউ করিয়া বলিলেন—'সর্বনাশ হয়েছে মশায়, ধনে-প্রাণে মেরেছে। ও হোঃ হোঃ হোঃ।'

নরহরি বলিলেন—'আঃ কি কর লাটুবাবু, একটু থির হও। হুজুর যখন রয়েছেন তখন একটা বিহিত করবেনই।'

বংশলোচন ভীত হইয়া বলিলেন—'কি হয়েছে—ব্যাপার কি?'

লাটু। মশায়, ওই পাঁঠাটা—

চাটুজ্যে বলিলেন—'হু, বলেছিলুম কি না?'

লাটু। ঢোলের চামড়া কেটেছে, ব্যায়লার তাঁত খেয়েছে, হারমোনিয়ার চাবি সমস্ত চিবিয়েছে। আর—আমার—পাঞ্জাবির পকেট কেটে নব্বই টাকার নোট—ও হো হো!

নরহরি। গিলে ফেলেছে। পাঁঠা নয় হুজুর, সাক্ষাৎ শয়তান। সর্বস্ব গেছে, লাটুর প্রাণটি কেবল আপনার ভরসায় এখনও ধুক-পুক করছে।

বংশলোচন। ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি।

নরহরি। দোহাই হুজুর, লাটুর দশাটা একবার দেখুন, একটা ব্যবস্থা করে দিন—বেচারা মারা যায়।

বংশলোচন ভাবিয়া বলিলেন—'একটা জোলাপ দিলে হয় না?'

লাটুবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—'মশায়, এই কি আপনার বিবেচনা হ'ল? মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে?'

বংশলোচন। আরে তুমি খাবে কেন, ছাগলটাকে দিতে বলছি।

নরহরি। হায় হায়, হুজুর এখনও ছাগল চিনলেন না! কোন্ কালে হজম ক'রে ফেলেছে। নোট তো নোট—ব্যায়লার তাঁত, ঢোলের চামড়া, হারমোনিয়ার চাবি, মায় ইস্টিলের কব্জা।

বিনোদ। লাটুবাবুর মাথাটি কেবল আস্ত রেখেছে।

বংশলোচন বলিলেন—'যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বিনোদ, তুমি একটা খেসারত ঠিক ক'রে দাও। বেচারার লোকসান যাতে না হয়, আমার ওপর বেশী জুলুমও না হয়। ছাগলটা বাড়িতেই থাকুক, কাল যা হয় করা যাবে।'

অনেক দরদস্তুরের পর একশ টাকায় রফা হইল। বংশলোচন বেশী কষাকষি করিতে দিলেন না। লাটুবাবুর দল টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

লম্বকর্ণ ফিরিয়াছে শুনিয়া টেঁপী ছুটিয়া আসিল। বিনোদ বলিলেন,—ও টেঁপুরাণী, শীগগির গিয়ে তোমার মাকে বলো কাল আমরা এখানে খাব—লুচি, পোলাও, মাংস—'

টেঁপী। বাবা আর মাংস খায় না।

বিনোদ। বল কি! হ্যাঁ হে বংশু, প্রেমটা এক পাঁঠা থেকে বিশ্ব-পাঠায় পৌঁছেছে না কি? আচ্ছা তুমি না খাও, আমরা আছি। যাও তো টেঁপু মাকে বল সব যোগাড় করতে।

টেঁপী। সে এখন হচ্ছে না। মা-বাবার ঝগড়া চলছে, কথাটি নেই। বংশলোচন ধমক দিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ হাঁ—কথাটি নেই—তুই সব জানিস। যা যাঃ, ভারি জ্যাঠা হয়েছিস।'

টেঁপী। বা-রে, আমি বুঝি টের পাই না? তবে কেন মা খালি-খালি আমাকে বলে—টেঁপী, পাখাটা মেরামত করতে হবে—টেঁপী, এ-মাসে আরও দু-শ টাকা চাই। তোমাকে বলে না কেন?

বংশলোচন। থাম্ থাম্ বকিস নি।

বিনোদ। হে রায়বাহাদুর, কন্যাকে বেশী ঘাঁটিও না, অনেক কথা ফাঁস করে দেবে। অবস্থাটা সঙ্গিন হয়েছে বল?

বংশলোচন। আরে এতদিন তো সব মিটে যেত। ওই ছাগলটাই মুশকিল বাধালে।

বিনোদ। ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ। তোমারই বা অত মায়া কেন? খেতে না পার বিদেয় ক'রে দাও। জলে বাস কর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ ক'রো না।

বংশলোচন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'দেখি কাল যা হয় করা যাবে।'

এ রাত্রিও বংশলোচন বৈঠকখানায় বিরহশয়নে যাপন করিলেন। ছাগলটা আস্তাবলে বাঁধা ছিল, উপদ্রব করিবার সুবিধা পায় নাই।

পরদিন বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় বংশলোচন বেড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একবার এদিক-ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা উপরে আছে। ঝি-চাকর অন্দরে কাজকর্মে ব্যস্ত। চুকন্দর সিং তার ঘরে বসিয়া আটা সানিতেছে। লম্বকর্ণ আস্তাবলের কাছে বাঁধা আছে এবং দড়ির সীমার মধ্যে যথাসম্ভব লম্ফঝম্ফ করিতেছে। বংশলোচন দড়ি হাতে করিয়া ছাগল লইয়া আস্তে আস্তে বাহির হইলেন।

পাছে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয় সেজন্য বংশলোচন সোজা রাস্তায় না গিয়া গলি-ঘুঁজির ভিতর দিয়া চলিলেন। পথে এক ঠোঙা জিলিপি কিনিয়া পকেটে রাখিলেন। ক্রমে লোকালয় হইতে দূরে আসিয়া জনশূন্য খাল-ধারে পৌঁছিলেন।

আজ তিনি স্বহস্তে লম্বকর্ণকে বিসর্জন দিবেন, যেখানে পাইয়াছিলেন আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিবেন—যা থাকে তার কপালে। যথাস্থানে আসিয়া বংশলোচন

জিলিপির টোঙাটি ছাগলকে খাইতে দিলেন। পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে লিখিলেন—

এই ছাগল বেলেঘাটা খালের ধারে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, প্রতিপালন করিতে না পারায় আবার সেইখানেই ছাড়িয়া দিলাম। আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবেন না।

লেখার পর কাগজ ভাঁজ করিয়া একটা ছোট টিনের কৌটায় ভরিয়া লম্বকর্ণের গলায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তারপর বংশলোচন শেষবার ছাগলের গায়ে হাত বুলাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন, লম্বকর্ণ তখন আহারে ব্যস্ত।

দূরে আসিয়াও বংশলোচন বার বার পিছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। লম্বকর্ণ আহার শেষ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে। যদি তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে এখনি পশ্চাদ্ধাবন করিবে। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। বংশলোচন জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন।

আর পারা যায় না, হাঁফ ধরিতেছে। পথের ধারে একটা তেঁতুল গাছের তলায় বংশলোচন বসিয়া পড়িলেন। লম্বকর্ণকে আর দেখা যায় না। এইবার তাঁহার মুক্তি— আর কিছুদিন দেরী করিলে জড়ভরতের অবস্থা হইত। ওই হতভাগা কৃষ্ণের জীবকে আশ্রয় দিতে গিয়া তিনি নাকাল হইয়াছেন, গৃহিণী তাঁহার উপর মর্মান্তিক রুষ্ট, আত্মীয়স্বজন তাহাকে খাইবার জন্য হাঁ করিয়া আছে—তিনি একা কাঁহাতক সামলাইবেন? হায় রে সত্যযুগ, যখন শিবি রাজা শরণাগত কপোতের জন্য প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন—মহিষীর ক্রোধ, সভাসদ্‌বর্গের বেয়াদবি, কিছুই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই।

গুম্ দুম্দুড় দুড়ু দড়ড়ড় ড়! আকাশে কে ঢেঁড়া পিটিতেছে? বংশলোচন চমকিত হইয়া উপরে চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষের গম্বুজে এক পোঁচ সীসা-রঙের অস্তর মাখাইয়া দিয়াছে। দূরে এক ঝাঁক সাদা বক জোরে পাখা চালাইয়া পালাইতেছে। সমস্ত চুপ—গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। আসন্ন দুর্যোগের ভয়ে স্থাবর জঙ্গম হতভম্ভ হইয়া গিয়াছে। বংশলোচন উঠিলেন, কিন্তু আবার বসিয়া পড়িলেন। জোরে হাঁটার ফলে তাঁর বুক ধড়ফড় করিতেছিল।

সহসা আকাশ চিড় খাইয়া ফাটিয়া গেল। এক ঝলক বিদ্যুৎ—কড় কড় কড়াৎ— ফাটা আকাশ আবার বেমালুম জুড়িয়া গেল। ঈশাণকোণ হইতে একটা ঝাপসা পর্দা তাড়া করিয়া আসিতেছে। তাহার পিছনে যা-কিছু সমস্ত মুছিয়া গিয়াছে, সামনেও আর দেরি নাই। ওই এল, ওই এল! গাছপালা শিহরিয়া উঠিল, লম্বা লম্বা তালগাছগুলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল। কাকের দল আর্তনাদ করিয়া

উড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঝাপটা খাইয়া আবার গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরিল। প্রচণ্ড ঝড়, প্রচণ্ডতর বৃষ্টি। যেন এই নগন্য উইচিবি—এই ক্ষুদ্র কলিকাতা শহরকে ডুবাইবার জন্য স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতা সার বাঁধিয়া বড় বড় ভৃঙ্গার হইতে তোড়ে জল ঢালিতেছেন। মোটা নিরেট জলধারা, তাহার ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ফোঁটা। সমস্ত শূন্য ভরাট হইয়া গিয়াছে।

মান-ইজ্জত কাপড়-চোপড় সবই গিয়াছে, এখন প্রাণটা রক্ষা পাইলে হয়। হা রে হতভাগা ছাগল, কি কুক্ষণে—

বংশলোচনের চোখের সামনে একটা উগ্র বেগনী আলো খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সঞ্চিত বিশ কোটি ভোল্ট ইলেক্‌ট্রিসিটি অদূরবর্তী একটা নারিকেল গাছের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিকট নাদে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল।

রাশি রাশি সরিষার ফুল। জগৎ লুপ্ত, তুমি নাই, আমি নাই। বংশলোচন সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

... ...

বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু এখনো সোঁ সোঁ করিয়া হাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া মেঘের পর্দা ঠেলিয়া দেবতারা দু-চারটা মিটমিটে তারার লণ্ঠন লইয়া নিচের অবস্থা তদারক করিতেছেন।

বংশলোচন কর্দম শয্যায় শুইয়া ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি কে? রায়বাহাদুর। কোথায়? খালের নিকট। ও কিসের শব্দ? সোনাব্যাং। তাঁর নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। ছাগলটা? মানুষের স্বর কানে আসিতেছে। কে তাঁকে ডাকিতেছে? 'মামা—জামাইবাবু বংশু আছ?—হুজৌর—'

অদূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। জনকতক লোক লণ্ঠন লইয়া ইতস্তত ঘুরিতেছে এবং তাঁহাকে ডাকিতেছে। একটি পরিচিত নারীকণ্ঠে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল।

রায়বাহাদুর চাঙ্গা হইয়া বলিলেন—'এই যে আমি এখানে আছি—ভয় নেই—'

... ...

মানিনী বলিলেন—'আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা ঘরেই বড় করে বিছানা করে দে তো। আর দেখ্, আমার বালিশটাও

দিয়ে যা। আঃ, চাটুজ্যে মিনসে নড়ে না। ও কি—সে হবে না—এই গরম লুচি ক-খানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কি আছে—তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেব নাকি?

'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—'

বংশলোচন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'অ্যাঁ, ওটা আবার এসেছে? নিয়ে আয় তো লাঠিটা—'

মানিনী বলিলেন—'আহা কর কি, মেরো না। ও বেচারা বৃষ্টি থামতেই ফিরে এসে তোমার খবর দিয়েছে। তাইতেই তোমায় ফিরে পেলুম। ওঃ, হরি মধুসূদন!'

... ...

লম্বকর্ণ বাড়িতেই রহিয়া গেল, এবং দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার আধ হাত দাড়ি গজাইল। রায়বাহাদুর আর বড় একটা খোঁজ খবর করেন না, তিনি এখন ইলেকশন লইয়া ব্যস্ত। মানিনী লম্বকর্ণের শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছেন। তাহার জন্য সাবান ও ফিনাইল ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। লোকে দূর হইতে তাহাকে বিদ্রূপ করে। লম্বকর্ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত শুনিয়া যায়, নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে বলে—ব-ব-ব—অর্থাৎ যত ইচ্ছা বকিয়া যাও। আমি ও-সব গ্রাহ্য করি না।

পয়োমুখম্

জগদীশ গুপ্ত

কলাপ সমাপ্ত হইয়া গেছে, মুগ্ধবোধ আরম্ভ হইয়াছে।

ভূতনাথের কথা বলিতেছি—

ভূতনাথ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে ; কিন্তু কলাপই বলুন, মুগ্ধবোধই বলুন, পাঠে তেমনি ভক্তি কি আগ্রহ তার নাই।... মাঝে মাঝে সে ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ বিশ্রী করিয়া ব্যাকরণের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।...

ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কবিভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন।

কিন্তু আরম্ভে একটু বিলম্ব ঘটিয়া গেছে—

ভূতনাথের বয়স গত অগ্রহায়ণে অষ্টাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ঊনবিংশে পদার্পণ করিয়াছে।

... সন ১৩০১ সালে তার জন্ম।

ভূতনাথের মেধা কোনোদিনই তার নিজের অলঙ্কারের কি গুরুবর্গের অহঙ্কারের বস্তু হইয়া উঠে নাই।—

তা না হোক ...

মেধা মানবজাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয় ; আর, ভগবান গৃহবিবাদে সালিশী করিতেও বসেন নাই যে, মামলা বাঁচাইতে ভাণ্ডারের সমস্ত মেধা সবাইকে নিক্তির তৌলে সমান করিয়া মাপিয়া দিবেন! কিন্তু মেধা না থাকার পিছুটানটা যাহার দ্বারা কাটাইয়া উঠিয়া মানুষের গতি-বেগ আর হৃদয়াবেগ সম্মুখের দিকে বাড়ে সেই অধ্যবসায়ও ভূতনাথের নাই বলিলে অযথা বেশী বলা হয় না।

... তাই ষোলো-সতের বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে তানানানা করিয়া কাটাইয়া সর্বাপেক্ষা সহজ বিদ্যা আয়ুর্বেদ আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর সে নিশ্চয়ই হয় নাই— সম্মত হইয়াছে।

শুভস্য শীঘ্রম্—

সেইদিনই কাঠের সিন্দুক খুলিয়া কৃষ্ণকান্ত কলাপ আর মুগ্ধবোধ বাহির করিয়া রৌদ্রে দিলেন।

ভূতনাথ বই দু'খানাকে চিনিত—

তাহাদিগকে উঠানের রৌদ্রে পিঁড়ির উপর স্থাপিত দেখিয়া সে আর যাহাই হউক খুশী হইল না।—

... বই দু'খানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভূতনাথ ফস করিয়া যে কথাটি বলিয়া ফেলিল, তার মান কেহ রাখিল না।...

কথাটা কানে যাইবার পর কৃষ্ণকান্ত বক্রদৃষ্টিতে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—

ভূতনাথ সরিয়া গেলেই গৃহিণীকে গল্পটা শুনাইয়া দিবেন।...

এবং সে অবসর তখনই মিলিল।...

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন—তোমার ছেলের বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত বলদ দিয়ে টানাতে হবে দেখছি—ঠিক সেই রকম।—বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী বলিলেন,—কি রকম?

—এক ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে—

—কে?

—কোনো গেরস্ত। একটা গল্প বলছি। পাঠিয়েছে দোকানে এক পয়সার বাতাসা আনতে। দোকানী দিলে ; ছোঁড়া গুণে বললে,—মোটে পাঁচখানা?—দোকানী ক্ষেপে উঠে বললে—পাঁচখানা নয় ত' কি পঁচিশখানা দেবে? ঘিয়ের দর জানিস আজকাল?... ছোঁড়া লজ্জা পেয়ে চলে এল। ...বাড়ীতে বললে—কিরে, মোটে পাঁচখানা বাতাসা এনেছিস এক পয়সায়? ছোঁড়া বললে,—তাই দিলে, মা। বললুম, তা দোকানী তেড়ে উঠল ; বললে,—"ঘিয়ের দর জানিস আজকাল" ... শুনে গিন্নীর হাত গালে উঠে গেল ; অবাক হ'য়ে বললেন,—কি বজ্জাত দোকানী গো! ঘিয়ের দর বেড়েছে তাতে বাতাসার কি ! ... বলিয়া তুমুল শব্দে খানিকটা হাসিয়া লইয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—তোমার ভূতোর বুদ্ধি সেই ছোঁড়ার মত, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান একেবারে নেই।

কিন্তু মাতঙ্গিনী হাসিতে পারিলেন না—

পুত্রের অজ্ঞানতার উদ্দেশ্যে স্বামীর এই বিদ্রূপে বিমর্ষ হইয়া কহিলেন,—কি, করেছে কি?

বলছে, পড়ব কবরেজি, তাতে ব্যাকরণের কি দরকার!

কৃষ্ণকান্ত না হাসিয়া বলিলেন—আয়ুর্বেদ শাস্ত্র খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ... ব্যাকরণের পর সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি ; তারপর শাস্ত্র—

ভূতনাথ মনে মনে বলিল,—কচু।

কৃষ্ণকান্ত অন্তর্যামী নন—ভূতনাথের কচুর কথাটা টেরও পাইলেন না। বলিতে লাগিলেন,—কাজেই সংস্কৃত হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি হওয়া আগে দরকার। ইত্যাদি।

দরকারী কথার কত ভাগের কত ভাগ তার কানে গেল তাহা ভূতনাথ নিজেই জানিতে পারিল না।—ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কৃষ্ণকান্তের মুখের শব্দ বন্ধ হইতেই সেদিককার কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া সে আপন কাজে গেল। ...

কিন্তু ভূতনাথ মাঝে মাঝে মায়ের কাছে নালিশ করে,—এ-গাছের পাতা, ও-গাছের মূল, এ-টার ছাল, ও-টার কুঁড়ি, এই নিয়ে ত কবরেজের কারবার ; তা করতে মুগ্ধবোধ প'ড়ে কি হবে?—বলিতে বলিতে অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তির লক্ষণগুলি তার সর্বশরীরে প্রকাশ পায়।

মাতঙ্গিনী বলেন,—আমি ত' কিছু জানিনে রে। ...

যাহা হউক, শাস্ত্রাধ্যয়নের উপক্রমণিকা অনাসক্ত গয়ংগচ্ছভাবে চলিতে লাগিল ;—এবং পবিত্র শাস্ত্রসৌধের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া সে জীবনের এমন একটা দরকারী কাজ শেষ করিয়া আনিল যাহার ফল প্রতিফল দুটোই নিরেট। ... দুস্তর কলাপের প্রস্তর চর্বণের চাইতে তা ঢের সংক্ষিপ্ত ও সরস,—

উদ্দেশ্যও উচ্চদরের—

শুধু সনাতন শাস্ত্রীয় প্রথায় নরকনিবারক পুত্র লাভ। ... ভূতনাথ বিবাহ করিল ; তখন তাহার বয়স সতর বৎসর কয়েক মাস মাত্র—

স্ত্রী মণিমালিকা ন'বছরের—

পণ সর্বসাকুল্যে সাত শত টাকা মাত্র।

কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারীতে ঘরের অতগুলি টাকা আদায় হয় না ...

বিবাহের পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কিঞ্চিৎ বিষয়-বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন ... বৈবাহিক মহলে প্রচার করিয়া দিলেন, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাজ শ্রীগোলককৃষ্ণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র ... ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি-সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ... আরো বলিলেন,—দু'তিনটি পাশকরা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ বাইশ টাকার অধিক নয় ; আয়ুর্বেদের দিকে দেশের নাড়ীর টান যথার্থই ফিরিয়াছে ; সুতরাং পশার দাঁড়াইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না ; দু'তিন বছরেই—ইত্যাদি—। ...

তাই সাতশত টাকা পণ।

কৃষ্ণকান্ত নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভূতনাথকে দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করান—তৈল, ঘৃত, রসায়ন, অরিষ্ট, আসব—বিবিধ রোগবিকারের শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ঔষধ। কৃষ্ণকান্ত কাছে-কিনারায় যখন রোগী দেখিতে যান, তখন ভূতনাথকে সঙ্গে লইয়া যান। ...পথে আসিতে আসিতে বুঝাইয়া দেন—রোগলক্ষণ ; কোন্ রসাধিক্য কোন্ রোগের হেতু, কী ভাবে তার বিস্তৃতি ও নিবৃত্তি। ... পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ুর কোনটা কুপিত হইয়া এই রোগীর রোগ কিভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ... এমনি সব ভূয়োদর্শনের কথা।—

ভূতনাথ গাছগাছড়া, ফল-মূল কিছু-কিছু চিনিয়াছে ; তাহাদের গুণাবলী ও প্রয়োগবৈচিত্র্যের সঙ্গেও কিছু কিছু পরিচয় ঘটিতেছে। ...

মণি ছোট্টটি—

স্বামীর সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে।

ভূতনাথ মণিকে রাগায়, কাঁদায়, আবার খিল্‌খিল করিয়া হাসায়ও। ... মাঝে মাঝে মণি যখন বাপের বাড়ীর কথা ভাবিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে তখন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া সদুপদেশও দেয় ; বলে, এই তোমার আপন বাড়ী। কিন্তু অবুঝ মণি হঠাৎ অতটা উদার হইয়া উঠিতে পারে না ;—বলে,—ধেৎ। এত তোমাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী—

ভূতনাথ বলে,—তা বটে। কিন্তু তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে, সে-বাড়ী তোমার দাদা-বৌদির, এই বাড়ীই তোমার ; তারপর ছেলেপিলে হ'লে—'

মণি এবার লজ্জা পাইয়া হাসে ...

বলে,—ধেৎ।

মণির দু'বারকার দুটি ভর্ৎসনার কত তফাৎ ভূতনাথ তা বোঝে—

খুসী হইয়া উঠিয়া যায়।

ভূতনাথের ছোটভাই দেবনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলে,—তুমি বৌদি না ছাই বলিয়া বুড়ো আঙুল দেখায়।

মণি কথা কহে না।

দেবনাথ বলে,—বললুম দুটো আম ছাড়াও নুন লঙ্কা মেখে খাই ; তখন কথাই কওয়া হ'ল না। এখন দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর সোয়াগের হাসি হচ্ছে। এই বয়সেই শিখেছ ঢের! ...

মণির কিন্তু মনেও আসে না যে, এই বয়সে দেবনাথও শিখিয়াছে ঢের!

—বেশ, বেশ, চলো দিচ্ছিগে।—বলিয়া মণি লাফাইয়া ওঠে।

মণির জ্বর হইল।

উজ্জ্বল মণি ম্লান হইয়া গেল ...

কৃষ্ণকান্ত নাড়ী দেখিয়া বড়ি দিলেন ; তাহাতে জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা হইল না ...

শেষ রাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দুটার সময় মণির নাড়ী ছাড়িয়া গেল। ... সীঁথিভরা সিঁদুর লইয়া, লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া, আলতায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি মণি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।—

মাতঙ্গিনী চোখের জল মুছিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন—হ্যাঁ গা, এক ফোঁটা ওষুধও ত' দিলে না ...

কৃষ্ণকান্ত বড় বিজ্ঞ ; তাই গৃহিণীর দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—দিলেও ফল হ'ত না, বুঝেই দিইনি। যম যে ব্যাধি পাঠায় তাকে আমরা দেখেই চিনি—

আয়ুর্বেদের এই চরম দিব্যদৃষ্টির বিষয় মাতঙ্গিনী কৃষ্ণকান্তের এতদিনের স্ত্রী হইয়াও বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। ... চোখে আঁচল দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মণির স্মৃতি মুছিবার নয় ...

এখনো যেন সে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ...

'মা মা' বলিয়া আপন পেটের মেয়েটার মত অনুক্ষণ সে পায়-পায় ঘুরিত। সে যে ছেলেমানুষ ইহা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইয়া তিনি মণির কাজের ভুল ধরিয়া ধমক দিতেন। ... মণির মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিত ... এই ম্লান, এই উজ্জ্বল ... পরক্ষণেই সে 'মা' বলিয়া ঘেঁসিয়া আসিত ...

মাতঙ্গিনীর বুক ফাট্ ফাট্ করে।—

ভূতনাথও কাঁদিল বিস্তর ; কলাপ কিছুদিন রোগীর প্রলাপের মত অসহ্য হইয়া রহিল। ...

সংসারে শোকতাপ আছেই—

আবার "ভগবদেচ্ছায়" মানুষ শোকতাপ ভুলিতেও পারে। ... দিন দিন দূরত্ব বাড়িতে বাড়িতে মণির শোক কৃষ্ণকান্তের "ভগবদেচ্ছায়" গৃহ হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ভূতনাথ পুনরায় কলাপে মন দিল।—

কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পুনরায় বিবাহ দিলেন। বলিলেন,—স্বয়ং শিব দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন। ... কিন্তু অশৌচমুক্তির পর অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী স্থির হইয়া গিয়াছিল কিনা তাহা তিনি উল্লেখ করিলেন না।...

এবার পণ, পাঁচশত টাকা ... কিছু লোকসান গেল।

মণি মরিয়া পাত্র হিসাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে ; বৈবাহিক মূল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকান্তের দুইশত টাকা—

কিন্তু বৌটি এবার আরো ভাল ...

চমৎকার একটা সুহসিত প্রসন্ন লক্ষ্মীশ্রী অনুপমার মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছে— যেন "বালার্কসিন্দুরশোভিত" ঊষা ... সেই দিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনীর চোখের পলক পড়িতে চাহে না ... অনুপমা শ্বশ্রূর দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসে।—

মাতঙ্গিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বধূর মুখের উপর একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া যান ... যেন তাঁর চতুর্দিকেই খর রৌদ্র ... তার ঝাঁঝে চক্ষু পীড়িত হইয়া ওঠে ... তাই বধূর রূপের শীতাঞ্জন তিনি বারম্বার চোখে মাখাইয়া লইয়া যান।

কিন্তু অদৃষ্টে তাঁর দুঃখ লেখা ছিল—

তাই একদিন আহ্লাদে গদগদ হইয়া মাতঙ্গিনা মনের কথাটাই বধূকে বলিতে গেলেন ; কিন্তু কথাটা সুস্পষ্ট না হওয়ায় ফল উল্টা দাঁড়াইয়া গেল। ...

বৌমার খাসকামরায় যাইয়া মাতঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৌমা, তোমার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না বাপু।

—অর্থাৎ তোমার ঐ মুখখানিকে আর চোখের আড়াল করছিনে ... কিন্তু বৌমা অন্তর্যামিনী নয়।—

শাশুড়ীর অভিলাষ শুনিয়া অনুপমা তার অনুপম চক্ষু দু'টি তুলিয়া সোজা মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিল, এবং মাতঙ্গিনীর আশা আকাঙ্ক্ষা-আহ্লাদ ঘূর্ণীবায়ুর মত

আবর্তিত হইতে হইতে কোথায় যে মিলাইয়া গেল তার চিহ্নও রহিল না। ... সে দৃষ্টির অর্থ যে কি ... প্রাণভরা কিন্তু অপ্রকাশিত আশার পরেই এ যে কত কঠিন নিরাশ্বাস—উগ্র মনের কতখানি উত্তাপ যে ঐ মুখখানির স্নিগ্ধ আবরণ ছাপাইয়া নিষ্পলক দৃষ্টির পথ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে ... তাহা শুধু অনুভব করে মানুষের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রাণপুত্তলী।—

মাতঙ্গিনীর প্রাণ বধূর সেই দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ...

মাতঙ্গিনী সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—কিছু মনে কোরো না, মা ; তোমার মুখখানি—'

কথা কয়টি উচ্চারিত হইয়াই অশ্রু-বেদনায় তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

একান্ত আপনার জ্ঞানে নূতন বধূর প্রতি এই তাঁর প্রথম অসঙ্কোচ মুক্তপ্রাণ সম্ভাষণ।

বুকভরা সোহাগের আরো কত কথা বলিবার ছিল—

পাষাণী তাহা বলিতে দিল না।

মাতঙ্গিনীর মনে হইল, আশাভঙ্গের এই ব্যথাটা তিনি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিবেন না। ... কিন্তু ভুলিলেন ; এবং ভুলিতে তাঁহাকে জন্মান্তরে পৌঁছিতে হইল না। ... দিন তিনেকের মধ্যেই তাঁহার মাতৃহৃদয় অজ্ঞান সন্তানের সুকঠিন অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাকে পুনরায় তার উদার অঙ্গনে বরণ করিয়া লইল।—

ভূতনাথ কলাপ সমাধা করিয়া এখন মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিয়াছে। ... পিত্ত, বায়ু, কফ—ইহাদের কোন্‌টার প্রাবল্য কোন্ নাড়ীতে প্রকট হয় পিতার উপদেশে তাহাও যেন সে অল্প অল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে।—

কিন্তু অনুপমা নাক সিঁটকায়—

বলে,—কবরেজী পড়ে' কি হবে শুনি?

ভূতনাথ বলে,—কবরেজী ত আজকাল বেশ মানের কাজ হয়েছে পয়সাও—"

—তা জানি। কলকাতায় গিয়ে বসতে পারবে?

ভূতনাথ যেন অপ্রস্তুতে পড়ে ; বলে,—দেশেও ত' বেশ পয়সা আছে।

—আমাদের সেই বনমালী কবরেজের মত কবরেজ হবে ত'? তার, ত' নেংটি ঘোচে না। আমরা তাকে বলি বোক্‌রেজ মশায়।—বলিয়া অনুপমা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসে।

ভূতনাথ মর্মাহত হয়।

কবিরাজীকে সে নিজেও বড় শ্রদ্ধার চোখে দেখে না ; জঙ্গল কাটা আর শুকনো কাঁচা জঞ্জাল জড়ো করা কবিরাজী যে হালফ্যাসানের খুব বড় একটা গর্বের জিনিষ ইহাও সে মনে করে না ; তবু কবিরাজই সে হইবে।... অদৃষ্টের লিখন তাই—

তাই নিজের স্ত্রীর মুখে সেই কবিরাজীর প্রতিই অপার অবজ্ঞার কথা শুনিয়া সে সত্যকার ক্লেশই পায়।

কিন্তু অনুপমা মণি নয়—

অনুপমাকে ধমক দিলে ধমকের প্রতিধ্বনি যাহা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে তাহা মূলধ্বনিকে বহু নিম্নে রাখিয়াই আসিবে তাহা সে বেশ জানে।...

অনুপমা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে ; ভূতনাথ চলিয়া আসিতে পা তোলে।... অনুপমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে,—তোমার নাম রেখেছিল কে?

—বাবা রেখেছিলেন।

—নামের মানে ত মহাদেব, নয়? বলিয়া অনুপমা হাসিয়া আকুল হইয়া যায়।...

সম্মুখে হাসির মুক্তধারা—

উদ্ভিন্ন নিটোল যৌবন—

মুক্তমালার মত দন্তপাঁতি—

আরক্ত গণ্ডতট—

ফুল্ল অধরপুট ...

কিন্তু ভূতনাথ ঘামিয়া অস্থির হইয়া ওঠে।...

ঠিক সে ধরিতে পারে না, কিন্তু তাহার মনের দুয়ারে কেমন একটা দুঃসংবাদ আসিয়া পৌঁছায় ... অন্তরের অতি সুকোমল স্থানে সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত একটা ব্যথা ফোটে ... কাহার প্রচ্ছন্ন কায়ার নিষ্ঠুর একটা কালো ছায়া বুক জুড়িয়া পড়ে ... চারিদিক অশ্রু-কলঙ্কে মলিন হইয়া ওঠে ...

ভূতনাথ উঠিয়া পড়ে ; ধরা গলায় বলে,—আসি এখন।

অনুপমা বলে,—দন্তচূর্ণ পাকে চড়িয়ে এসেছ বুঝি? তা এস।

মাতঙ্গিনী ছেলের কাতর মুখ দেখেন—

তাঁর সর্বজ্ঞ মাতৃহৃদয়ের কাছে ভিতরের অনন্ত দুঃখের বার্তাটি ষোলো আনাই আসে ...

মনটি তাঁর লুটাইয়া লুটাইয়া ভগবানের পা ধরিতে ছোটে ...

কৃষ্ণকান্ত একদিন প্রকাণ্ড এক টাকার তোড়া সিন্দুকে তুলিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বৌমাকে বিশেষ যত্ন আত্তি করো। ওঁর লক্ষ্মীর অংশ প্রবল।

মাতঙ্গিনী টাকার তোড়াটা দেখেন নাই ; হঠাৎ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—এবার পাটে দু'হাজার টাকা মুনাফা হয়েছে। ... তাঁর তখনকার তৃপ্তিটুকু উপভোগের জিনিস—

দেবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিল ; মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্বেই সে বলিয়া উঠিল, মণি বৌ-ই ছিল ভাল ; এ একটা কি এনেছ দাদাকে বিয়ে দিয়ে! ভুরু তুলেই আছে! দেমা—।

কৃষ্ণকান্তের হাতের এক চড় খাইয়া দেবনাথের অনধিকার চর্চা বন্ধ হইয়া গেল।

পুত্রবধূতে লক্ষ্মীর অংশ প্রবল হইলেও কৃষ্ণকান্তের মুনাফার টাকা পর বৎসরই ঐ পাটের টানেই বাহির হইয়া গেল ...

অনুপমার জ্বর হইয়াছে—

জ্বর অল্পই ...

কিন্তু অনুপমা লাথি ছুড়িয়া, কিল ছুড়িয়া, কাঁদিয়া, বায়না লইয়া, বাটি আছড়াইয়া, ঔষধ, পথ্য ফেলিয়া দিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যেন লজ্জাসরম আর সহিষ্ণুতা বলিয়া সংসারে কোনো জিনিষই নাই। ... তাহার কাছে ধমক না খাইল এমন লোক নাই ... মাতঙ্গিনী পথ্য দিতে আসিয়া অকথ্য অপমানিত হইয়া গেলেন, ভূতনাথ চড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল...দেবনাথের দিকে ত' সে পাই তুলিল।—

যাহা হউক, বহু তাণ্ডব কাণ্ড দেখাইয়া জ্বর ছাড়িয়াছে ; অনুপমা অন্নপথ্য করিয়াছে ; কিন্তু সেইদিনই ভোররাত্রে ভেদ আরম্ভ হইয়া বিকাল নাগাদ তার ধাত্ বসিয়া গেল। ... অনুপমা মণিমালিকার অনুগমন করিল।

মণি মরিয়াছিল, বৈশাখের কাঁচা আম খাইয়া ; অনুপমা মরিল, অজীর্ণ রোগের উপর জিদ্‌বশে অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য উদরস্থ করিয়া। ... মাতঙ্গিনী কাঁদিলেন,

ভূতনাথ কাঁদিল, দেবনাথও কাঁদিল। কৃষ্ণকান্ত প্রতিবেশীগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারম্বার চক্ষু মার্জনা করিয়া শোক-চিহ্ন গোপন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—বড়ো জেদী ... একগুঁয়ে মেয়ে ছিল, ভাই ...

ভূতনাথ নূতনতর একটা আঘাত পাইল, মণির মৃত্যুতে যাহা সে পায় নাই।

মণি তার যৌবনের সহচরী হইয়া উঠে নাই ... সে ছিল খেলার সামগ্রী, স্নেহের জিনিষ, মিষ্ট দৌরাত্মের পাত্রী।—

অনুপমার নিরুপম রূপ-দীপালির চতুর্দিকে যৌবনের যে রাস-আয়োজন দিন-দিন অপর্যাপ্ত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই আবেদন তাহার বুকে, রক্তে দুর্নিবার জাগরণ আনিয়া দিয়া গেছে। ... অনুপমার সমস্ত অকারণ নির্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার খরতাপে বাষ্প হইয়া দেখিতে দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত ... চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতে থাকিত তার দেহখানা—ইন্দ্রজালের আলোকোৎসবের মত রূপ, আর চির-বিলসিত বসন্তের কুসুমোৎসবের মত যৌবন ... তাহাদের অভাবে ভূতনাথের ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের দিগন্ত পর্যন্ত একেবারে রুক্ষ শুষ্ক কর্কশ হইয়া গেছে। ...

ভূতনাথের কলাপ, মুগ্ধবোধ এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আলমারীতে যাইয়া উঠিয়াছে। ... এখন সে পুরাপুরি একজন কবিরাজ।—

কিন্তু বিবাহে তার আর ইচ্ছা নাই।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের আচরণে দিন দিন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন ; এইভাবে আর কিছুদিন চলিলেই সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র মার্জনার ভাব থাকিবে না—এ ভয়ও তিনি স্পষ্টই দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। ...

... স্ত্রীই হইয়াছে আজকালকার লোকের যেন মহাগুরুর সেরা ; একটির নিপাতেই সে সম্পর্কে আর কাহাকেও যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ...

আগেকারটা?—সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

...চলাচলম্ ইদং সর্বম্—মরিবে ত সবাই, দু'দিন আগে, দু'দিন পরে। মূর্খ আর বলে কাকে! ... স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে—ইহা কোন্ শাস্ত্রের কথা! ... এই সৌখীন সন্ন্যাসের ভান-আধুনিকতার ফল, যেমন ব্যাপক, তেমনি অসহ্য। মানুষ মরে বলিয়াই পৃথিবীতে মানুষের স্থান হয় ; নতুবা এতদিন মানুষকে দলে দলে যাইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত! ...

কিন্তু ভূতনাথ একেবারে নিস্পৃহ।

ধিক্কারে, ভর্ৎসনায়, অভিযোগে, অনুযোগে, দোহাইয়ে, অনুজ্ঞায়, অনুনয়ে কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে ঘন-ঘন নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।—

প্রত্যুত্তরে ভূতনাথ বলে,—বাবা, আমায় মার্জনা করুন ; বিবাহে আর আমার রুচি নাই ; বরং দেবনাথকে ধরুন ; সে-ই সকল বিষয়ে আপনাদের সাধ পূর্ণ করবে। ...

কৃষ্ণকান্তকে এ-সব কথা বলা বাহুল্য ; কাহার দ্বারা তাঁহাদের সাধ আশা পূর্ণ হইবে তাহা তিনি পরিষ্কার জানেন। ... তবে কথা এই যে, ভূতনাথকে ছাড়িয়া দেবনাথকে ধরিতে তার আপাততঃ তেমন আগ্রহ নাই—নানা কারণে। ... দেবনাথের বিবাহের পরই ভূতনাথের বিবাহোদ্যম এ-ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতঃ দৃষ্টিকটু না হইলেও, ভূতনাথই অবশেষে আপত্তির এই অতিরিক্ত কারণটা দেখাইয়া যখন তখন বিরুদ্ধ দিকে জোর করিতে পারিবে। ...

তারপর, এই কারণেই, পাত্রের বয়স খুবই অল্প হইলেও, কন্যার দিক হইতে বয়স সম্বন্ধেই সন্দেহের একটা কথা উঠিতে পারে। দুইটি স্ত্রী মারা গিয়াছে, তারপর কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়া গেছে, তারপর জ্যেষ্ঠের জন্য এই উদ্যোগ ... বয়স বেশী না হইয়াই যায় না ; এই সূত্র ধরিয়া পণকে আরো খাটো করিবার জন্য একটা টানাটানি চলিতে পারিবে। ...

সুতরাং কৃষ্ণকান্ত প্রকাশ্যে বলিলেন,—জেষ্ঠ অকৃতদার অর্থাৎ বিপত্নীক অবস্থায় থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহসংস্কার শাস্ত্র এবং লোকাচার দুইয়েরই বিরোধী প্রচণ্ড অকল্যাণকর একটা ব্যাপার।—

তারপর বলিলেন,—এ ত নির্বোধেও জানে।

দ্বিতীয়তঃ, ভূতনাথের গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য আজকাল ক্রমশঃই যেরূপ দ্রুতবেগে খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে এইবেলা একটা সহকারী না দিলে তাঁর মৃত্যু ঘটিতেও পারে। ...

তৃতীয়তঃ, শ্মশানবৈরাগ্য যৌবনের অপরিহার্য একটা ধর্ম হইলেও, সেইটাকেই জীবনের স্থায়ী করিয়া লইয়া প্রাণপণে তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে এ ব্যবস্থা গো-মূর্খেও দিবে না। ...

চতুর্থতঃ—যাক, উহারাই কি যথেষ্ট নহে?—

মাতঙ্গিনী কিছু বলেন না।

যম তাঁহাকে দু' দু'বার দাগা দিয়াছে—

তাঁর বধূ-জীবন আর মাতৃ-জীবনের চির-লালিত আকাঙ্ক্ষাটি সেই নিষ্ঠুর উপড়াইয়া লইয়া পায়ে দলিয়া দিয়াছে... সেই বিবর্ণ অকালে হৃদয়চ্যুত প্রিয়তম বস্তুটির দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক কাঁপে। ... নিজের ক্লেশ ভুলিয়া তিনি পুত্রের কথাই ভাবেন ... সে বুঝি অসুখী হইবে। ...

সেদিকে নিস্তার পাইয়াও ভূতনাথ পিতৃদেবের অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হইয়াই একদিন বলিয়া দিল,—যা ইচ্ছে করুন ...

বলিয়া সে বোধ হয় কাঁদিতেই উঠিয়া গেল।

উল্লাসের বিস্তৃত হাসিতে কৃষ্ণকান্তের মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল।—

পণ ও পাত্রী ঠিকই ছিল—

দু'দশদিন অগ্রপশ্চাৎ কৃষ্ণকান্ত দুটিকেই ঘরে তুলিলেন। ...

পণ আটশত টাকা।

ভূতনাথের বৈবাহিক জীবনে আরো খানিকটা খাদ মিশিলেও, পাত্রীর রং ময়লা বলিয়া খাদের কথা ও-পক্ষকে কৃষ্ণকান্ত বিন্দুমাত্রও তুলিতে দিলেন না।—বীণাপাণির রং সুবিধার নয়, কালোই। সুবিধার মধ্যে তার চক্ষু দুটি আর ভ্রূযুগল ; ভুরু দু'টি টানা টানা ; চক্ষু দু'টি আবেশে ভরা।—

মাতঙ্গিনীর নিজের সুখ-দুঃখ কোনোদিনই তাঁর অন্তরের একান্ত নিজস্ব জিনিষ হইয়া উঠিতে পারে নাই, ... জলের উপর পদ্মপত্র যেমন ভাসে তেমনি করিয়া মাতঙ্গিনীর সর্বান্তঃকরণ সংসার-পাথারের বুকের উপর ভাসিয়া বেড়ায় ... পাথারে ঘা লাগিলেই তাহার বুক দুলিয়া উঠে।—

মাতঙ্গিনী চোখে জল আসিতে দিলেন না—

স্বামী তৃপ্ত হইবেন,

পুত্র প্রীত হইবে,

অম্লানবদনে তাই তিনি বীনাপাণিকে তেমনি সোহাগে বরণ করিয়া লইলেন ; এবং তাঁহারই হৃদয়ের গাঢ় রসে নববধূ নূতন ভূমিতে পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ...

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—বৌ কেমন হয়েছে গো?

মাতঙ্গিনী বলেন,—লক্ষ্মীটি।

কৃষ্ণকান্তের মনে পড়ে—বিগত দু'টির সম্পর্কেও মাতঙ্গিনী ধনধান্যদায়িনী ঐ দেবীটিরই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। ... একটা গল্প তাঁর মনে পড়িয়া যায়—

কোথাকার এক তাঁতি ...

কিন্তু গল্পটি তাঁর বলা হয় না—মাতঙ্গিনীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছোট্ট একটি অস্ফুট শব্দ তাঁর কানে আসে।—

দেবনাথ বলে,—এই বৌদিই আসল বৌদি। আগের দু'টো ভালো ছিল না। ... একটু থামিয়া আবার বলে,—প্রথমটা ছিল নেহাৎ ছোট,—গরজ বুঝত না। তার পরেরটা ছিল বদমেজাজী। এইটে বেশ ...'

মাতঙ্গিনীর প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে ; বলেন,—বেশ কিসে রে?'

—কথায় বার্তায় আলাপে আদরে বেশ।

শুনিয়া, প্রখর মধ্যাহ্নের উপর মেঘের চঞ্চল ছায়ার মত, মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর দিয়া কিসের একটা সুখকর সুশীতল মৃদুস্পর্শ ভাসিয়া যায়। ... কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চমকিয়া ওঠেন। ... সারাজীবন ভরিয়া শুধু মানুষকে আপন করিয়া তুলিয়া তিনি দিনান্তের বহু পূর্বেই তাহাকে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন ... তবু আপন করিয়া লইবার মহালোলুপতা তাঁর আজিও তেমনি জাগ্রত ... মাতৃ-হৃদয়ের সে ক্ষুধা যম হরণ করিতে পারে নাই। ... প্রাণপণে সেই ক্ষুধাটিকে দমন করিবার চেষ্টা তাঁর আসিয়াছে। ... কিন্তু এ যে কথায়-বার্তায় আলাপে-আদরে বেশ।

ভূতনাথ মণিকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে লইত—

তার ঘোমটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত—

কত খেলা, কত আমোদ, কত কৌতুক। ...

অনুপমাকে সে লুকাইয়া দেখিত, হঠাৎ দেখা দিত। নিজেকে সহস্র চতুর অভাবনীয় উপায়ে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইত।

কিন্তু বীণাপাণির কাছে সে আসে শান্ত হৃদয়ে ... ঝড়ের পর ঢেউ আপনি থামিয়া স্রোতের অন্তর ব্যাপিয়া শুধু একটা নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে।—

বীণাপাণি জানে, স্বামী পূর্বে দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন। স্ত্রী দু'টিই সুন্দরী ছিল।—

সে কালো।—

মাতঙ্গিনী দুরু দুরু বুকে ভাবেন, ছেলে অসুখী না হয়।

তাঁর মনের দুশ্চিন্তা মনেই পরিপাক পাইতে পাইতে সহসা এক সময় দুঃসহ হইয়া শুধু একটি প্রশ্নেই আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। ... বলেন,—সব জানো ত' বৌমা, আগেকার কথা?

বীণাপাণির বুঝিতে কিছুই বাকি থাকে না। বলে,—জানি, মা। ... তারপর মনে মনে বলে, আমি যে কালো।—

মাতঙ্গিনী তার মনের কথা কী করিয়া টের পান বীণাপাণি তা জানে না ; তার মুখচুম্বন করিয়া বলেন,—মা আমার কালো ; কিন্তু কালোতেই কেমন মানিয়েছে।

এটা সান্ত্বনার কথা—

শাশুড়ির এই মমতার্দ্র ছলনায় বীণাপাণি একটু হাসে। হাত বাড়াইয়া শ্বশ্রূর পায়ের ধূলা লইয়া বলে,—তুমি ভেবো না, মা ...

মাতঙ্গিনী অবাক হইয়া যান—

তাঁর লুক্কায়িত উদ্বেগ কি করিয়া বধূর কাছে ধরা পড়িল! ...

আশীর্ব্বাদ করেন,—জন্ম এয়োতি হও।

মণি শাশুড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিত—কতক ভয়ে, কতক কৌতুকে ; মনের কথা সে বুঝিত না ; কাজ পণ্ড করাই তার দস্তুর ছিল, দৈবাৎ উৎরাইয়া যাইত। ... মাতঙ্গিনী বকিয়া ঝকিয়া পরক্ষণেই তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইতেন। ... মণিকে তিনি আপন পেটের অবোধ সন্তানের মতো ভালবাসিয়াছিলেন।—

অনুপমা প্রকাশ্যে একেবারে হাতে-কলমে পায়ে না ঠেলিলেও, আমল প্রায়ই দিত না। ... দরদ বোঝা আর বুঝিয়া দেখা তার বড় ছিল না। ... তবু মাতঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন—পুত্রের প্রিয়তমা বলিয়া। ... অলক্ষ্যে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, বধূকে পাইয়া পুত্র এক হিসাবে চরিতার্থ হইয়াছে।—

কিন্তু বীণাপাণি একেবারে অন্যরকম—

অতিশয় শান্ত, অথচ এমন তীক্ষ্ণধী যে মাতঙ্গিনীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না—কি করিয়া অতটুকু মেয়ে তাঁর মনের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত একেবারে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।—

মাতঙ্গিনী পরের হাতে সেবা কখনো পান নাই। সেবা কি মধুর সামগ্রী সে স্বাদ তিনি বীণাপাণির হাতে প্রথম পাইলেন—

অলক্ষ্যে থাকিয়াই মাতঙ্গিনীর সর্বান্তঃকরণ অশেষ সুখের সঙ্গে অনুভব করে, পুত্রের মন বসিতেছে। ... এ বসায় কলরব নাই, উদ্দামতা নাই, বিক্ষোভ নাই ; জয়-পরাজয়ের শঙ্কার নিঃশ্বাসে তাহা উত্তপ্ত নহে ... এ বসা শুধু একটা রস-ঘন নির্মল মধুরতার মাঝে নিষ্কম্প শান্ত আত্মসমর্পণ।—

ভূতনাথের পয়সা হইয়াছে।—

কিন্তু সব জিনিষেরই 'মূল্যাদি' অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় সংসারের 'নাই নাই' রবটা যেন থামিয়াও থামে না।...

মাঝে-মাঝে কৃষ্ণকান্তের নামে মণি-অর্ডারে টাকা আসে ; কে পাঠায়, কেন পাঠায়, কে জানে ; কৃষ্ণকান্ত সাবধানে লুকাইয়া টাকাটি গ্রহণ করেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কিছুই লুকান রহিল না। ...

দূরের এক রোগীর লোক আসিয়া কৃষ্ণকান্তকেই চাহিয়া বসিল—তাঁহার পরিবর্তে তরুণ কবিরাজ ভূতনাথকে সে কিছুতেই মঞ্জুর করিল না ... রোগ বড় কঠিন—

কৃষ্ণকান্ত অতীব অনিচ্ছার সহিত পাল্কীতে যাইয়া উঠিলেন ; এবং তাঁহার পাল্কীও দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল, মনি-অর্ডারও আসিয়া পড়িল।—

বীণাপাণির পিতা পাঠাইয়াছেন, দশটি টাকা।—

ভূতনাথের বুদ্ধি কলাপ অধ্যয়নকালেই স্থূল ছিল ; কিন্তু আজকাল অন্ততঃ বহিরাবরণ ছিন্ন করিবার মত ধারালো হইয়াছে। ... টাকা দশটি পুরোভাগে রাখিয়া হুঁকায় দুটি টান দিতেই সমগ্র ব্যাপারটি তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ... রঙের অপরাধে পুত্রবধূর পিতাকে মাসে মাসে জরিমানা দিতে হইতেছে।—

... এবং এই ব্যাপারে গুরুর সুদুর ইতিহাসটাও তার অজ্ঞাত রহিল না ... অপরাজিতাটিকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় গোলাপ আহরণ করিয়া আনিবেন যদি—

ঐ এক কথাতেই বিষম ভয় পাইয়া কালো মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে সংযত রাখিতেছেন। ...

আরো একটা নিদারুণ অতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ ধীরে ধীরে ভূতনাথের মনে স্থিতিলাভ করিতেছিল। ... কি হেতু অবলম্বন করিয়া এই অসহ্য সন্দেহের উদ্ভব তাহা

তাহার নিজের কাছেই একটা দুরূহ হেঁয়ালির মত ; অথচ সন্দেহটা যে আদৌ অমূলক নয় এ বিশ্বাসও অনিবার্য, যেন নিজেই তৈরী হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের পাল্কী অনেক বেলায় উঠানে আসিয়া নামিল ; এবং তিনি বিশ্রামের জন্য অন্দরে না যাইয়া হাঁসফাঁস করিতে করিতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই এমনভাবে থমকিয়া গেলেন যেন চুরি করিতে আসিয়া অন্ধকারে একেবারে পাহারাওয়ালারই ঘাড়ে পড়িয়াছেন।—

ভূতনাথের কোলের কাছেই দশটি টাকা সাজান রহিয়াছে, এবং তাহার শ্বশুরের নামসম্বলিত কুপনখানিও রহিয়াছে... তাহারাই এই মহৌষধির কাজ করিয়াছে।

ভূতনাথ টাকা দশটির দিকে চাহিয়া বলিল,—শ্বশুর আপনাকে দশটি টাকা পাঠিয়েছেন। কেন?

কৃষ্ণকান্ত সহসা প্রগলভ হইয়া উঠিলেন, তর্‌তর্ করিয়া বলিয়া গেলেন,—তোমাকে বোধহয় সাহায্য করেছেন। অতি অমায়িক সজ্জন তিনি। একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলাম তোমার কথা, যে শ্রীমানের বড়ো টানাটানি ; তাই বুঝি তিনি মেয়ে-জামাইকে—

বলিতে-বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যেন বাঁচিলেন।

কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি অতো সুলভে নিষ্কৃতি পায় না।—

ভূতনাথের পিতৃভক্তি যেন পিতাকেই পদে পদে তেমনি সবেগে অনুসরণ করিয়া নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া গেল। ... তাঁহার উচ্চারিত মিথ্যা কথাগুলির বিনাশ কিন্তু অতো সহজে ঘটিল না ... তাদের ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়া প্রতি মুহূর্তে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দুর্ভাগ্য ভূতনাথের কর্ণবিবরে আবর্তিত হইতেই লাগিল।

ভূতনাথের শ্বশুর আর টাকা পাঠান না ; ভূতনাথ অভয় দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। সুযোগ পাইয়া অর্থাৎ জামাতাকে নিজের তরফে পাইয়া, বলরামবাবু কৃষ্ণকান্তকে স্পষ্ট ভাষায় ধাপ্পাবাজ, অর্থপিশাচ প্রভৃতি কুকথা না বলিলেও, পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা লাঠি উল্টাইয়া ধরিলে কোঁৎকার মত একই জিনিষ।

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছেন। ... জন্মদাতা পিতার অপেক্ষা কন্যাদাতা পিতা সম্পর্কে হইল বড় আর তারই স্বার্থ হইল বড়! ... অমন ছেলের—ইত্যাদি। ... অসহ্য হইয়া সংস্কৃত এক শ্লোকই তিনি আওড়াইয়া দিলেন।

মূর্খ পুত্রের জন্মদাতার যত কষ্ট সব সেই শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।

বীণাপাণির জ্বর।

জ্বর অল্প ; কিন্তু তাহাতেই মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর পৃথিবীর দুশ্চিন্তা দাবাগ্নির দাহ লইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ... আকুলিবিকুলি কেবলই মধুসূদনকে ডাকিয়া-ডাকিয়া উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে তাঁর জিহ্বা শুকাইয়া অনড় কাঠ হইয়া গেছে। ...

আর দুটি এমনি করিয়াই মায়া কাটাইয়াছিল।

কিন্তু এবার মধুসূদন তাঁহার ডাকে বিচলিত হইয়া প্রাণরক্ষার দূত পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর বীণাপাণি একলাটি শুইয়া আছে ; মাতঙ্গিনী এতক্ষণ তাহাকে কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিলেন ; তাহাকে পথ্য দিয়া এইমাত্র উঠিয়া গেছেন।

—বৌমা, কেমন আছ? বলিয়া কৃষ্ণকান্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীণাপাণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,—ভালই আছি, বাবা।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, কিছু খেয়েছো?

খেয়েছি।

কখন?

এখুনি খেলাম।

—তবে কিছুক্ষণ বাদে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো। বলিতে-বলিতে কাপড়ের খুঁটের আড়াল হইতে খল বাহির করিলেন। বলিলেন,—জ্বর যদি আবার আসে তবে ছেলেমানুষ বড় কষ্ট পাবে ; আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভাল। এই খাটের পায়ার কাছেই রইল কাগজ-ঢাকা। নিজেই উঠে খেয়ে ফেলো।

বীণাপাণি কহিল,—আচ্ছা।

ভূতনাথ কোথায় ছিল কে জানে—

কৃষ্ণকান্ত বাহির হইয়া যাইতেই সে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—বাবা এসেছিলেন দেখলাম। তিনি কি ওষুধ দিয়ে গেলেন?

বীণাপাণি বলিল,—হ্যাঁ, কেন?

স্বামীর কণ্ঠস্বরের অর্থটা সে বুঝিতে পারিল না।

খাওনি ত?

বীণাপাণি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। ... এ ব্যাকুলতার অর্থ কি? বলিল,—না। কেন বলো না?

—কোথায় সে ওষুধ?

খাটের ঐ পায়ার কাছে ঢাকা রয়েছে দেখো।

ভূতনাথ ঔষধের খল লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুঁজিয়া সট্‌কা টানিতেছিলেন—

কিন্তু এ-সুখ তাঁর অদৃষ্টে টিকিল না। ...

মানুষের পায়ের শব্দে চোখ খুলিয়াই তিনি সামনে যেন ভূত দেখিলেন—এমনি অপরিসীম ত্রাসে তাঁর সর্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া মুখ দিয়া কেবল একটি অর্ধোচ্চারিত স্বল্পজীবী আর্তনাদ বাহির হইয়াই কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। ...

ভূতনাথ সেদিকে দৃকপাতও করিল না ; একটু হাসিয়া বলিল,—এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল না, বাবা। পারেন ত নিজেই খেয়ে ফেলুন। বলিয়া সে ঔষধসমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটী যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকাল বেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া দুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তেলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতেছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটী বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে? দাও না একটা ঘটী? আঃ ক্ষেন্তি টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত সুরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল—ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন—কেন ... কি আবার ... কি ...

অন্নপূর্ণা পূর্বাপেক্ষাও শান্ত সুরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি—ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জান না, কি খোঁজ রাখ না। অত বড় মেয়ে যার ঘরে, সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পার? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জান?

সহায়হরি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? ... কি গুজব?

কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ি। কেবল বাগ্‌দী দুলে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।—সমাজে থাকতে হলে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ সুরেই পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো, তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হলো না—ও নাকি উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ বলবে না—যাও, ভালোই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী বাগ্দী-বাড়ী উঠে-ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকি আছেন কালীময় ঠাকুর!—ওঃ!

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা, না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই, চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?—আর সত্যিই তো, এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল। হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হলো যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই? ... পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার সুর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কী দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে! ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ও! এ যে ...

চোদ্দ-পনের বছরের একটি মেয়ে আর-দুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে, হল্‌দে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল, মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে। ছোট মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা দুই-তিন পাকা পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা দু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া

পশ্চাদ্বর্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া বুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে,—তোমার বাবার কাছে আরদিনকার দরুণ দু'টো পয়সা বাকি আছে ; আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার দু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা বললে, নিয়ে যা—কেমন মোটা মোটা ...

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা! আহা, কি অমর্তই তোমাকে তারা দিয়েছে। পাকা পুঁইডাটা, কাঠ হয়ে গিয়েছে, দু'দিন পরে ফেলে দিত ... নিয়ে যা, আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটতে হলো না! যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে ... ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না এ-পাড়া সে-পাড়া ক'রে বেড়াতে। বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না? ... কোথায় শাক, কোথায় বেগুন ; আর একজন বেড়াচ্ছেন—কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ ... ফেল্ বলছি ওসব ... ফেল্।

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন,—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো ... ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো ...

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া, খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড় বোঝা আঁকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল। ... সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে ... তুমি আবার ... বরং ...

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কিসের! এক-পাড়া থেকে আর-একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁইশাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা ... তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয় ...

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস

হোক, পুই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুরবেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না—নিঃশব্দে খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।...

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা, অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্ধেক সব মিলে তোমাদের ...

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী দোরের আশে পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকিগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁই শাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু-এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁইশাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁইশাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত সুরে বলিলেন—সে-সব দিন কি আর আছে ভায়া? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে ... স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেব না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধরে প'ড়ে মেয়ের বিয়ে দেয়, তবে রক্ষে! তারা কি স্বভাব? রাম বল, ছ-সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয়! পরে সুর নরম করিয়া বলিলেন—তা সমাজের সে-সব শাসনের দিন কি আর আছে? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশি দূর যাই কেন, এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের—

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয় ...

আহা-হা, ... তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তর আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উঞ্ছগণ্ড

করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকি, এই তো ... সমাজে ব'সে এ-সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল ... পাত্তর, পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে পাত্তর মেলে না? গরীব মানুষ, দিতে থুতে পারবে না বলেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর, শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টী আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল! দুই ভায়ের অভাব কি? ...

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধার ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্যন্ত বাকি—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এরকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবীলেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল...

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন—যা শীগগির শাবলখানা নিয়ে আয় দিকি। কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার শাবল দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল—ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার যোগাড় করিতেছেন—মুখুয্যে বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল—খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে

খুড়ী মাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে?

মুখুয্যে বাড়ী ও-পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁটা, রাংচিতা, বনচালতা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজঝোলা হল্‌দে পাখী আমড়া গাছের এ-ডাল হইতে ও-ডালে যাইতেছিল।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখীটা।—পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্ খুপ্ করিয়া আওয়াজ হইতেছিল ... কে যেন কি খুঁড়িতেছে ... দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণ সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা খানিকদূর যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্ খুপ্ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই মা, এক্ষুণি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো-ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও-পাড়ার ময়শা চৌকীদার রোজই বলে কর্তা ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিকে তোমাদের পায়ের ধূলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি, তা দাদাঠাকুর বরং...

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি! না...আমি কখন্?...কক্ষনো না, এই তো আমি...। সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।...আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি...দুর্গার মা

ডেকে পাঠিয়েছিল, ও-পাড়ায় যাচ্ছি, শুনলাম বরোজপোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ...তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ...তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে, যা করতে ইচ্ছে হয় কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্য?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন ; কিন্তু স্ত্রীর চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও যোগাইল না, বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্বাপর্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া, বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি, এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মার নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু'জনে মিলি তুলে এনেছিস, না?

ক্ষেন্তি মার মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া একবার ভূপতিত আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মার মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল ; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া সুরে বলিলেন—কথা বলছিস না যে বড়? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মার মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, উত্তর দিল—হ্যাঁ।

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—পাজী আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতে। সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই এক গলা বিজন বন, যার মধ্যে দিন দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল...তুলে? যদি গোঁসাইরা চৌকীদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাত? আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব, তা ব'লে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব মা?

দু-তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধুলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস...

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙ্গা পাঁচিলের ধারে যে-ছোট খোলা জমিতে কতকগুলি পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল, ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারির আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি বদ্ধ হইয়া ফাঁসি হইয়া যাওয়া আসামীর মতন উর্ধ্বমুখে একখণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাতত বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—দূর পাগলী, এখন পুঁই ডাঁটার চারা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে মরে যাবে?

ক্ষেন্তি বলল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে।...একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুজ্যের বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়হরি বলিলেন—হ্যাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায়ে দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত?

আচ্ছা দিচ্ছি বাবা—কই শীত, তেমন তো...

—হ্যাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে?—সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভালো করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এখন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?...

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিত রূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিফু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতেছিলেন—একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর

নীচে একটা কলার পাতা পাতিয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড় চোপড় শাস্ত্রসম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত-পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধী হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল—মা, ঐ একটু।

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধীর প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজ মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাতখানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মার সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু...

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধ নেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল মালাটা, ওতে তোর জন্য একটু রাখি।...ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের মালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশি করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজমেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ-বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ও-বেলা ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও-বেলা তো পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি এইসব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন, আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদীর ওই সব কথা। খেঁদীর মা তো ভারি পিঠে করে কি না! ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হলো? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা ধরা গন্ধ...আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপটায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মার চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে ব'সে খাস্ নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐদিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘন্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি, গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি জল-দেওয়া ভাত আছে ও-বেলার, বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালোবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই মেজো মেয়ে পুঁটি খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্টি খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে। সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশখানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি, আর নিবি?...ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্তভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসিভরা চোখে মার দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নাও, ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলা তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালোমানুষ, কাজ-কর্মে বকো, মারো, গাল দাও, টু শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি কোনোমতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন

না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিসম্পন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ী, সিমেন্ট চুণ ও ইটের ব্যবসায়ে দু পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কি না!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশি, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়াই আমলকীতলায় বোহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং-এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ এবং একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময়ে ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও—দু'টো মাস তো—

ও-পাড়ায় ঠানদিদি বলিলেন—তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমি সুরে বলিল—না, যাবে না বৈকি।...দেখো তো কেমন না যান্।...

ফাল্গুন-চৈত্র মাসের বৈকালবেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত...তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জাহীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বলব একটা কথা? ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি-করিবার জন্য ময়দা চটকাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—নাঃ, সব তো আর ... তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব। ... তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ-ছ'টি টান দিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকি ছিল, বললে, ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার ...

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পুজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কম হবে না ভেবে দেখলাম কিনা? মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে ... ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খায় ... আরও কত কি? পৌষ মাসে দেখতে গেলাম, মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে? ...

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে মিনিট কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোনো কথা শুনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষমাসের দিনে মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে! পরে বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোট লোক কি বড় লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকি নেই। বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি প্রাচীন ...। আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা হা করিয়া খানিকটা হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থনসূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বার কতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হলো। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পুজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে ...

—দেখতে পাওনি?

—নাঃ। এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। ... যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল। ... চার কি ঠিক করলে? ... পিঁপড়ে টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না। ...

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্বণের দিন। এবার পৌষমাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরু চাক্‌লি পিঠের জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুটি ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে না, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন?

পুঁটি বলিল—আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধরে উঠবে ...

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে এসে বোস না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোয়ানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল ... খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন ... দেখিতে দেখিতে মিঠে আঁচে পিঠে টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল। ...

পুঁটি বলিল—মা, দাও, প্রথম পিঠেখানা কাঁনাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে। ...

পুঁটি ও রাধী খিড়কী দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটি পিঠেখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ...

পুঁটি ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুঁটি বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম ...

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে ... রাতও তখন খুব বেশী। ... জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠঠোকরা পাখী ঠক্‌-র্‌-র্‌-র্‌ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে ... দুই বোনের খাইবার জন্য কলার পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালোবাসত ...

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনাআপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল ... সেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায় পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ... বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে ... সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।

না

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আট বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল যে হত্যাকাণ্ড, তাহারই বিচার। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দীর্ঘ আট বৎসর পরে দায়রা আদালতে তাহারই বিচার হইতেছে। আগামীকাল নিহত কালীনাথের স্ত্রী ব্রজরানীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।

ব্রজরানী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ধ্যানস্তিমিতার মত বসিয়াছিল ; হরদাসবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া একেবারে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—এই যে ব্রজ।

ব্রজ মুখে কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিল মাত্র। হরদাসবাবু বলিলেন, কাল তোর সাক্ষীর দিন। মনকে একটু শক্ত করে নে ভালো করে। আমি বরং কাল সকালে তোকে তোর প্রথম এজাহারটা ভালো করে শুনিয়ে দেব।

হরদাস আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ভালো করিয়া শুনাইয়া দিবে! মনে করাইয়া দিবে! ব্রজরানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিল। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ রেখায় পরিস্ফুট নিঃশব্দ হাসি, হাসির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় চোখ দুইটি স্তিমিত হইয়া আসিল ; উত্তেজনাহীন স্থির হিমশীতল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচিত্র সে হাসি!

ব্রজরানীর মনে বাটালির আঘাতে কাটিয়া গড়া পাথরের মূর্তির মত সে ছবি অঙ্কিত হইয়া আছে, সে কি মুছিবার, না মুছিয়া যায়!

হতভাগ্য নিহত কালীনাথের বিধবা স্ত্রী ব্রজরানী।

উঃ! সে ভীষণ শব্দ! সে যেন মৃত্যুর হুঙ্কার ধ্বনি। বার বার। হাতটা প্রথম ভাঙ্গিয়া গেল ; তারপর আবার, তারপর আবার, বারবার রক্তাপ্লুত দেহে স্বামী তাহার লুটাইয়া পড়িল তাহার চোখের সম্মুখে।

ব্রজরানী সে মূর্তি স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, সভয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া সে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল। স্বামীর সেই রক্তাক্ত মূর্তি আজও তাহাকে আতঙ্কিত করিয়া অস্থির করিয়া তোলে। প্রায় রাত্রেই স্বপ্নে সেই মূর্তি দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার মা তাহার পাশে শুইয়া গায়ে হাত দিয়া থাকেন, সেই

অভয় স্পর্শ নিদ্রার মধ্যেও অনুভব করে। সে হাত কিছুক্ষণ সরিয়া গেলেই আতঙ্কে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়।

ব্রজরানী ত্রস্ত পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইতেই মা প্রশ্ন করিলেন, কি রে? এমন করে—প্রশ্নের আধখানা বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন, তাঁহার নিজের মনই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে।

ওদিকে বারান্দায় এক ভ্রাতৃবধূ যেন শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, বাপের জন্মে এমন ভয় দেখিনি কিন্তু। আজ আট বছর হয়ে গেল—

মা শাসন-কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, বউমা!

বধূ মুখ বিকৃত করিয়া একটা ভঙ্গি করিয়া নীরব ইঙ্গিতে বাকি মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া তবে ছাড়িল। মা ব্রজরানীকে কাছে বসাইয়া তাহার রুক্ষ চুলের বোঝা লইয়া বসিলেন, পিঙ্গল রুক্ষ চুলে জটিলতার আর অন্ত নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রজরানী আজও তেল ব্যবহার করে নাই।

ব্রজরানীর বড় ভাই হরদাসবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন—মা!

মা মুখ তুলিয়া হরদাসের দিকে চাহিলেন ; হরদাস বলিলেন, একটা কথা ছিল মা।

—কি বল?

—একটু উঠে এস।

—এইখানেই বল না।

একটু ইতস্তত করিয়া হরদাস বলিলেন, সেই ভালো। ব্রজরই শোনা দরকার বিশেষ করে। —আবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, মানে—ব্রজরানীর ছোট মামাশ্বশুর আর ওঁদের বেয়াই এসেছেন দেখা করতে।

মামাশ্বশুর? ব্রজরানীর স্বামী হন্তার পিতা আর তাহার শ্বশুর? ব্রজরানীর মায়ের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজরানী চঞ্চল হইয়া মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিল, যেন মামাশ্বশুর কাছেই কোথাও রহিয়াছেন। মা বলিলেন, কেন? কি জন্যে? কি দরকার তাঁর? কেন তিনি বারবার আসেন? উত্তরোত্তর তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

হরদাস বলিলেন, বলবেন আর কি? সেই কথা—ক্ষমা। যা হয়েছে তার উপর হাত নেই। এখন ভিক্ষা, ক্ষমা—কোনো রকমে ক্ষমা—

—ক্ষমা?—মা কঠিন হাসি হাসিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, তাঁকে বাইরে বাইরে বিদেয় করে দেওয়াই তোমার উচিত ছিল বাবা।

—সে কি আর আমি বলি নি মা!—বলেছি—বার বার বলেছি ; কিন্তু আমার হাতে ধরে ভদ্রলোক ছাড়েন না। শেষে পায়ে ধরতে উদ্যত।

—তাহলে তাঁকে বল গে, ব্রজ আমার আজ আট বৎসর তেল মাখেনি, এই দিনটির জন্যে। ক্ষমা কি করে করবে?

হরদাস নীরব হইয়া রহিলেন, আবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, আর একটা কথা মা। আমাকে যেন ভুল বুঝো না। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলতে। অনন্তর শ্বশুর বললেন, আমার মেয়ের প্রতি দয়া করতে হবে। যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তার পূরণ আজ ভগবানও করতে পারেন না। তবে মানুষের দ্বারা যেটুকু সম্ভব, যতটুকু পারা যায়—ব্রজর ভবিষ্যৎ আছে, তার ছেলেকে মানুষ করতে হবে—

বাধা দিয়া মা বলিলেন, মানে—টাকা দিতে চান, এই তো?

জ্যা-মুক্ত শরের মত মুহূর্তে ব্রজরানী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া গেল, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না।

তারপর দৃঢ়পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্ত মামাতো ভাই, কালীনাথ তাহার পিতৃষ্বসাপুত্র। কালীনাথ বয়সে কিছু বড়। কিন্তু যৌবনের একটা কোঠায় বিশ-ত্রিশের ব্যবধান বন্ধুত্বের সেতু বন্ধনে স্বচ্ছন্দে বাঁধা যায়, এ তো বৎসর-চারেকের ব্যবধান। সেই সেতুবন্ধনে অনন্ত এবং কালীনাথ পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছিল। ভোর না হইতেই অনন্ত আসিয়া ডাকিত, কালী দা! বাপ্‌স্, কি ঘুম তোমার! তাহার কাঁধে এক বন্দুক, পকেটে পকেটে বোঝাই কার্তুজ।

কালীনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবামাত্র সে উনানের ধারে উনান জ্বালিতে বসিয়া যাইত। কালীনাথ তখন অবিবাহিত, সংসারে বাপ-মা ভাই-ভগ্নী কেহ নাই, বাড়িটা দুই তরুণের খেয়াল ও খুশীমত চলিবার একটি কল্পরাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কালীনাথ হাত-মুখ ধুইতে ধুইতে অনন্ত চা তৈয়ারী করিয়া দুইটি পেয়ালায় পরিবেশন করিয়া ফেলিত, তারপর গতরাত্রের উদ্বৃত্ত পাখির মাংস সহযোগে প্রাতরাশ সারিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরের জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইত। গ্রাম পার হইয়াই কালীনাথ পকেট হইতে ছোট কল্কে, সিগারেট মিক্‌শ্চার, আরও দুই-একটা সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিত। অনন্ত তৃষ্ণার্তের মত বলিত, হ্যাঁ, দাও, নইলে জমছে না। চোখের টিপ, বুঝছ কি না—ও না হলে ঠিক আসে না।

অনন্ত নিতান্তই অল্পশিক্ষিত, মূর্খ বলিলেও চলে। কালীনাথ শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ-উপাধিধারী ; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেও ঐ নেশায় আসক্ত। শুধু আসক্তই

নয়, এ বিষয়ে অনন্তের গুরু সে-ই। তাহাদের দুইজনের মিলনের সেতুবন্ধনে এই বস্তুটিই ছিল কাঠামো।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অনন্ত রিপীটারটা খুলিয়া একেবারে ছয়টা কার্তুজ ভর্তি করিয়া বলিত, ব্যাস। চল এইবার। হাত কিন্তু আমার নিশপিশ করছে, কি মারি বল তো?

—দে, একটা মানুষই মেরে দে।

—বেশ, দাঁড়াও তুমি, এখানে মানুষের মধ্যে তুমি।—অনন্ত বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। কালীনাথ সভয়ে সরিয়া গিয়া বলিত—এই, এই অনু, ওসব ভালো নয় কিন্তু। বাবা! ও হল যমদ্বার, চাবি টিপলেই দোর খুলে যাবে।

অনু হি-হি করিয়া হাসিয়া বন্দুকটা ফিরাইয়া লইত ; কালীনাথ একটা গ্রামান্তরযাত্রী কুকুরকে অথবা আকাশচারী কোন পাখিকে দেখাইয়া দিত—ওই মার না, মারবার জানোয়ারের অভাব! অনন্ত মুহূর্তে বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। প্রান্তরের অনভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে অপরিচিত দুইজন মানুষের হাতে লাঠির মত অস্ত্রটাকে দেখিয়া ভীত কুকুরটার লেজ আপনি নত হইয়া আসিত, ভীত মৃদু শব্দ করিয়া সে ছুটিয়া পলাইত, কিন্তু অনন্তর লক্ষ্য অব্যর্থ। গতিশীল জীবটা কোনো-না-কোন অঙ্গে আহত হইয়া আর্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িত, কখনও মরিত, কখনও মরিত না। না মরিলে কালীনাথ বলিত—দে, আমাকে দে তোর বন্দুকটা, বড় জানোয়ার—হাতের টিপ করে নিই।

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া গুলির পর গুলি ছুঁড়িয়া সেটাকে সে বধ করিয়া হাসিয়া বলিত—একেই বলে কুকুর-মারা, অাঁ!

—চুপ।

—কি?

—মাথার ওপর পাখার শব্দ শুনছ! হরিয়ালের পাখার শব্দ। বসে পড়, গুঁড়ি মেরে বসে পড়।

তারপর বন্দুকের শব্দে, পাখির ভয়ার্ত কলরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি চকিতে আলোড়িত হইয়া উঠিত। পিছনে জুটিত ছেলের দল, তাহারা হত্যার আনন্দ উপভোগ করিত, আর সংগ্রহ করিত কার্তুজের খালি খোল।

একসঙ্গেই দুইটি বিবাহের উদ্যোগ হইয়াছিল। ব্রজরানীর পিতার বংশ, চাকুরের বংশ—দুই পুরুষ সরকারী চাকরি করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা

খুঁজিতেছিলেন—প্রতিষ্ঠিতনামা ধনীর ঘরের ছেলে। ওদিকে কলিকাতার নিকটবর্তী এক প্রাচীন জমিদার-বাড়ি আধুনিক-আলোকপ্রাপ্ত হইয়া খুঁজিতেছিলেন—বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের পাত্র। সন্ধানী ঘটক দুই বিভিন্ন স্থান হইতে এই দুই সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল। একপক্ষের জন্য অনন্ত ও অন্য পক্ষের জন্য কালীনাথকে সে খুঁজিয়া বাহির করিল। অনন্ত খুশী হইয়া বলিল—দাদা, তোমার পাত্রী দেখতে যাব আমি, আর আমার পাত্রী দেখতে যাবে তুমি।

কালীনাথ অনন্তর পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, একসেলেন্ট আইডিয়া! বহুত আচ্ছা ব্রাদার আমার রে!

ব্রজরানীকে দেখিয়া কালীনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল। তারপর সে দুইখানি বেনামী পত্র লিখিয়া বসিল। ব্রজরানীর পিতাকে লিখিল, বড়লোকের ছেলে অনন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে নেশাখোর, দুর্দান্ত, গোঁয়ার। সকল রকম নেশাতেই সে অভ্যস্থ, তাহার উপর চরিত্রহীন।

আর তাহার যেখানে সম্বন্ধ চলিতেছিল, সেখানে লিখিল, কালীনাথ এম. এ. পাশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু নিতান্ত হাঘরে বংশের ছেলে। তাঁহার পিতা সরকারী চাকরি করিয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষেও অকিঞ্চিৎকর। আরও একটি কথা, ছেলেটি বড় হীন স্বভাবসম্পন্ন। হীনতাটা তাহাদের বংশানুক্রমিক। পাঠ্যজীবনে কয়েকবার সহপাঠীদের বই চুরি করিয়া সে ধরা পড়িয়াছে। জ্ঞাতার্থে জানাইলাম, যাহা ভালো বিবেচনা হয় করিবেন।

তারপর ঘটকের চেষ্টায় ঘটিল অন্যরূপ। সম্বন্ধ অদল-বদল হইয়া গেল। ঘটক বর্ণনা করিল, কালীনাথের অবস্থা বেশ ভালোই, অর্থাৎ সূর্য থাকিলে যেমন চন্দ্রকে দেখা যায় না তেমনই মাতুলবংশ বিদ্যমান থাকিতে ভাগিনেয় চোখে পড়ে না—অন্যথায় চন্দ্রই তমোনাশ করিতে পারিত। আর অনন্ত পাশ না করিলেও লেখাপড়া বেশ ভালোই করিয়াছে, তাঁহাদের ডিগ্রীর প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন বিদ্যার। অতঃপর বিদ্বান কাহাকে বলে, সে বিষয়ে বক্তৃতাও সে খানিকটা করিল। ফলে পাত্রী ও পাত্র পরিবর্তন করিয়া দুইটি বিবাহই হইয়া গেল।

মাটির নীচে অন্ধকার রাজ্যের অধিবাসী উই ; মধ্যে মধ্যে আলোক কামনায় তাহাদের পক্ষোদ্গম হইলে আর রক্ষা থাকে না, তাহারা পিচকারির মুখে জলের মত গহ্বর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়। পাখার শক্তি অপেক্ষা অহঙ্কারই হয় অধিক। অনন্তর শ্বশুরদের অনেকটা সেই অবস্থা। রক্ষণশীল জমিদার-বাড়ির সকলে অকস্মাৎ অবরোধ ঘুচাইয়া আলোকের নেশায় ঐ পতঙ্গগুলির মতই ফরফর করিয়া উড়িতেছে।

ফুলশয্যার রাত্রেই বধূটি প্রশ্ন করিল, তোমার পড়ার ঘর বুঝি বাইরে?

অনন্ত প্রশ্নটা বেশ বুঝিতে পারিল না, বধূর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, পড়ার ঘর?

বধূটি সলজ্জভাবে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল—তোমার লাইব্রেরীর কথা জিজ্ঞেস করছি আমি।

—লাইব্রেরী! তারপর সোজাসুজি ঘাড় নাড়িয়া সে বলিয়া দিল, ওসব লাইব্রেরী-টাইব্রেরীর ধার-টার ধারি নে আমি। বছরে সরস্বতীর পুজো একদিন—পাঁঠা কাটি, ফিষ্টি করি, ব্যস।

বধূ স্তম্ভিত হইয়া অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে যে সেই শুইল, আর সাড়াও দিল না, উঠিলও না। সাধ্যসাধনার মধ্যে অনন্ত আবিষ্কার করিল, সে কাঁদিতেছে।

—কাঁদছ কেন? হল কি? শুনছ?

বধূ নিরুত্তর। অনন্ত আবার প্রশ্ন করিল—কি হল বলবে না? লক্ষ্মী, শোন, কথার উত্তর দাও।

—ওগো, আমাকে আর জ্বালিও না, তোমার পায়ে পড়ি।

কাতর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সুর গোপন ছিল না। অনন্ত একটু আহত না হইয়া পারিল না। তবুও সে আবার প্রশ্ন করিল—কি হল সেইটে বল না?

—আমার মাথা ধরেছে। —এবার বেশ পরিস্ফুট বিরক্তির সহিতই বধূ জবাব দিয়া বসিল। অনন্তও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ রাত্রি। শুধু তাহাদের বাড়ির পাশের সারিবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির কোনো একটির মাথায় বসিয়া একটা পেচক কর্কশ স্বরে ডাকিতেছে। অনন্ত বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসিল। তারপর অকস্মাৎ তাহার খেয়াল হইল, কালীদাদা কি করিতেছে দেখিয়া আসিলে মন্দ হয় না!

কালীনাথের বিবাহও এই বাড়ি হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান শেষ হইলে বর-বধূ আপনাদের বাড়িতে গিয়া সংসার পাতিবে। অনন্ত কালীনাথের ফুলশয্যাগৃহের দরজায় আসিয়াই শুনিল, ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে আলাপ চলিতেছে। সে কৌতুকপরবশ হইয়া কান পাতিল।

কালীনাথ বলিতেছে—তোমায় আমি রানী বলেই ডাকব। আমার হৃদয়-রাজ্যের রানী তুমি।

দূর, সে আমার লজ্জা করবে। তার চেয়ে সবাই যা বলে, তাই বলবে—ওগো।

—সে ত সকলের সামনে বলতেই হবে। কিন্তু তুমি আর আমি যেখানে শুধু, সেখানে বলব—রানী।

অনন্ত কালীনাথকে আর ডাকিল না, আপনার ঘরে আসিয়া আবার জানালার ধারে দাঁড়াইল। তাহার ভাগ্য! নতুবা এই মেয়ে তো তাহার স্কন্ধে পড়িবার কথা নয়!

নারিকেলগাছের মাথায় পেচকটা কর্কশ স্বরে আবার ডাকিয়া উঠিল। অকস্মাৎ অনন্তের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল ঐ কর্কশকণ্ঠ নিশাচর পাখিটার উপর। সে ঘরের কোণ হইতে তাহার রিপীটারটা লইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। আকস্মিক ভীষণ শব্দগর্জনে রাত্রিটা কাঁপিয়া উঠিল ; নারিকেলগাছের মাথাটায় একটা আলোড়ন বহিয়া গেল, কি একটা নীচে সশব্দে খসিয়াও পড়িল।

পিত্রালয়ে আসিয়া বধূটির পুঞ্জিত ক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। তাহার মুখ দেখিয়াই মা একটা আশঙ্কা করিয়াছেন। তিনি একান্তে ডাকিয়া মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে, তোর মুখ এমন ভার কেন রে?

মুহূর্তে কন্যা জ্বলিয়া উঠিল অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত—শেষকালে অশিক্ষিত মূর্খের হাতে আমাকে সঁপে দিলে তোমরা! একটা ফোর্থ ক্লাসের ছেলে যা লেখাপড়া জানে, ও তাও জানে না।

মা স্তম্ভিত হইয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, সকাল থেকে ব্যাধের মত পাখি মেরে মেরে বেড়ায়। গুণ্ডার মত একে মারা, ওকে চাবকে শাসন করাই হল গৌরবের কাজ।

অনন্ত বাহিরে বেশ গম্ভীরভাবেই বসিয়া ছিল, সহসা তাহার এক শ্যালক একখানা ইংরাজী বই আনিয়া বলিল, এই জায়গাটা বুঝিয়ে দিন না জামাইবাবু।

অনন্ত রহস্য-যবনিকার বহির্ভাগেই ছিল ; কিন্তু একটি ছোট শ্যালিকা আসিয়া একখানা ইংরাজী খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া সে যবনিকা ছিন্ন করিয়া দিল। বলিল, পড়ুন জামাইবাবু।

মুহূর্তে সমস্ত বিষয়টা অনন্তর চোখের সম্মুখে আলোকিত পৃথিবীর মত পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। মাথার মধ্যে ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল আগুনের শিখার মত! কিন্তু কোনো উপায় ছিল না, সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

দিনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করিবার জন্য একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, একটা কথা বলছিলাম বাবা, মানে—তোমার শ্বশুরের ইচ্ছে, আমারও

ইচ্ছে—তুমি এখন কলকাতায় থাক। আমার বড়ছেলে থাকে কলকাতায়, বাসাও রয়েছে—সেখান থেকে পড়াশুনো কর।

অনন্তের ইচ্ছা হইল, সে দৃপ্ত হুঙ্কারে বলিয়া উঠে—না, না, না। কিন্তু তাহা সে পারিল না। চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী অনন্তর নীরবতায় সন্তুষ্ট হইয়াই চলিয়া গেলেন। 'হ্যাঁ-না' বলিলেও বলাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

অপরাহ্নে শ্বশুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, সেই কথাই লিখে দিলাম তোমার বাবাকে। সেই ভালো, এত অল্প বয়সে চুপচাপ বসে থাকা ভালো নয়। An idle brain is the devil's workshop—কলকাতায় থেকে পড়াশুনো কর।

অনন্ত কোনো কথা না বলিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া একেবারে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জিনিসপত্র সব পড়িয়া রহিল। সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল এবং বাড়ি ফিরিয়া যেন আক্রোশভরেই নেশা আরম্ভ করিল।

অকস্মাৎ একদিন অনন্তের পিতা ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে স্ত্রীকে বলিলেন, আমি অনন্তর বিয়ে দেব আবার। ছোটলোকের মেয়ে—মেয়ের বাপ হয়ে চিঠি লিখেছে দেখ না! আস্পর্ধা দেখ দেখি—লিখেছে, আমরা নাকি মূর্খছেলের বিবাহ দেবার জন্যে কালীনাথের নামে অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি দিয়েছি! তুমি চিঠি লিখে দাও বেয়ানকে, মেয়ে যদি না পাঠিয়ে দেয়, ছেলের বিয়ে দেব আমি। —চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়া তিনি ক্রোধভরেই বাহির হইয়া গেলেন।

অনন্ত ছিল পাশের ঘরেই। সমস্তই সে শুনিয়াছিল, বাপ বাহির হইয়া যাইতেই সে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া মায়ের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল।

নিতান্ত কটুভাষায় অভিযোগ করিয়া ঐ পত্রখানা লেখা। পরিশেষে লেখা—প্রমাণস্বরূপ বেনামী পত্রখানাও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ পত্র আপনাদের ইঙ্গিতক্রমেই লেখা হইয়াছিল।

বেনামী পত্রখানা উল্টাইয়া অনন্ত চমকিয়া উঠিল, এ কি! এ যে অত্যন্ত পরিচিত হাতের লেখা! এ যে, এ যে—শ্বশুরের পত্রখানা মায়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বেনামী পত্রখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। একেবারে কালীনাথের বাড়ি আসিয়া ডাকিল, কালীদা!

—কে, অনু? আয় আয়।

অনন্ত আসিতেই ব্রজরানী ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গেল। অনন্ত লক্ষ্য করিল, বাড়ির চারিদিক একটি লক্ষ্মীশ্রী, সুপ্রসন্ন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় যেন উছলিয়া পড়িতেছে।

কালীনাথ বলিল, আর তুই আসিসই না!

—এলে খুশী হও কিনা সত্যি বল দেখি?

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ সে কথার উত্তরটা আর দিলই না।

অনন্ত প্রশ্ন করিল, বউ খুব ভালো হয়েছে, না?

অকপট প্রসন্ন মুখে কালীনাথ বলিল, রানীর গুণ একমুখে বলে শেষ করতে পারব না অনু। দেখছিস না ঘরদোরের অবস্থা। তুইও বউকে এইবার নিয়ে আয়, বুঝলি?

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল। কালীনাথ বলিল, তারপর হঠাৎ কি মনে করে এমন অসময়ে এলি বল তো?

অনন্ত বেনামী চিঠিখানা কালীনাথের হাতে দিয়া বলিল, চিঠিখানা দেখাতে এসেছি তোমাকে। দেখাতে কেন, দিতেই এসেছি। চিঠিখানা তুমি রাখ, আমার শ্বশুর পাঠিয়েছেন বাবার কাছে।

কালীনাথের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। অনন্ত আর অপেক্ষা করিল না, উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু দরজা হইতে বাহির হইবার মুখেই পিছন হইতে কে ডাকিল, ঠাকুরপো!

অনন্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল, ব্রজরানী জলখাবারের থালা হাতে তাহাকে ডাকিতেছে। অনন্তের আর যাওয়া হইল না, সে ফিরিল—বৌদির হাতের খাবার তো ফেলে যাওয়া হতে পারে না! কি বল কালীদা? বউদি আমার স্বর্গের দেবী—তার হাতের জিনিস, এ যে অমৃত!

কালীনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই অনন্তের স্ত্রী একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তের পিতা চরম-পত্রই পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্রের ফলে আলোকপ্রাপ্ত হইয়াও বধূর পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন।

ফুটবল টীম লইয়া অনন্তের সেদিন ম্যাচ খেলিতে যাইবার কথা। সকাল বেলাতেই বধূকে এমন অযাচিতভাবে আসিতে দেখিয়া মনটা তাহার উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, সে আজ আর যাইবে না। কিন্তু সেই টীমের সর্বশ্রেষ্ঠ হাফব্যাক, তাহার উপর সেই ক্যাপ্টেন। মনটা তাহার খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। অবশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, খেলা শেষ হওয়ার পরেই সে ট্যাক্সি করিয়া ফিরিয়া আসিবে—ত্রিশ মাইল রাস্তা বই তো নয়! ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে বাইসিক্ল আছে। রাত্রির অন্ধকারকে সে ভয় করে না।

সে পুলকিত চিত্তে বাড়ির ভিতর আপনার শয়নকক্ষে গিয়া উঠিল। বধূটি পিছন ফিরিয়া কি যেন করিতেছিল, অনন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। চকিত হইয়াই মুখ তুলিয়া অনন্তকে দেখিয়া সে সবলে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ছাড়।

হাসিয়া অনন্ত বলিল, এত রাগ কেন?

—রাগ নয়, ছাড় তুমি।

—রীতিমত রাগ! কিন্তু আমি তো আবার বিয়ে করব লিখি নি। বাবা লিখেছিলেন, বিয়ে দেব।

—ছাড়, বলছি—ছাড়। নইলে আমি চীৎকার করব বলছি।

অনন্ত স্ত্রীকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু তোমার এমন ব্যবহার কেন?

বধূ সে কথার কোনো উত্তর দিল না, ক্রুদ্ধ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকেই শুধু চাহিয়া রহিল। অনন্ত আবার বলিল, ওই তো কালীদাদার বউ, তার ব্যবহার দেখে এস, স্বামীকে সে কত ভক্তি—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বধূ বলিয়া উঠিল, কার সঙ্গে নিজেকে তুমি তুলনা করছ? শিবে আর বাঁদরে! সে বিদ্বান—

অনন্ত আর দাঁড়াইল না ; হনহন করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল একেবারে আস্তাবলে গিয়া ডাকিল, নেত্য!

নিত্য সহিস কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটাইয়া গোপনে চোলাই-করা মদ খাইতেছিল, অসহিষ্ণু অনন্ত একেবারে দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া বলিল, হান্টার কই?

হান্টারগাছটা লইয়া চলিয়া যাইতে সে আবার ফিরিল—দেখিরে।

নিত্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল, আজ্ঞে?

—ওই বোতলটা!—বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া বোতলটা তুলিয়া লইয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। নির্জলা হলাহল বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার মত জ্বালা ধরাইয়া দিল—মাথার মধ্যে ক্রোধ হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে আবার দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, কি বলছিলে, বল এইবার।

সে মূর্তি দেখিয়া বধূটি স্তম্ভিত হইয়া গেল, পরক্ষণেই সুরার গন্ধে ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি মদ খাও? মাতাল তুমি?

—হ্যাঁ, খাই ; মদ খাই, গাঁজা খাই, সব খাই। তোমার বাপের পয়সায় খাই?

আত্মবিস্মৃতা বধূ বর্ধিততর ক্ষোভে বলিয়া ফেলিল, মাতাল, মূর্খ্য বেরোও—

কথা তাহার অসমাপ্তই থাকিয়া গেল, হাণ্টারের আঘাতে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল। হাণ্টারের পাকানো কশাখানির তীক্ষ্ণ আঘাতে বাহুমূল হইতে সমস্ত হাতখানা দীর্ঘরেখায় কাটিয়া গিয়াছে। অনন্ত হাণ্টার হাতে করিয়াই তরতর করিয়া নামিয়া গেল।

ফুটবল টীম লইয়া যাত্রার পথে ক্ষুধা অনুভব করিয়া সে আসিয়া উঠিল কালীনাথের বাড়ি—কালীদা!

কালীনাথও বাহির হইতেছিল, সে বলিল—এই যে, আমি যে যাচ্ছিলাম তোর কাছে।

অনন্ত বলিল, সে সব পরে শুনব। বউদি কই? বউদি?

—তোমার বউদির হুকুমেই যাচ্ছিলাম ; তার ব্রত আছে, তোমায় তার ব্রাহ্মণ করেছে।

—সে হবে। কিন্তু এখন কিছু খেতে দাও তো বউদি।

ব্রজরানী অদূরেই আসিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—সে কি! আজ তোমার বউ এসেছে—

—আঃ বউদি, থাক না ও-কথা। এখন তুমি খেতে দেবে কিছু। বল, নয় তো অন্যত্র চেষ্টা দেখি। আমার সময় নেই, তোমার বাপের বাড়ির শহরে যাচ্ছি—ম্যাচ খেলতে।

ব্রজরানী ব্যস্ত হইয়া থালায় জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। কালীনাথ প্রশ্ন করিল—ফিরবি কবে? পরশু যে তোর বউদির ব্রত।

ক্ষুধার শান্তিতে প্রসন্নভাবেই অনন্ত বলিল—কাল সকালে। পরশুর জন্যে ভাবনা কি?—কিন্তু ব্রতটা কি?

লজ্জিত হইয়া ব্রজরানী নতমুখী হইয়া রহিল। উত্তর দিল কালীনাথ, অবৈধব্য ব্রত ; অর্থাৎ আমার আগে মরবার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছেন আর কি!

—বাঃ। মেয়েদের এই ধারণাটা আমার ভারী ভালো লাগে কালীদা। তারপর ব্রজরানীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, বউদি, স্বর্গের দেবী তুমি।

লজ্জিতা ব্রজরানী প্রসঙ্গান্তর আনিয়া বলিল, আমার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিন্তু তুমি যেন উঠ ঠাকুরপো। নইলে ঝগড়া হবে। আমারও উপকার হবে, ওদের খবর পাব। কদিন খবর পাই নি।

ম্যাচ জিতিয়াও অনন্তর মনটা ভালো ছিল না। প্রভাতের সেই তিক্ত স্মৃতি তাহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল। সে অবসন্ন-ভাবেই ব্রজরানীর পিত্রালয়ের বাহিরের

ঘরে নির্জীবের মত শুইয়া ছিল। ব্রজরানীর অনুরোধমত সে এইখানেই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। দলের সকলে দারুণ আপত্তি করিয়াছিল—না, না, সে হবে না ভাই। জিতলাম ম্যাচ ; সমস্ত রাত আজ হৈ-হৈ করব, ফূর্তি করব। তুমি ক্যাপ্টেন—তুমি না থাকলে চলে।

সবিনয়ে হাতজোড় করিয়া অনন্ত বলিয়াছিল, সে হয় না ভাই। আমি কথা দিয়ে এসেছি বউদিকে।

—বেশ। তবে একটু খেয়ে যাও।—তাহারা বোতল গ্লাস বাহির করিয়া বসিল। কিন্তু জিব কাটিয়া অনন্ত বলিল, ছি, তাই হয়?—কুটুম্বলোক!

বার বার অনন্তর চোখ ভরিয়া জল আসিতেছিল। মনটা যেন উদাস হইয়া গিয়াছে। ব্রজরানীর মা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, ব্রজ আমার ভালো আছে বাবা?

তাড়াতাড়ি অনন্ত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—হ্যাঁ মাউই-মা, বউদি ভালোই আছে।

—ব্রজ আমার সুখ্যাতি নিয়েছে তো বাবা? তোমাদের যত্ন-আত্তি করে তো?

উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত বলিল, এ যুগে এমন মেয়ে হয় না মাউই-মা। সতী-সাবিত্রী বইয়ে পড়েছি—বউদির মধ্যে চোখে দেখলাম।

ব্রজরানীর মা পরম তৃপ্ত হইয়া বলিলেন বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘায়ু হও। তোমরা নিজেরা ভালো, তাই সেই দৃষ্টান্তে ব্রজ আমার ভালো হতে পেরেছে।

অতঃপর বেয়াই-বেয়ানদের প্রণাম জানাইতে অনুরোধ করিয়া তিনি বিদায় লইলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি একটা বাটিতে দুধ লইয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—বাবা!

অনন্তর মন তখন আপনার শ্বশুর বাড়ির সহিত এই বাড়িটার তুলনা করিতে ব্যস্ত ছিল, সে কোনও সাড়া দিল না। ভালো লাগিল না তাহার। ব্রজরানীর মা তাহার নিস্তব্ধতা দেখিয়া আপন মনে বলিল, খেলাধূলা করে নিথরে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা।

তিনি আবার বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ির ভিতরে হরদাস প্রশ্ন করিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ, ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, আর ডাকলাম না।

ওঃ খুব খেলেছে ছোকরা। ভাল খেলে। স্বাস্থ্যও ভাল—বেশ ছেলে।

মা বলিলেন—ভারী মিষ্টি কথা ; ব্রজর কথা বলতে একেবারে পঞ্চমুখ। ভালো বংশের ছেলে! সেই চিঠিটা কিন্তু তা হলে কেউ হিংসে করে লিখেছিল। মাতাল, নেশাখোর, চরিত্রহীন, গোঁয়ার। দেখে তো মনে হয় না। তুই হাসছিস যে?

—হাসছি!

কেন, তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

—সে চিঠিখানা কিন্তু কালীনাথের হাতের লেখা। কালীনাথের এখানকার চিঠির লেখার সঙ্গে সে-চিঠি মিলিয়ে দেখেছি আমি। ব্রজকে ও দেখতে এসেছিল তো—খুব পছন্দ হওয়ায় এই কাণ্ড সে করেছিল।

—তা ব্রজর আমার তপস্যা ভালো। কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মত জামাই। ব্রজ বলতে পাগল।

অনন্তর মাথার ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া উঠিল। শেষরাত্রে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্থির করিল ; না,—সে পড়াশুনাই করিবে। জীবনে প্রশংসা শান্তি—এ তাহার চাই। তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হয়, সে তপস্যাই করিবে। সর্বান্তঃকরণে সে কালীনাথকে মার্জনা করিল, ব্রজরানীকে বার বার মনে মনে আশীর্বাদ করিল—তুমি চিরসুখী হও, চিরায়ুষ্মতী হও।

বাড়িতে আসিয়াই কিন্তু তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল। দারুণ ক্রোধে তাহার পিতা বলিলেন—তোর মুখ দেখতে চাই না আমি। তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক! তোর থেকে এত বড় বাড়ির মান গেল, মর্যাদা গেল। তুই মরলি না কেন?

কালই অনন্তর বধূ যে-লোকের সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই লোকের সঙ্গেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। অনুনয় উপরোধ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাহায্য লইতে উদ্যত হইলে, এ-পক্ষ নীরবে পথ মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বধূটি যে কটু কথাগুলো বলিয়া গিয়াছে, তাহার তীক্ষ্ণতায় মর্মাহত অনন্তর জননীর চোখের জল এখনও শুকায় নাই। অনন্তর সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। তবুও সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল—আমি চললাম।

—কোথায়?

—শ্বশুরবাড়ি।

মা আর্তস্বরে বলিলেন, না না!

—ভয় নেই মা। আমি শ্বশুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব।

সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, সেই বস্ত্রে সেই অভুক্ত অবস্থায়। মা পিছন পিছন আসিয়াও পিছন ডাকার অমঙ্গলের ভয়ে আর ডাকিতে পারিলেন না।

শ্বশুরবাড়িতে আসিয়াই সে সত্যসত্যই শ্বশুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল। শ্বশুর মুহূর্তে পা দুইটা টানিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্ত

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া লাফ দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—হান্টার উদ্যত করিয়া রক্তচক্ষু শ্বশুর। অনন্ত এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, হান্টারের আস্ফালিত রজ্জুশিখা বার বার তাহার দেহখানাকে জর্জরিত করিয়া দিল। জামা ছিঁড়িয়া সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

—বেরোও আমার বাড়ি থেকে—বেরোও।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

হাতের হান্টারগাছটা ফেলিয়া দিয়া গৃহকর্তা হাঁকিলেন—দারোয়ান! নিকাল দো ইসকো। তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দারোয়ান আসিতে অনন্ত দ্রুতপদে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মাথার মধ্যে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। সে স্থির করিল, বাড়ি হইতে রিভলবারটা লইয়া, ফিরিয়া ঐ দাম্ভিক জানোয়ারটাকে হত্যা করিবে, তারপর সে নিজে আত্মহত্যা করিবে। বাড়ির স্টেশনে নামিয়া দেখিল, তাহাদের লোকজন পালকি লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। বধূ লইয়াই সে ফিরিবে, এমন প্রত্যাশাই সকলে করিয়াছিল। বাড়ির সরকার অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, বউমা—

—আসেন নি।

—এ কি ছোটবাবু—! সর্বাঙ্গে—! —সরকার শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত দ্রুত স্টেশন ত্যাগ করিয়া মাঠের রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

সকলের অলক্ষিতে একটা অব্যবহার্য সিঁড়ি দিয়া সে উপরে আসিয়া উঠিল।

রিভলবারটা কোথায়? মুহূর্তে অব্যবস্থিত চিত্তে তাহার খেয়াল হইল, শ্বশুরকে হত্যা করিয়া কি হইবে? কন্যার বৈধব্যের যাতনা ভোগ করিবে কে? বার-বার তাহার মন বলিল—সেই ভালো। সে আপনার পরম প্রিয় রিপীটারটা তুলিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল কয়টা কার্তুজ ভরাই আছে।

ঘরে—এই ঘরে? না, একবার কোনক্রমে ব্যর্থ হইলে তখন আর উপায় থাকিবে না। কোন নির্জন প্রান্তরে। আত্মহত্যার সঙ্কল্প লইয়া রিপীটারটা হাতে করিয়াই অলক্ষিতে সে আবার বাহির হইয়া পড়িল। বিহ্বলের মত কোনদিকে কোনপথে সে চলিয়াছিল—খেয়াল ছিল না।

—অনু! অনু!

কালীনাথের বাড়ির জানালায় অনন্তর প্রতীক্ষায় ব্রতচারিণী ব্রজরানী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীনাথ জল খাইতে বসিয়াছে, জল খাইয়াই অনন্তকে সে ডাকিয়া আনিবে।

ওপাশে ব্রতের আয়োজন সাজানো। ব্রজরানীর চোখে পড়িল—অনন্ত বন্দুক হাতে চলিয়াছে। সে বলিল, ওগো, অনু ঠাকুরপো পথ দিয়া যাচ্ছে।

কালীনাথ ডাকিল—অনু! অনু!

—কে? কালীনাথ? অনন্তর মস্তিষ্কের অগ্নিশিখার উপর যেন ঘৃতাহুতি পড়িয়া গেল ; সহস্র শিখায় লেলিহান হইয়া সে জ্বলিয়া উঠিল। কালীনাথ! তাহার জীবনের কুগ্রহ—তাহার সুখে পরম সুখী কালীনাথ! কালীনাথ! কালীনাথ—তাহার জীবনের সাথী কালীনাথ! একা সে কোথায় যাইবে!

অনন্ত বাড়ির মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া বলিল—এই যে!

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ বলিল—এসেই বন্দুক হাতে?

কুকুর-মারা মনে পড়ে? তেমনই করে মারব তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা সে তুলিয়া ধরিল। ব্রজরানী আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ; কালীনাথ সভয়ে বন্দুকের নলটা চাপিয়া ধরিয়া অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—অনু, ক্ষমা—ক্ষমা—

ভীষণ গর্জনে মৃত্যু তখন হুঙ্কার দিয়াছে। কালীনাথের যে হাতখানি নলটা চাপিয়া ধরিয়াছিল সেটা ভাঙিয়া গেল। ব্রজরানী কালীনাথকে সবলে আকর্ষণ করিয়া চীৎকার করিল—ঠাকুরপো!

আবার বন্দুক গর্জিয়া উঠিল, কালীনাথ পড়িয়া গেল, কিন্তু তখনও সে জীবিত। আবার। কালীনাথের রক্তাপ্লুত দেহ নিস্পন্দ নিথর।

অনন্ত দ্রুত বাহির হইয়া গ্রাম পার হইয়া প্রান্তরে পড়িল, তারপর একস্থানে দাঁড়াইয়া বন্দুকের নলটা মুখে পুরিয়া পা দিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। খট্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল শুধু। এ কি! বন্দুকটা তুলিয়া কার্তুজের ঘর খুলিয়া অনন্ত দেখিল, শূন্য। নাই, আর নাই! তিনটি কার্তুজই ছিল, ফুরাইয়া গিয়াছে! যাক, দড়ি তো আছে! কাপড় ছিঁড়িয়া দড়ি তো সহজেই হইবে।

পরক্ষণেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বন্দুকটা ফেলিয়া দিয়া সভয়ে সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্তি—ঐ যে রক্তাক্ত বিকৃতমূর্তি কালীনাথ ভাঙা হাতে ফাঁসির দড়ি লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রাণপণে সে ছুটিল।

ধরা পড়িল সে দশদিন পরে, বাংলার বাহিরে একটা দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে। সে তখন ঘোর উন্মাদ। আট বৎসর পাগলা গারদে থাকার পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, দায়রা-আদালতে সেই বিচার হইতেছে। কাল ব্রজরানীর সাক্ষ্য দিবার দিন।

আজ আট বৎসর ব্রজরানী অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে। তৈলহীন স্নান, আপন হাতে হবিষ্যান্ন আহার, মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হরদাসকে মা বলিলেন—বুঝলাম সব বাবা। এই রাত্রি তিন প্রহর হয়ে গেল ; একে একে অনন্তর মা বউ সকলে এলেন। কিন্তু উপায় কই? সে তো কথা শুনলে না। দেখে আয়, চোখ বুজে বসে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ; চোখ খুলে সে তাকালে না পর্যন্ত। নইলে যা হবে হোক, ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ হত।

বলিতে ভুলিয়াছি কালীনাথের মৃত্যুর সময় ব্রজরানী ছিল অন্তঃসত্বা। একটি পুত্র সে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও পাইয়াছে।

হরদাসবাবু নিজে গিয়া ডাকিলেন, ব্রজ!

চোখ না খুলিয়াই সে উত্তর দিল, না।

—কথাটাই শোন।

—না।

মা আসিয়া বলিলেন—এইবার একটু ঘুমিয়ে নে ব্রজ।

শিহরিয়া উঠিয়া ব্রজ বলিল—না।

ঘুমাইলেই সেই মূর্তি ব্রজর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। ... মা বলিলেন—আমি গায়ে হাত দিয়ে থাকব রে।

—না।

আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ব্রজরানীর সাক্ষ্য শুনিবার জন্য আজ লোক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ব্রজরানী কঠিন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিল।

সম্মুখেই কাঠগড়াতেই একটি লোক—শুভ্রকেশ, শীর্ণ, ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে ব্রজরানীর দিকে চাহিয়া সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিল। উত্তর যেন অতি পরিচিত স্থানে, অতি নিকটে রহিয়াছে, তবু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

ব্রজরানী স্তম্ভিত হইয়া খুঁজিতেছিল, কোথায় সেই দৃপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবা? কই, সে কোথায়? এ কি সেই মানুষ? না না, এ সে নয়, হইতে পারে না। তাহার

অন্তরের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখ দুইটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঐ শীর্ণ জীর্ণ হতভাগ্য যেন স্মৃতিকে খুঁজিয়া পাইল—সে পরম মুগ্ধ দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধায় তাহার দিকে চাহিয়া বার বার ঘাড় নাড়িয়া যেন নিজেকেই সমর্থন করিয়া বলিল—দেবী, দেবী! স্বর্গের দেবী! তুমি বউদি!

ব্রজরানীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। করুণায় মমতায় সে যেন দেবীই হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারী উকীল ব্রজরানীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—কেঁদে কি করবেন মা, এখন বিচার প্রার্থনা করুন। সুবিচার যাতে হয়, তাতে সাহায্য করুন।

পৃথিবীর দীনতা—পুঞ্জীভূত হীনতায় জীর্ণ, ঘৃণাহত ঐ হতভাগ্য, হায় রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে! এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার! ব্রজরানীর সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া গেল।

সরকারী উকিল প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। ওদিকে জনতার মধ্য হইতে অস্ফুট গুঞ্জনে উচ্চারিত দুই-চারিটি কথা ভাসিয়া আসিতেছিল।

ফাঁসি নয়, বন্দুকের গুলি দিয়া মারুক ওকে।

ব্রজরানীর চোখে আবার জল দেখা দিল। সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল ... সমস্ত লোক নিষ্করুণ নেত্রে আক্রোশভরে চাহিয়া আছে ঐ হতভাগ্যের দিকে। গম্ভীরমুখে জজসাহেব ইংরাজীতে কি মন্তব্য করিলেন, অর্থ না বুঝিলেও ব্রজরানী সে শব্দের কাঠিন্য অনুভব করিল।

আদালতের পিওন বার-বার হাঁকিতেছিল—চুপ চুপ—আস্তে।

—এই লোকটিকে দেখুন। অনেক পরিবর্তন হয়েছে অবশ্য। এই অনন্ত কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে?—সরকারী উকীল প্রশ্ন করিলেন।

ব্রজরানীর অন্তরাত্মা তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—তাহারই প্রতিধ্বনি জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল—না।

তারপর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা।

ব্রজরানী ফিরিল যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত—হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় প্রশান্তি—হৃদয়-মন যেন কত লঘু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে ছিলেন হরদাসবাবু। তিনি তাহাকে

বলিলেন—তোর মামাশ্বশুরের সঙ্গে একবার দেখা কর ব্রজ। যা দিতে চেয়েছিলেন—চেয়ে নে। ভবিষ্যতে—

ব্রজ বলিল—না।

বাড়িতে ব্যাপারটার সমালোচনার আর অন্ত ছিল না। ব্রজর মা পর্যন্ত কন্যার বুদ্ধিহীনতার সমালোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—তুমিই একবার যাও হরদাস, ওর নাম করে। সে গেল কোথায়?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্রজরানী ক্লান্ত হইয়া ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা আসিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আবার এখুনি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড করে বসবে! ব্রজ—ও ব্রজ! চল নীচে শুবি, এখানে একা তোর আবার ভয় করবে।

ব্রজ নিদ্রাসক্ত চোখ মেলিয়া বলিল—না।

সে আবার নিশ্চিত নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত করিল।

অমিতাভ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি একজন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একেলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে ; বলিবে,—"বেটা গাঁজাখোর, ভেবেছে আমরাও গাঁজা খাই!" কিন্তু সার্ অলিভার লজ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ভূত দিবারাত্র পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহসহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ—অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত না সহজ? শুধু একটি পণ্ডিতের নাম—একটি বড়-সড় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত—সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে তো সবই মাটি।

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন্ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ-দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরানি, বিদ্যা এণ্ট্রান্স পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি। আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?

রেলের পাশ লইয়া যে বৎসর আমি রাজগীরে ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই—ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সেদিন প্রথম আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কতদিনের কথা? দু'হাজার বৎসর না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শষ্প আরও শ্যাম ছিল।

আমি জাতিস্মর! ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানি জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা। কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধহয় বহু শতবার—এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি ; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎ শিখার মতো, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই, ধ্বংস হইয়া

গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মতো তীব্র দুর্জেয়। আরণ্য অশ্বিনীর মতো তাহাদিগকে বশ করিতে হইত।

আর পুরুষ? আর্শিতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি—শূরসেনরাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গ-প্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার হইয়াছিলাম। তারপর কিন্তু—যাক্ সে কথা। কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি—অফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।

কিন্তু কথাটা সত্য। এমন বহুবার ঘটিয়াছে। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, এ স্থান আমার চিরপরিচিত, একবার নহে—শত সহস্রবার আমি এইখানে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখন এ-স্থান জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে সমাহিত ছিল না। ঠিক যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার বাঁ দিক দিয়া এক সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ গিয়াছিল। পথের দুই পাশে ব্যবহারীদের গৃহ ছিল। দূরে ঐ স্থানে মহাধনিক সুবর্ণদত্তের দারু-নির্মিত প্রাসাদ ছিল। যেদিন রাজগৃহে আগুন লাগে, সেদিন সুবর্ণদত্ত আসবপানে বিবশ হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারিজন রূপাজীবা নগরকামিনী। নগর ভস্মীভূত হইবার পর পৌরজন তাহাদের মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, শ্রেষ্ঠী মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহ দগ্ধ হয় নাই—সুসিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। কিছুকাল পূর্বে সে বালিদ্বীপ হইতে এক অষ্টোত্তর-সহস্রনাল ইন্দ্রচ্ছন্দা মালা আনিয়াছিল। সেরূপ মুক্তাহার মগধে আর ছিল না। সকলে দেখিল, বণিকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে সেই ইন্দ্রচ্ছন্দার মুক্তাভস্ম।

কিন্তু ক্রমেই আমি অসংযত হইয়া পড়িতেছি। শূরসেনের সহিত মগধ, অগ্নিদাহের সহিত রাজকন্যাহরণ মিশাইয়া ফেলিতেছি। এমন করিলে তো চলিবে না।

আসল কথাটা আর একবার বলিয়াই লই—আমি জাতিস্মর। মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া ওঠে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায়। এ শিল্প তো আমার রচনা। আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট কনিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন বিহারের গাত্র শোভার জন্য এ নবপত্রিকা আমি গড়িয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল পুণ্ডরীক। আমি ছিলাম প্রধান শিল্পী ... রাজভাস্কর। সেই পুণ্ডরীক-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা যে আমার স্মরণে মুদ্রিত আছে। এই যে নব-পত্রিকার মধ্যবর্তী বিনগ্না যক্ষিণী-মূর্তি দেখিতেছেন, তাহার আদর্শ কে ছিল জানেন? সিতাংশুকা—তক্ষশিলার সর্বপ্রধানা রূপোপজীবিনী, বারমুখ্যা। সকলেই জানিত, সিতাংশুকা রাজ ঔরসজাতা। সেই সিতাংশুকাকে নিরংশুকা করিয়া, সম্মুখে দাঁড়

করাইয়া, বজ্রসূচী দিয়া পাষাণ কাটিয়া এই যক্ষিণী মূর্তি গড়িয়াছিলাম। পুণ্ডরীক ভিন্ন এ মূর্তি আর কে গড়িতে পারিত? কিন্তু তবু মনে হয়, সে অপার্থিব লাবণ্য কঠিন প্রস্তরে ফুটে নাই। আজও, এই কেরানি জীবনেও সেই অলৌকিক রূপৈশ্বর্য আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অঙ্কিত আছে।

আবার কেমন করিয়া বিষ-ধূম দিয়া সিতাংশুকা আমার প্রাণসংহার করিল, সে কথাও ভুলি নাই। সুরম্য কক্ষ, চতুষ্কোণে স্ফটিক-গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক-তৈলের সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্ক শয্যা, শিয়রে ধূপ জ্বলিতেছে।—সেই ধূপশলাকার গন্ধে ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে বাদ্যের করুণ নিক্কণ ইন্দ্রিয়সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে ; তারপর মোহনিদ্রা—সে নিদ্রা সে জন্মে আর ভাঙিল না।

এমনই কত জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা কত অসমাপ্ত কাহিনী স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সুদূর অতীতে এমন অনেক জিনিস ছিল—যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইতেছে। মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশী নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, এ কালের মতো স্বাধীনতা কথাটাকে তখন কেহ এত বড় করিয়া দেখিত না। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ তেমনই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস করিত। স্বাধীনতার ব্যাঘাত পড়িলে লড়াই করিত, মরিত ; বাঘের মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও পোষ মানিত না। যুগান্তরব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল তখনও মানুষের পায়ে কাটিয়া বসে নাই, মনের দাসবৃত্তি ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদও এত বেশি ছিল না। নির্ভয়ে দীন প্রজা চক্রবর্তী সম্রাটের নিকট আপনার নালিশ জানাইত, অধিকার দাবি করিত, ভয় করিত না।

ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি। এক পুরুষ—ভারত আজ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার কোটিচন্দ্রস্নিগ্ধ মুখপ্রভা এই দুই নশ্বর নয়নে দেখিতেছি, আর অন্তরের অন্তস্থল হইতে আপনি উৎসারিত হইতেছে—

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়—"

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে একদিন দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছিলাম—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম—আজ সেই কথা জন্মান্তরের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব।

উত্তরে মাতুলবংশ লিচ্ছবি ও পশ্চিমে মাতুলবংশ কোশল মগধেশ্বর পরম-বৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ অজাতশত্রুকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, পূর্বতন মহারাজ বিম্বিসার শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই লিচ্ছবি কোশলের সহিত বিবাদ না করিয়া তাহাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু সে ধাতুর লোক নহেন—বিবাহ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাকে তিনি বেশি পছন্দ করেন। তা ছাড়া, ইচ্ছা থাকিলেও মাতুলবংশে বিবাহ করা সম্ভব নহে। তাই অজাতশত্রু পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর প্রফুল্ল মনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অসুবিধা এই যে শত্রু দুই দিকে—উত্তর এবং পশ্চিমে। উত্তরের শত্রু তাড়াইতে গেলে পশ্চিমের শত্রু রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে ; কোশলকে কাশীর পরপারে খেদাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে দেখেন, লিচ্ছবিরা রাজগৃহে ঢুকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মগধরাজ্যের অন্তপাল সামন্তরাজারা সীমানা রক্ষা করিতে না পারিয়া কেহ রাজধানীতে পলাইয়া আসিতেছে, কেহ বা শত্রুর সহিত মিশিয়া যাইতেছে। রাজ্যে অশান্তির শেষ নাই। প্রজারা কেহই অজাতশত্রুর উপর সন্তুষ্ট নহে ; তাহাদের মতে রাজা বীর বটে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অধিক নাই, শীঘ্র ইহাকে সিংহাসন হইতে না সরাইলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে।

প্রজারা কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিল। অজাতশত্রু নির্বোধ মোটেই ছিলেন না। তাঁহার অসির এবং বুদ্ধির ধার প্রায় সমান তীক্ষ্ণ ছিল।

একদিন বর্ষাকালের আরম্ভে যুদ্ধ স্থগিত আছে—অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্য বর্ষকারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নগরের নির্জন স্থানে বেণুবন নামে এক উদ্যান আছে ; বিম্বিসার ইহা বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অজাতশত্রু আবার উহা কাড়িয়া লন। সেই উদ্যানে প্রাচীন মন্ত্রী ও নবীন মহারাজের মধ্যে অতি গোপনে কি কথাবার্তা হইল। সে সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশী ; সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট, কুশীলব ইহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর কে নহে, অনুমান করা অতিশয় কঠিন। সম্প্রতি নগরে বৈশালী হইতে জঘনচপলা নাম্নী এক বারাঙ্গনা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত নাগরিক তো ভুলিয়াছেই, এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু জঘনচপলা কোশল কিংবা বৃজির গুপ্তচর কি না, নিশ্চিতরূপে না জানা পর্যন্ত অজাতশত্রু নিজেকে কঠিন শাসনে রাখিয়াছেন। এইরূপ চর সর্বত্রই ঘুরিতেছে ; তাই গূঢ়তম মন্ত্রণা খুব সাবধান হইয়াই করিতে হয়। এমন কি সকল সময় অন্যান্য অমাত্যদের পর্যন্ত সকল কথা জানানো হয় না।

নিভৃতে বহুক্ষণ আলাপের পর মহামন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যানের প্রতিহারী দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মুখে হাসি এবং চক্ষুতে জ্যোতি ফুটিয়াছে।

প্রহর রাত্রি অতীত হইবার পর আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম, ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "পরিব্রাজিকা সাক্ষাৎ চান।"

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরিব্রাজিকা? এত রাত্রে?"

এই রাজ-সম্মানিতা মহাশক্তিশালিনী নারী কি প্রয়োজনে এরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী, জানিবার জন্য ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আনিয়া আসনে বসাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম—"দেবী, কি জন্য দাসের প্রতি কৃপা হইয়াছে?"

পরিব্রাজিকার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মুখশ্রী এখনও সুন্দর ও সম্ভ্রম উৎপাদক। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে কুঙ্কুমতিলক, হস্তে একটি সনাল পদ্মকোরক। সহাস্যে বলিলেন, "বৎস, আজ সন্ধ্যার পর কমলকোরক দিয়া কুমারীপূজা করিতেছিলাম, সহসা এই কোরকটি কুমারীর চরণ হইতে আমার ক্রোড়ে পতিত হইল।"

কথার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি শুধু বলিলাম, "তারপর?"

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "কুমারীর আদেশ বুঝিতে না পারিয়া ধ্যানস্থ হইলাম।" তখন দেবী আমার কর্ণে বলিলেন, "এই নির্মাল্য শ্রেণিনায়ক কুমার দত্তকে দিবে। ইহার বলে সে সর্বত্র গতিলাভ করিবে।"

আমি হতবুদ্ধির মতো পরিব্রাজিকার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। তিনি কক্ষের চতুর্দিকে ক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "এই কোরক লও, ইহাতে উপদেশ আছে। কার্যসিদ্ধি হইলে ইহার বিনাশ করিও। মনে রাখিও, ইহার বলে, রাজমন্দিরেও তোমার গতি অব্যাহত হইবে।"

এই বলিয়া পদ্মকলিটি আমার হস্তে দিয়া পরিব্রাজিকা বিদায় লইলেন। আমি নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

আমি সামান্য ব্যক্তি। কুলী-মজুর খাটাইয়া খাই, রাজগৃহের স্থপতি-সূত্রধর-সম্প্রদায়ের শ্রেণিনায়ক। আমার উপর রাজা-রাজড়ার দৃষ্টি পড়িল কেন? যদি বা পড়িল, তবে এমন রহস্যময়ভাবে পড়িল কেন? রাজ-অবরোধের পরিব্রাজিকা আমার মতো দীনের কুটিরে পদধূলি দিলেন কি জন্য? কুমারী কুমারদত্তের উপর সদয় হইয়া তাহার সর্বত্র গতিবিধির ব্যবস্থাই বা করিয়া দিলেন কেন? এখন এই পদ্মকলি লইয়া

কি করিব? কার্যসিদ্ধি হইলে ইহাকে বিনষ্ট বা করিতেই হইবে কেন? আমি পূর্বে কখনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই তাই নানা চিন্তায় মন একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দাসী দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার বোধ করি, আজ কোথাও অভিসার আছে কারণ বেশভূষায় একটু শিল্পচাতুর্য রহিয়াছে। কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা, কঞ্চুলী দৃঢ়বদ্ধ। দাসী দেখিতে মন্দ নহে, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে মিষ্টি হাসি, তার উপর ভরা যৌবন। আমি তাহাকে বলিলাম, "বনলতিকে, তুমি গৃহে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে!" সে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

পদ্মকোরক হস্তে শয়ন-মন্দিরে গেলাম ; বর্তিকার সম্মুখে ধরিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম। কোরকটি মুদিত হইয়া আছে, ধীরে ধীরে পলাশগুলি উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে নাভির সমীবপর্তী কোমল পল্লবে অস্পষ্ট চিহ্ন সকল চোখে পড়িল। সযত্নে পল্লবটি ছিঁড়িয়া দেখিলাম, কজ্জলমসী দিয়া লিখিত লিপি—অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী মহামন্ত্রীর দ্বারে উপস্থিত হইবে। সংকেত-মন্ত্র-কুট্মল। লিপির নিম্নে মগধেশ্বরের মুদ্রা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। পরিব্রাজিকার নিগূঢ় কথাবার্তা, কুমারীর পূজা সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম! গোপনে মহামাত্যের নিকট আমার তলব হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া পাঠাইলেই তো হইত। আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি একজন অতি সামান্য নাগরিক, আমাকে লইয়া রাজ্যের মহামাত্য কি করিবেন? বুড়া অত্যন্ত খিটখিটে, কি জানি যদি না-জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি তবে হয়তো শূলে চড়াইয়া দিবে কিংবা কে বলিতে পারে, হয়তো গোপনে কোথাও রত্নাগার নির্মাণ করিতে হইবে, তাই এই সতর্ক আহ্বান।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু রাজাদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই,—স্বেচ্ছায় না যাইলে হয়তো বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাই অবশেষে উত্তরীয় লইয়া পথে বাহির হইলাম।

আমার গৃহ নগরের উত্তরে, মহামন্ত্রীর প্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থলে। পথ জনহীন, পথের উভয়পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নির্বাপিতদীপ, নিদ্রিত। দূরে দূরে সংকীর্ণ পথিপার্শ্বে পাষাণ-বনদেবীর হস্তে স্ফটিকের দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে মধ্যরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত।

মহামাত্যের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে অন্ধকার প্রহরীও নাই ; কিন্তু বহির্দ্বার উন্মুক্ত। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সাহসে ভর করিয়া প্রবেশ করিতে

গেলাম—অমনি তীক্ষ্ণ ভল্লের অগ্রভাগ কণ্ঠে ফুটিল ; অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া ভল্লের অন্যপ্রান্ত হইতে কে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া বাগরোধ হইয়া গেল। বর্শার ফলা কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছে, একটু চাপ দিলেই সর্বনাশ। আমি মূর্তির মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে সেই সনাল পদ্মকলি তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলাম।

আততায়ী জিজ্ঞাসা করিল, "উহার কি নাম বল।"

বলিলাম, "সনাল উৎপল।"

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কি নাম বলিলে?"

বুঝিলাম, এ প্রহরী। লিপিতে যে সংকেত-মন্ত্র ছিল তাহা স্মরণ হইল, বলিলাম, "কুড্মল"।

বর্শা কণ্ঠ হইতে অপসৃত হইল। অন্ধকারে প্রহরী আমার হাত ধরিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া চলিল।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছু দূর পর্যন্ত সে আমাকে লইয়া গেল। তারপর আর একজন আসিয়া হাত ধরিল। সে আরও কিছুদূর লইয়া গিয়া অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে পাঁচ ছয় জন দ্বারী, প্রহরী, প্রতিহারীর হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে এক আলোকিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া একস্তূপ ভূর্জপত্র-তালপত্র সম্মুখে বৃদ্ধ মহামন্ত্রী নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছেন। কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। মহামাত্য সম্মুখে আসন নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "উপবিষ্ট হও।"

আমি উপবেশন করিলাম।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন। "পরিব্রাজিকার হস্তে যে লিপি পাইয়াছিলে, উহা কোথায়?"

পদ্মদল বাহির করিয়া মহমাত্যকে দিলাম। তিনি সেটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভক্ষণ কর।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের প্রতি মূঢ়বৎ তাকাইয়া রহিলাম। ভক্ষণ করিব আবার কি?

মহামন্ত্রী আবার বলিলেন, "এই লিপি ভক্ষণ কর।"

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তারপর অকারণে লিপি ভক্ষণ করিতে বলা, এ কিরূপ ব্যবহার? হউন না তিনি রাজমন্ত্রী—তাই বলিয়া—

মন্ত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল। আবার অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে—তাই এই সতর্কতা। লিপি সুস্বাদু বলিয়া তোমাকে উহা খাইতে বলি নাই।"

তখন ব্যাপার বুঝিয়া সেই কোমল পদ্মপল্লবটি খাইয়া ফেলিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। মহামাত্যের শীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। প্রদীপের শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতেছে। আমি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, এবার কি হইবে?

হঠাৎ প্রশ্ন হইল, "তুমি জঘনচপলার গৃহে যাতায়াত কর?"

অতর্কিত প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। জঘনচপলা বেশ্যা, তাহার গৃহে যাই কি না সে সংবাদে রাজমন্ত্রীর কি প্রয়োজন? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বুড়া খোঁজ না লইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পাত্র নহে। কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম, "একবার মাত্র গিয়াছিলাম। কিন্তু সে স্থান আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নয় ; তাই আর যাই নাই।"

মন্ত্রী বলিলেন, "ভালো করিয়াছ। সে লিচ্ছবির গুপ্তচর।"

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। মহামাত্য ধ্যানমগ্নের মতো বসিয়া আছেন ; আমি আর-একটি প্রশ্নের বজ্রাঘাত প্রতীক্ষা করিতেছি।

"তোমার অধীনে কত কর্মিক আছে?"

"সর্বশুদ্ধ প্রায় দশ সহস্র।"

"স্থপতি কত?"

"ছয় হাজার।"

"সূত্রধর?"

"তিন হাজারের কিছু উপর।"

"তক্ষক ও ভাস্কর?"

"তক্ষক-ভাস্করের সংখ্যা কম—পাঁচশতের অধিক নহে।"

দেখিতে দেখিতে মহামন্ত্রীর নির্জীব শুষ্ক দেহ যেন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষুতে যৌবনের জ্যোতি সঞ্চারিত হইল। তিনি আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শুন, এখন বর্ষাকাল। শরৎকাল আসিলে পথঘাট শুকাইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুইদিক হইতে শত্রুর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সংগমে এক ঔদক দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। এমন দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে—যাহাতে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিত্য বাস করিতে পারে। মধ্যে মাত্র তিন মাস সময়। এই

তিন মাসের মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবার শরৎকালে কৌশল ও বৃজি যখন নদী পার হইতে আসিবে, তখন সম্মুখে যেন মগধের গগনলেহী দুর্গচূড়া দেখিতে পায়।"

জলের মৎস্য ধীবরের জাল হইতে জলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপ আনন্দিত হয় আমারও সেরূপ আনন্দ হইল। এই সকল কথা আমি বুঝি। বলিলাম "দশ হাজার লোক দিয়া তিন মাসের মধ্যে এরূপ দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই বর্ষাকালে পথ অতিশয় দুর্গম ; মালমশলা সংগ্রহ হইবে না।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে ভার তোমার নয়। তুমি শুধু দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিবে। উপাদান সংগ্রহ আমি করিব। রাজ্যের সমস্ত রণহস্তী পাষাণাদি বহন করিয়া দিবে। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে তিনমাসের মধ্যে দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিব।"

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি না পার?"

"আমার মুণ্ড শর্ত রহিল। কবে কার্য আরম্ভ করিব?"

মন্ত্রী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখনও রবি স্থিররাশিতে আছেন ; আজ হইতে চতুর্থ দিবসে গুরুবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিবেন। অতএব সেইদিনই কার্যের পত্তন হওয়া চাই।"

"তথা আজ্ঞা, তাহাই হইবে।"

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মহামাত্য বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা বলিতেছি মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার উপর অত্যন্ত গূঢ় কার্যের ভার অর্পিত হইতেছে। সর্বদা স্মরণ রাখিও যে শত্রুরাজ্যে দুর্গ নির্মাণের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ করিতে দিবে না, পদে পদে বাধা দিবে। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে। তাহারা যদি একবার মগধের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, সপ্তাহকালমধ্যে কোশলের মহারাজ ও লিচ্ছবির কুলপতিগণ এ সংবাদ বিদিত হইবে। সুতরাং নিরতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি তোমার দশ সহস্র কর্মিক লইয়া কাল গঙ্গা-শোণ সংগ্রামে যাত্রা করিবে। এমনভাবে যাত্রা করিবে—যাহাতে কাহারও সন্দেহ উদ্রিক্ত না হয়। একবার যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিলে আর কোনও ভয় নাই। কারণ, সে স্থান জঙ্গলপূর্ণ, প্রায় জনহীন। কিন্তু তৎপূর্বে পথে যদি কোনও ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না। কার্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মগধের মুদ্রাঙ্কিত পত্রের প্রতীক্ষা করিবে। সেই পত্রে দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ ও চিত্র লিপিবদ্ধ থাকিবে। যথাসময়ে চিত্রানুরূপ দুর্গের শুভারম্ভ করিবে। স্মরণ রাখিও তুমি এ কার্যের নিয়ামক, কোন বিঘ্ন ঘটিলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার।"

আমি বলিলাম, "যথা আজ্ঞা। কিন্তু এই দশ সহস্র লোকের আহার্য কোথায় পাইব?"

মন্ত্রী বলিলেন, "গঙ্গা-শোণ-সংগমের নিকট পাটলি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক সন্ধ্যার জন্য সেই গ্রামে আতিথ্য-স্বীকার করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি তোমাদের উপযুক্ত আহার্য পাঠাইব।"

তারপর উষাকাল সমাগত দেখিয়া মহামাত্য আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে বলিলেন, "শুনিয়া থাকিবে, সম্প্রতি বৌদ্ধ নামে এক নাস্তিক ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধগণ অতি চতুর ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী। শাক্যবংশের এক রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ ইহাদের নায়ক। এই যুবরাজ অতিশয় ধূর্ত, কপটী ও পরস্বলুব্ধ। মায়াজাল বিস্তার করিয়া গতাসু মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বশীভূত করিয়া মগধে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল, অধুনা অজাতশত্রু কর্তৃক মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই বৌদ্ধদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, ইহারা মগধের ঘোর শত্রু। দুর্গসন্নিধানে যদি ইহাদের দেখিতে পাও, নির্দয়ভাবে হত্যা করিও।"

তাই ভাবি, কালের কি কুটিল গতি! আড়াই হাজার বৎসর পরে আজ পাটলিপুত্র-রচয়িতা মগধের পরাক্রান্ত মহামন্ত্রী বর্ষকারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি? কিন্তু শাক্যবংশের সেই রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ? আজ অর্ধেক এশিয়া তাঁহার নাম জপ করিতেছে। সসাগরা পৃথ্বীকে যাহারা বারবনিতার ন্যায় উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সেই ভুক্তিতা ধরিত্রীর ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে, আর যে নিঃসম্বল রাজ-ভিখারীর একমাত্র সম্পদ ছিল নির্বাণ, সেই শাক্যসিংহের নাম অনির্বাণ শিখার ন্যায় তমসান্ধ মানবকে জ্যোতির পথ নির্দেশ করিতেছে।

বর্ষাকালে স্থপতি-সূত্রধর-সম্প্রদায় প্রায়শঃ বসিয়া থাকে তাই আমার শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদিগকে সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হইল না। যথাসময়ে আমার দশ হাজার শিল্পী নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কোনও পথে দুই শত, কোনও পথে চারিশত বাহির হইল—যাহাতে নাগরিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বেলা প্রায় তিন প্রহরকালে নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে সকলে সমবেত হইল।

এখান হইতে গঙ্গা-শোণ-সংগম প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ, ন্যূনাধিক একদিনের পথ। পরামর্শের পর স্থির হইল যে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব যাইব, তারপর পথিপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়া পরাহ্নে অতিপ্রত্যূষে আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিব। তাহা হইলে মধ্যাহ্নের পূর্বে পাটলিগ্রামে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

তখন সকলে যুদ্ধগামী পদাতিক সৈন্যের মতো শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিত আরম্ভ করিল। আকাশে প্রবল মেঘাড়ম্বর, শীতলবায়ু খরভাবে বহিতেছে ; রাত্রিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। কিন্তু সেজন্য কাহারও উদ্বেগ নাই। আসন্ন কর্মের উল্লাসে সকলে মহানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

মগধরাজ্যের স্থানীয় বলিয়া তখন রাজগৃহ হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চতুর্দিকে বিভিন্ন রাজ্যে যাইবার পথ ছিল। তদ্‌ভিন্ন নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার পথও ছিল। রাজকোষ হইতে পথের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হইত। আবশ্যক হিসাবে পথের উপর প্রস্তরখণ্ড বিছাইয়া পথ পাকা করা হইত, পথিকের সুবিধার জন্য পথের ধারে কূপ খনন করানো হইত, ছায়া করিবার জন্য দুইধারে বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী বৃক্ষ রোপিত হইত। মধ্যে নদী পড়িলে সেতু বা খেয়া বন্দোবস্ত থাকিত।

এই সকল পথে দলবদ্ধ বৈদেশিক বণিকগণ অশ্ব গর্দভ ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মহার্ঘ পণ্যভার বহন করিয়া নগরে নগরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়াইত ; নট-কুশীলব সম্প্রদায় আপন আপন কলানৈপুণ্য দেখাইয়া ফিরিত। রাজদূত দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া বায়ুবেগে গোপন বার্তা বহন করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইত। কদাচ রাত্রিকালে এই সকল পথে দস্যু-তস্করের ভয়ও শুনা যাইত। বন্য আটবিক জাতিরা এইরূপ উৎপাত করিত। কিন্তু তাহা ক্বচিৎ, কালেভদ্রে। পথের পাশে সৈনিকের গুল্ম থাকায় তস্করগণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রাজপথ যথাসম্ভব নিরাপদ ছিল।

উত্তরে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত মগধের সীমা—সেই পর্যন্ত পথ গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ু স্তব্ধ এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিল। আমরা রাত্রির মতো পথসন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যেকের সহিত এক সন্ধ্যার আহার্য ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে রন্ধনের সুবিধা নাই। কষ্টে যদি বা অগ্নি জ্বালা যায়, বৃষ্টি পড়িলেই নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তথাপি অনেকে একটা মৃত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যব-গোধূমচূর্ণ ও শক্তু শানিয়া পিষ্টক-পুরোডাশ তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার যাহারা অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা চিপিটক জলে সিক্ত করিয়া দধিশর্করা সহযোগে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে দশ হাজার লোকের কলরব, গুঞ্জন, গান, চীৎকার, গালিগালাজ আসিতেছে। দূরে দূরে ধূনীর ন্যায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে তাহারই আশেপাশে মানুষের ছায়ামূর্তি ঘুরিতেছে। ক্বচিৎ অগ্নিতে তৈল বা ঘৃত প্রদানের ফলে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে চতুষ্পার্শে উপবিষ্ট মানুষের মুখ ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ যেন সহসা বিজন প্রান্তর মধ্যে এক ভৌতিক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত কদলী, কপিত্থ, রসালো ইত্যাদি ফল, কিঞ্চিৎ মৃগমাংস এবং এক দ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত হিঙ্গুল-বর্ণ অতি উৎকৃষ্ট আসব ছিল। আমি তদ্দ্বারা আমার নৈশ আহার সুসম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর আস্তরণ পাতিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অন্ধকারে দুইজন লোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

একজন উত্তর দিল, "নায়ক, আমি এই ছাউনির রক্ষী। অপরিচিত এক ব্যক্তি কূপের নিকট বসিয়াছিল, তাই আদেশমত ধরিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "মশাল জ্বাল।"

মশাল জ্বালিলে দেখিলাম, প্রহরীর সঙ্গে দীর্ঘাকৃতি নগ্নপ্রায় অতিশয় শ্মশ্রুগুম্ফজটাবহুল পুরুষ। শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসা, চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কূপ-সন্নিকটে কি করিতেছিলে?"

সে ব্যক্তি স্থির নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি রাষ্ট্রপতি হইবে ; তোমার ললাটে রাজদণ্ড দেখিতেছি।"

কৈতববাদে ভুলিবার বয়স আমার নাই। উপরন্তু মহামাত্য যে সন্দেহ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই অপরিচিত জটিল সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাহা জাগরূক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "আপনি দেখিতেছি জ্যোতির্বিদ। আসন পরিগ্রহ করুন।"

আসন গ্রহণ করিয়া জটাধারী কহিলেন, "আমি শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্রের কৃপায় আমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। ত্রিকাল আমার নখদর্পণে প্রকট হয়। আমি দেখিতেছি, তুমি অদূর-ভবিষ্যতে মহালোকপালরূপে রাজদণ্ড ধারণ করিবে। তোমার যশোদীপ্তিতে ভূতপূর্ব রাজন্যগণের কীর্তিপ্রভা ম্লান হইয়া যাইবে।

সন্ন্যাসীকে বুঝিয়া লইলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুতকণ্ঠে কহিলাম, "আপনি মহাজ্ঞানী। আমি অতি দুষ্কর কার্যে যাইতেছি ; কার্যে সফল হইব কিনা আজ্ঞা করুন।"

ত্রিকালদর্শী ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিতনেত্রে রহিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনিই বলুন।"

সন্ন্যাসী তখন মৃত্তিকার উপর একখণ্ড প্রস্তর দিয়া রাশিচক্র আঁকিলেন। আমি মৃদুহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "এ কি, আপনার নখ-দর্পণ কোথায় গেল?"

সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্দেহপ্রখর এক দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "সূক্ষ্ম গণনা নখ-দর্পণে হয় না। তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এ সকল বুঝিবে না।"

আমি বিনীতভাবে নীরব রহিলাম। সন্ন্যাসী গভীর মনঃসংযোগে রাশিচক্রে আঁক কষিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অঙ্কপাত করিবার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তুমি কোনও গুপ্ত রাজকার্যে পররাজ্যে যাইতেছ। শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, এজন্য মনে হয় তুমি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও গূঢ় কার্যে ব্যাপৃত আছ।" এই বলিয়া সপ্রসন্ননেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, "আপনি সত্যই ভবিষ্যদর্শী, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আমি রাজানুজ্ঞায় লিচ্ছবি দেশে যাইতেছি, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি তাহা অবশ্যই আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অবিদিত নাই। এখন কৃপা করিয়া আমার এক সুহৃদের ভাগ্যগণনা করিয়া দিতে হইবে। প্রহরী, কুলিক মিহিরমিত্র জম্বু-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাকে ডাক।"

কুলিক মিহিরমিত্র আমার অধীনে প্রধান শিল্পী এবং আমার প্রাণোপম বন্ধু। ভাস্কর্যে তাহার যেরূপ অধিকার, জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেইরূপ পারদর্শিতা। ভৃগু, পরাশর, জৈমিনী তাঁহার কণ্ঠাগ্রে।

মিহিরমিত্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলে আমি সন্ন্যাসীকে নির্দেশ করিয়া কহিলাম, "ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তোমার ভাগ্যগণনা করিবেন।"

মিহিরমিত্র সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া বসিল। তাঁহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজ করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, "কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা দিল। সে করতলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিল, "তোমার অকালমৃত্যু ঘটিবে।"

মিহিরমিত্র বলিল, "ঘটুক, কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৃষ লগ্নে।"

"বৃষ লগ্নে?" মিহিরমিত্র হাসিল, "উত্তম। চন্দ্র কোথায়?"

"তুলা রাশিতে।"

"তুলা রাশিতে? ভালো। কোন্ নক্ষত্রে?"

সন্ন্যাসী নীরব। ব্যাকুল-নেত্রে একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু পলায়নের পথ নাই। জ্যোতিষীর নাম শুনিয়া উৎসুক কর্মিকগণ একে একে আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহিরমিত্র কঠোরকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে?"

জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠাধর লেহন করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিল, "চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে।"

মিহিরমিত্র আমার দিকে ফিরিয়া অল্প হাস্য করিয়া বলিল,, "এ ব্যক্তি শঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানে না।"

তখন সন্ন্যাসী দ্রুত উঠিয়া সেই শ্রমিক-ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী অসাধারণ বলিষ্ঠ—কিন্তু বিশ জনের বিরুদ্ধে একা কি করিবে? অল্পকালের মধ্যেই সকলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিবার পর সন্ন্যাসী-বলিল, "মহাশয়, আমাকে বৃথা বন্ধন করিতেছেন। আমি কোন ভিক্ষুক মাত্র, জ্যোতিষীর ভাণ করিয়া কিছু বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনারা জ্ঞানী—আমার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি কোশল অথবা বৃজির গুপ্তচর। আমাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলে।"

সন্ন্যাসী ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, কুমারীর শপথ, জয়ন্তের শপথ, আমি গুপ্তচর নহি। আমি ভিক্ষুক। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না—উঃ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত—একটু জল..." এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি একজন প্রহরীকে আদেশ করিলাম, "কূপ হইতে এক পাত্র জল আনিয়া ইহাকে দাও।"

জল আনীত হইলে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে জলপাত্র ধরা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, জলপানের কোনও আগ্রহ নাই।

প্রহরী বলিল, "জল আনিয়াছি—পান কর।"

সন্ন্যাসী নীরব নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, কথা কহিল না। আমি তখন তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, "তৃষ্ণার্ত বলিতেছিলে, জলপান করিতেছ না কেন?"

সন্ন্যাসী তখন ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি জলপান করিব না।"

সহসা যে প্রহরী জল আনিয়াছিল, সে জলপাত্র ফেলিয়া দিয়া কাতরোক্তি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 'কি হইল, কি হইল'—বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। দেখা গেল, এই অল্পকালের মধ্যে তাহার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রমে সৃক্কণী বাহিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। বাক্য একেবারে রোধ হইয়া গিয়াছে। 'কি হইয়াছে?' 'কেন এরূপ করিতেছে?' এই প্রকার বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল ভূপতিত জলপাত্রটি অঙ্গুলি-সংকেতে দেখাইতে লাগিল।

তারপর অর্ধদণ্ডের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া প্রহরী ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহার বিষ-বিধ্বস্ত দেহ মৃত্যুর করস্পর্শে শান্ত হইলে পর, সমবেত সকলের দৃষ্টি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপর গিয়া পড়িল। ক্রোধান্ধ জনতার সেই জিঘাংসানিষ্ঠুর দৃষ্টির অগ্নিতে সন্ন্যাসী যেন পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধ করি সেই ক্ষিপ্ত কর্মিকদল সন্ন্যাসীর দেহ শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু সেই মুহূর্তে শ্রমিকব্যূহ ঠেলিয়া কর্মিকজ্যেষ্ঠ বিশালকায় দিঙ্‌নাগ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূশায়িত সন্ন্যাসীর জটা ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া সকলের দিকে ফিরিয়া পুরুষকণ্ঠে কহিল, "ভাই সব, এই ভণ্ড তপস্বী শত্রুর চর। আমাদের প্রাণনাশের জন্য কূপের জল বিষ মিশ্রিত করিয়াছে। ইহার একমাত্র উচিত শাস্তি ... মৃত্যু ; অতএব সে শাস্তি আমরা ইহাকে দিব। কিন্তু এখন নয়। তোমরা সকলেই জান, যে কার্যে আমরা যাইতেছি, তাহাতে নরবলির প্রয়োজন। ভৈরবের তুষ্টি সাধন না করিলে আমাদের কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। সুতরাং এখন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না। যথাসময় গঙ্গার উপকূলে আমরা ইহাকে জীবন্ত সমাধি দিব। এই পাপাত্মার প্রেতমূর্তি অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের দুর্গ পাহারা দিবে।"

দিঙ্‌নাগের কথায় সকলে ক্ষান্ত হইল।

তারপর মৃত প্রহরীর দেহ সকলে মিলিয়া কূপ-সন্নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিল এবং সন্ন্যাসীকে সেই বৃক্ষশাখায় হস্তপদ বাঁধিয়া ভাণ্ডবৎ ঝুলাইয়া রাখিল।

পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহরে পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার উপকূলে জঙ্গলে পরিবৃত অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ—সর্বসাকুল্যে বোধ করি পঞ্চাশটি দরিদ্র পরিবারের বাস। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই নিষাদ কিংবা জালিক—বনে পশু শিকার করিয়া এবং নদীতে মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মাঝে মাঝে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষাদি কাটিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া যব, গোধূম, চনক ইত্যাদিও উৎপন্ন করে। আমরা সদলবলে উপস্থিত হইলে গ্রামিকেরা আমাদের আততায়ী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা অনেক আশ্বাস দিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না, কিরাতভীত মৃগযূথের মতো গভীর বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন আমরা অনাহূত যেখানে যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। গ্রামের সংবৎসরের সঞ্চিত খাদ্য এক সন্ধ্যার আহারে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সেদিন আর কোন কাজ হইল না। শ্রান্ত কর্মিকদল যে যেখানে পারিল ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কাজের হড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রণহস্তীর পৃষ্ঠে স্তূপীকৃত খাদ্য বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ছাউনি ফেলিতে, প্রস্তরাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমস্ত দিন কাহারও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ রহিল না।

দূতহস্তে মহামন্ত্রী দুর্গের নক্সা পাঠাইয়াছেন, তাহা লইয়া মিহিরমিত্র ও দিঙ্‌নাগের সঙ্গে করিয়া আমি দুর্গের স্থান-নির্ণয়ের জন্য নদীসংগমে গেলাম। বর্ষায় কূলপ্লাবী দুই মহানদী স্ফীত তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোররবে ছুটিয়াছে। গঙ্গা ধূসর, গৌণ স্বর্ণাভ। দুই স্রোত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে আবর্তিত জলরাশি ফেনপুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সংগমের দক্ষিণ উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে শোণ এবং সংযুক্ত প্রবাহের সন্ধিস্থলে এক বিশাল দ্বিভুজের সৃষ্টি হইয়াছে—মনে হয় যেন, দুই নদী বাহু বিস্তার করিয়া দক্ষিণের তটভূমিকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস করিতেছে। বহু পর্যবেক্ষণ ও বিচারের পর স্থির করিলাম যে, এই দ্বিভুজের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে দুর্গের দুইদিক নদীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে, পরিখা খননের প্রয়োজন হইবে না।

তারপর সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিবার জন্য লোক লাগিয়া গেল। বড় বড় পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ভূমি সমতল করা হইতে লাগিল। হস্তী সকল ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ড টানিয়া বাহিরে লইয়া ফেলিতে লাগিল। বৃক্ষপতনের মড়-মড় শব্দে, মানুষের কোলাহলে, হস্তী ও অশ্বের নিনাদে দিক্‌প্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। যেন বহুযুগব্যাপী নিদ্রার পর অরণ্যানী কোন দৈত্যের বিজয়-নাদে চমকিয়া উঠিল।

সমস্তদিন এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দিঙ্‌নাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "নায়ক, রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত ; আজ দুর্গারম্ভের পূর্বে দৈবকার্য করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপ দৈবকার্য?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "ইহার মধ্যে ভুলিয়া গেলেন? সেই ভণ্ড তপস্বী—আজ তাহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন সকল কথা স্মরণ হইল। বলিলাম, "ঠিক কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা বেশ, তাহাকে যখন বধ করিতেই হইবে, তখন এক কার্যে দুই ফল হউক। শত্রুনিপাত ও দেবতুষ্টি এক সঙ্গেই হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবকার্যের কি কি অনুষ্ঠান তাহা কি তোমাদের জানা আছে?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "অনুষ্ঠান কিছুই নহে। বলিকে সুরাপান করাইয়া যখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহার কানে কানে বলিতে হইবে, 'তুমি চিরদিন

প্রেতদেহে এই দুর্গ রক্ষা করিতে থাক।"—এই বলিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এই বিধি-ব্যবস্থা জানিলে কোথা হইতে?"

দিঙ্‌নাগ হাসিয়া বলিল, "এ কার্য আমি পূর্বে করিয়াছি। ধনশ্রী শ্রেষ্ঠী যখন গুপ্ত রত্নাগার মাটির নীচে তৈয়ার করে, তখন আমিই কুলিক ছিলাম। সেই সময় অরণ্য হইতে এক শবর ধরিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠী এই নরবলি সম্পন্ন করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তবে এ কার্য তুমিই কর।"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "করিব। কিন্তু নায়ক, কার্যকালে আপনাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহাই বিধি।"

"বেশ, থাকিব।"

দিঙ্‌নাগ চলিয়া যাইবার পর নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময় সে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়ক, সর্বনাশ! সন্ন্যাসী আমাদের ফাঁকি দিয়াছে।"

"ফাঁকি দিয়াছে?"

"বিষপান করিয়াছে। তাহার কবজের মধ্যে বিষ লুকানো ছিল, জীবন্ত সমাধির ভয়ে তাহাই খাইয়া মরিয়াছে। এখন উপায়?"

"কিসের উপায়?"

"মানস করিয়াছি, বলি না দিলে যে সর্বনাশ হইবে। রুদ্র কুপিত হইবেন।" দিঙ্‌নাগ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চিন্তার কথা বটে। নির্বোধ সন্ন্যাসীটা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না। পাছে আমাদের একটু উপকার হয় তাই তাড়াতাড়ি বিষপান করিয়া বসিল। এদিকে আমন্ত্রিত দেবতা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অন্য বলি কোথায় পাওয়া যায়।

বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় শিবিরের প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, "কতকগুলো মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারী ছাউনিতে আশ্রয় খুঁজিতেছিল, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আজ্ঞা হয় তো লইয়া আসি।"

দিঙ্‌নাগ লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব! ... নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন!"

এত সহজে যে বলি-সমস্যা মীমাংসা হইয়া যাইবে তাহা ভাবি নাই। ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দিঙ্‌নাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।

সর্বশুদ্ধ চারি পাঁচটি ভিখারী,—পরিধানে কৌপীন, সংঘাটি ও উত্তরীয়, হস্তে ভিক্ষাপাত্র,—আমার সম্মুখে আনীত হইল। ভিক্ষুকগণ সকলেই বয়স্থ—কেবল একটি বৃদ্ধ—বয়স বোধ করি সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।

বৃদ্ধ স্মিত হাস্যে বলিলেন, "মঙ্গল হউক।"

এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনও দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির-সৌদামিনী জ্বলিতেছে কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত!

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল,—'অমিতাভ! অমিতাভ!'

আমি বাগ্‌রহিত হইয়া আছি দেখিয়া তিনি আবার হাসিলেন।—অপূর্ব প্রভায় সে-মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বৎস, আমরা যাযাবর ভিক্ষু, কুশীনগর যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। অদ্য রাত্রির জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

তাঁহার একজন সহচর উত্তর করিলেন, "শাক্যসিংহ গৌতমের নাম কখনও শুন নাই?"

শাক্যসিংহ? ইনিই তবে সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ! মহামন্ত্রী বর্ষকারের কথা মনে পড়িল। ইঁহারই উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন,—ধূর্ত, কপটী, পরস্বলুব্ধ! মরি মরি, কে ধূর্ত কপটী? মনে হইল, মানুষ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম। হায় মহামন্ত্রী বর্ষকার, তুমি এই পুরুষসিংহকে দেখ নাই, কিংবা দেখিয়াও আত্মাভিমানে অন্ধ ছিলে। নহিলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতে না।

বুকের মধ্যে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস সমস্ত দেহকে কম্পিত করিতে লাগিল। আমার অতিবাহিত জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা, অশেষ দৈন্য, যেন এতকাল মূর্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে দেখা দিল। কি পাইয়া এতদিন ভুলিয়া ছিলাম!

আমি উঠিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলাম, 'অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।"

অমিতাভ আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন, "পুত্র, আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে, আপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।"

আমি আবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলাম, "না শ্রীমন্, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ প্রথম তোমার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণামাত্র আমাকে দান কর।"

একজন ভিক্ষু বলিলেন, "শাস্তা, আপনি ইহাকে ত্রিশরণ দান করুন।"

শাক্যসিংহ কহিলেন, "আনন্দ, তাহাই হউক।" আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "পুত্র, তুমি ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অষ্টশীল পালন কর। আশীর্বাদ করি, যেন বাসনামুক্ত হইতে পার।"

তখন বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তদ্গতকণ্ঠে তিনবার ত্রিশরণমন্ত্র উচ্চারণ করিলাম।

অদূরে দাঁড়াইয়া দিঙ্‌নাগ—দুর্ধর্ষ, নিষ্করুণ অসুরপ্রকৃতি দিঙ্‌নাগ—গলদশ্রু হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিকৃত কণ্ঠ হইতে কি কথা বাহির হইতে লাগিল বুঝা গেল না।

এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।

পরদিন উষাকালে তথাগত কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিরণ্য-বাহুর সুবর্ণ-সৈকতে দাঁড়াইয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি কহিলেন, "পুত্র, আমি চলিলাম। হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়—স্মরণ রাখিও।"

বাষ্পাকুল স্বরে কহিলাম, "শাস্তা, আবার কতদিনে সাক্ষাৎ পাইব?"

সেই হিমবিদ্যুতের ন্যায় হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, "আমি কুশীনগর যাইতেছি, আর ফিরিব না।"

তারপর বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গা-শোণ-সংগমে দুর্গভূমির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "আমি দেখিতেছি তোমার এই কীর্তি বহু সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইবে। এই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম ও তোমার নির্মিত এই দুর্গ এক মহীয়সী নগরীতে পরিণত হইবে। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে, শিল্পে, কারুকলায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। সদ্ধর্ম এইস্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"

এই বলিয়া পুনর্বার আশীর্বাদ করিয়া দিব্যদর্শী পরিনির্বাণের পথে যাত্রা করিলেন।

ছোটলোক

বনফুল

উন্নত-মস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরের নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই, পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কন্টকসঙ্কুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশী অন্যায় হয় না। উন্নত-মস্তক রাঘব সরকারের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি দ্রুতপদেই চলিয়াছেন।

সুনির্দিষ্ট নীতি-অনুসরণকারী, অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না। যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক রিক্‌শাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল।

রিক্‌শা চাই বাবু—রিক্‌শা—

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায় ... ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিক্‌শা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন। ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল।

সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র নারায়ণ, বলশেভিজম্‌ ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই। কোথায় যাবেন?

ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি?

ছ' পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিক্‌শাওয়ালাও পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই?

আমি রিক্‌শা চড়ি না।

কেন?

রিক্‌শা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন।

লোকটার চোখে মুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সারেঙ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মা নাসিমকে মেরেছে। মা মেরেছিল মারুক, কিন্তু ও মারবে কেন? ও কে?

'গরু-বাছুর রাখি না-রাখি, চাষ-রোপন করি না-করি, তাতে ওর কী? জমি খিল যায় তো যাবে, তাতে ওর কী মাথা-ব্যথা! ঘরের খড় বদলানো দরকার কি না-দরকার তা আমরা দেখব। ভিজতে হলে ভিজব আমরা মায়ে-পোয়ে। ওকে ছাতি মেলতে ডাকবে না কেউ।'

'না', গোলবানু বলে, 'এবার থেকে তত্ত্বপালন করবে গহরালি।'

'কে গহরালি?' নাসিম ঘাড় ঝাড়া দিয়ে তেড়ে ওঠে।

'মস্ত লোক। জমি আছে পাঁচ কানি। কাচারি আছে দরজায়। দায়েরী মোকদ্দমা আছে ক'নম্বর।'

'তাতে আমাদের কী?'

'ওকে ধরলে জমি-জায়গা ঠিক থাকবে, খাওন-পিরনের কষ্ট থাকবে না, খড়-কুটার বদলে ঢেউ-টিনের ঘর উঠবে একদিন।'

'চাই না। আমাদের এই ভাঙ্গা ঘরই ভালো। আমরা শাক-লতা খেয়ে থাকব। তুই ওকে তাড়িয়ে দে।'

শক্ত মার দিলে গহরালি। সঙ্গে-সঙ্গে গোলবানুও হাত মেলাল।

বাপজান বেঁচে থাকলে এমন কেউ মারতে পারত না তাকে। মাঠে যাবার জন্য তাকে ঠেলাঠেলি করত না। সে জাল নিয়ে বিলে-বাওড়ে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরতে। বাপজান বলত, 'হাটে তোকে কাটা-কাপড়ের দোকান করে দেব একখানা।' 'তার চেয়ে আমাকে একটা নৌকা কিনে দাও', বলত নাসিম, 'মাটির চেয়ে দরিয়ার পানি আমার বেশি ভালো লাগে।'

বাপজানের নৌকা কিনে দেবার সাধ্য ছিল না। নাসিম এখনো এত বড়ো হয়নি যে, কেরায়া নৌকা বেয়ে খেটে খাবে। তার জাল কবে ছিঁড়ে গেছে। তবু জালের টান সে ভুলতে পারেনা। নদীর ধারে চুপটী করে বসে থাকে। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে চোখের জল।

সে শুনেছে, মা নিকা বসবে গহরালির কাছে। এক ঘরের মানুষ হয়ে থাকবে তারা। নাসিমের আর জায়গা কোথায়? হাতনেয়, পাছ-দুয়ারে। লোকে যখন মাকে জিগ্‌গেস করবে 'এ কে?' তখন মা বলবে, 'আমার আগের পুরুষের সন্তান।' 'কার ভাতে আছিস?' যখন কেউ জিগ্‌গেস করবে নাসিমকে, সে বলবে 'গহরালির ভাতে।' বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে নাসিমের।

মাইল-খানেক দূরে ব্রাঞ্চ লাইনের ইস্টিমার থামে। পাটক্ষেতের পাশে। জেটি বা ফ্ল্যাট নেই, বাদাম গাছের গুড়ির সঙ্গে কাছি জড়িয়ে ইস্টিমার পাড় ঘেঁষে দাঁড়ায়, আশ্চর্যরকম গা বাঁচিয়ে। সটান পাড়ের উপরেই সিঁড়ি পড়ে দু'খানা। সিঁড়ির এ-ধার থেকে ও-ধারে বাঁশের লগি ধরে দাঁড়ায় দু'জন খালাসী। নামা-ওঠা করে যাত্রীরা। বাদাম গাছের তলায় বসে ছোট একটি টিনের বাক্সতে করে টিকিট বেচে ঘাট সরকার। যারা নামে তাদের থেকে টিকিট কুড়োয়, ফাঁকি দিয়ে সে আসতে পেরেছে তার সঙ্গে এক ফাঁকে কথাটা সেরে রাখে। তারপর উঠে আসে ইস্টিমারে, হিসাব-কিতাব করতে জাহাজের বাবুর সঙ্গে। ঘাট-সরকার নেমে না-যাওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি তোলে না। একখানা তুললেও আরেকখানা রেখে দেয়। লগি লাগে না ঘাট-সরকারের।

ডোবা দেশ, প্রায়ই সময়েই জল থাকে দাঁড়িয়ে। গাছের গোড়াটাই যা একটু ট্যাকা-মতন। যাত্রীরা জল ভেঙ্গে গিয়ে গাঁয়ের রাস্তা ধরে। হাতে-ঠেলা ডোঙা আছে একখানা। মালামাল থাকলে তার শরণ নেয়। বাচ্ছা-কাচ্ছারা কাঁধে-কাঁধে করে পার হয়। ছুটুলে বউ হলে পাঁজা-কোলে করে।

'সিঁড়ি তোল' দোতলার থেকে সারেঙ হুকুম দেয়।

ঘাট-সরকার এখনো নামেনি বুঝি? না, এই নেমে গেল আঁকা বাঁকা পায়ে। তুলে নিল শেষ সিঁড়িটা। হড়-হড়-হড়-হড় করে মোটা শিকলে বাঁধা নোঙর উঠে আসতে লাগল।

একটা লোক তাড়াতাড়িতে নামতে পারেনি বুঝি। লোক কোথায়, দশ-বারো বছরের ছেলে একটা। প্যাসেঞ্জার নাকি? কে জানে? জাহাজ দেখতে উঠে এসেছিল হয়তো দুষ্টুমি করে। তবে নেমে যেতে বল পরের ঘাটে, পাতাকাটায়। শেষ-বেলায় ভাটিতে তরতরিয়ে বেয়ে যেতে পারবে একমাল্লার নৌকায়। আন্ধার হয়ে যাবে, তীরে যাবে কি করে! আহা! বাপ-মা কত ভাববে না জানি।

ছোট ইস্টিমার, উপরের ঢালা ডেকে শুধু থার্ড ক্লাস। সামনের দিকে ফার্স্ট্ ক্লাসের দুটো পায়রার খোপ, আর তারই সামনের খোলা কোণাচে জায়গাটুকুতে সারেঙের হুইল। নাসিম একেবারে সেখানে এসে হাজির হল।

প্রথমটা কেউ দেখেও দেখেনি। ভেবেছে কলের কায়দা দেখবার জন্যে এমনি উঠে এসেছে বুঝি। কিন্তু, না, নড়ে না ছেলেটা।

'কি চাই?' চটি পায়ে, কিস্তি টুপি মাথায়, সারেঙ হুঁকো ফুঁকছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে জিগগেস করলে।

'হুজুরের যদি চাকরের দরকার থাকে আমাকে রাখতে পারেন।'

'তোর দেশ কই?' সারেঙ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল নাসিমের মুখের দিকে।

'এইখানেই হুজুর, কনকদিয়া।'

'মা-বাপ আছে?।'

'কেউ নাই।'

আবার কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল সারেঙ। বললে, 'কাজ করতে পারবি তুই?'
'কি-কি কাজ হুজুর?'

'রাঁধা-বাড়া, ধোয়া-মোছা, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা—এইসব আর কি। পারবি? বেশ, লেগে যা তা হলে। মুফৎ একটা ছোকরা যদি পাওয়া যায় তো মন্দ কি।' হুইলের লোক ইয়াদালির সঙ্গে একবার চোখ-তাকাতাকি করে : 'অন্তত হুঁকোটা তো সাজতে পারবে, গা-হাত-পা টিপে দিতে পারবে তো দরকার হলে।'

ইয়াদালি বললে, 'মাইনে পাবে না কিছু?'

'মাইনে না হাতি!' সারেঙ ঝামটা দিয়ে উঠল : 'সোতের শ্যাওলা দিয়ে তরকারি রান্না করে খেতে হবে? বয়ে গেছে আমার! অমনি থাকতে চায় তো থাকবে, নইলে নামিয়ে দেব জোর করে। কি, টিকিট আছে?'

'না হুজুর, মাইনে চাই না আমি।'

জাহাজে যে জায়গা পেয়েছে এই নাসিমের বেশি। বাপ নয়, চাচা নয়, মুনিব নয়, মালেক নয়, উটকো বাজে লোকের যে মার খেতে হবে না মুখ বুজে, এই তার অনেক। অজানার টানে যে ভাসতে পেরেছে অকূলে এই তার মহা সুখ।

'ভালো করে কাজ-কর্ম করতে পারলে জাহাজেই বহাল করব এক সময়। প্রথমেই সিঁড়ি, পরে পাটাতন, ক্রমে ক্রমে শুখানি, শেষে একেবারে সারেঙ। কে বলতে পারে? আগে বিনি মাইনের চাকর, শেষকালে এই জাহাজের জমিদার।' সারেঙ তার সাদা শীর্ণ দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল।

কিন্তু প্রথম দিনই রাত্রে নাসিম মার খেল সারেঙের হাতে। বেখেয়ালে ভেঙে ফেলেছিল একখানা কাচের বাসন। আর যায় কোথা! বলা-কওয়া নেই, মুখে-মাথায়

ঘাড়ে-পিঠে পড়তে লাগল চাঁটির পর চাঁটি। ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল নাসিম। বেশি গোলমাল করবে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে দেবে কালো জলে।

ব্যথার চেয়ে আশ্চর্য লাগল বেশি নাসিমের। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। এই এখানকার রেওয়াজ। সবাইকেই মার খেতে হয় সারেঙের হাতে। যারা সিঁড়ি দেয়, যারা পাটাতন ধোয়, যারা আছে লঙ্গরের কাজে দড়িকাছির কাজে, যারা বা লাইট ঘোরায়, তাদের কাজের এতটুকু গলতি বা গাফিলতি হলেই শুরু হয় মারধোর। নিচে মেস্তরির এলাকা। তাকে ঘিরে কাজ করে কয়লাওয়ালা, আগুনওয়ালা, ইঞ্জিনওয়ালা। কিন্তু চরম শাসনের ভার সারেঙের হেপাজতে। ভুল করেছে কেউ, এক কল ঘোরাতে আরেক কল ঘুরিয়ে দিয়েছে, এক ডাণ্ডা টানতে আরেক ডাণ্ডা টেনেছে, তা হলে আর রক্ষে নেই। লাথি-চড়, জাত বেজাতের গালাগালি, জুতা-পিট্টি পর্যন্ত। তাতেও না শানায়, চাকরি থেকে বরখাস্ত।

কেনই বা হবে না শুনি? কোম্পানি শুধু সারেঙকে চেনে, সারেঙকে বোঝে। জাহাজের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সে। সমস্ত দায়িত্ব তার। চলতি-পথে ইস্টিমার যদি নৌকা ডুবিয়ে ফেলে, খেসারত দিতে হবে সারেঙ সাহেবকে। দুর্যোগে পড়ে খোদ ইস্টিমার যদি ডুবে যায়, দায়ী কে? কোম্পানির সাহেবরা নয়। যত কিছু মালি-মোকদ্দমা চলতি-পথের ইস্টিমার নিয়ে,—সমস্ত ফলাফল সারেঙ সাহেবের। আর যদি ঝড়-তুফান থেকে ইস্টিমার পাড়ে ভিড়ানো যায় তার পুরস্কারও এই সারেঙ সাহেবরই প্রাপ্য। মেস্তরি-খালাসীরা যতই হাঁক-ডাক দৌড়-ঝাঁপ করুক, যতই কায়দা-কেরামতি দেখাক, টাকার তোড়ার এক-আধটু ছিটে ফোঁটাও কারুর বরাতে জুটবে না। যত মেডেল সব সারেঙ সাহেবের গলায় ঝোলানো।

'কী হল হঠাৎ?'

ইস্টিমার চরে ঠেকেছে। চোরা চর, কুয়াশায় ঠাহর হয়নি। চাকা বসে গেছে মাটির মধ্যে, শিগগির যে ছাড়ান পাবে এমন মনে হয় না। খবর পাঠাতে হবে বন্দরের ডকে, জালি বোটে করে লোক পাঠাতে হবে কাছের যে ইস্টিশানে টরে-টক্কা আছে। সেও এমন কিছু ধারাধারি নয়। বেশির ভাগ ইস্টিশনই তো গাছতলা বা ক্ষেত-খোলা। কম-সে-কম সাত-আট ঘণ্টা লেট্ আজ নিঘ্‌ঘাত। মধ্যিখানে যত ঘাটে যত্রীরা ইস্টিমারের আশায় বসে আছে, তারা সমস্ত রাত আজ দূরে ধোঁয়া দেখবে আর হুইস্‌ল শুনবে।

দোষ কার?

দোষ শুখানির, দোষ সেকেণ্ড মেটের। লম্বা-চওড়া জোয়ান মরদ সব, এখন আর মারতে আরাম লাগে না, নিজেরই হাতে-পায়ে চোট লাগে। কিন্তু যাবে কোথায়? এই মাসের পুরো মাইনে বরবাদ হয়ে যাবে এদের ; খোরাক কিনতে হবে নিজের পয়সায়।

সারেঙ যেন এই জাহাজের ইজারাদার ; মোকররী ইজারা। যত খরচ সরঞ্জাম বাবদ, মেরামত বাবদ, খালাসী-মেস্তরির মাইনে বাবদ—হিসাব করে একটা মোটা টাকা সারেঙের হাতে ধরে দেয় কোম্পানি। সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করার মালিক এই সারেঙ। যাকে খুশি পুরো মাইনে দেয়, যাকে খুশি জরিমানা করে। যাকে খুশি খোরাক কাটে, যাকে খুশি জবাব দেয়। এর বিরুদ্ধে নালিস নেই, সালিস-ফয়সালা নেই। ভিতরের শাসন নিয়ে কোম্পানি মাথা ঘামায় না। সে দেখে, ঘাট থেকে ঘাটে মালে-মানুষ বোঝাই হয়ে ইস্টিমার মোটা মুনাফার মাশুল আনতে পারে কি না।

সমস্ত ইস্টিমার তাই সারেঙের কথায় ওঠে-বসে। সব কর্মচারী তার তাঁবেদার। ইস্টিমার তো নয়, যেন সে লাটদারি পেয়েছে।

'কেঁদে কিছু লাভ হবে না।' পাশ থেকে বললে মকবুল, 'এমনি অনেক মার খেতে হবে। মার খেতে-খেতে তবে প্রমোশন।'

মকবুলও প্রথম ঢোকে চাকর হয়ে। পাকের কাজের নয়, সারেঙের ধোপা-মুচির কাজে। তিন বছর পর সে সিঁড়ি পেয়েছে। সিঁড়ির পর পাবে পাটাতন, তার পরেই দড়ি-কাছি। মার না খেলে উন্নতি নেই জাহাজে।

'সাহেবের সুদৃষ্টি না হলে কিছুই হবার নেই। দশ-বারো বছর পর সাহেবের যদি দয়া হয়, সাট্টিফিকট দেবে। পরে সেই সাট্টিফিকটের জোরে দেয়া যাবে সারেঙগিরি পরীক্ষা।' মুরুব্বির মতো বলে থার্ড মেট, আফসারউদ্দিন, 'সেই সাট্টিফিকট না হলে সবই ফক্কা। ভাই ভারী হাতে সারেঙের পায়ে তেল মাখা চাই। তারপর পাস করে একবার সারেঙ হয়ে নিতে পারলে পায় কে? তখন জমিদার তবিলদার সব একজন।'

'না হে না, এর মধ্যে একটু কথা আছে। যারা চাটগাঁর লোক তাদের দিকেই সাহেবের একটু টান বেশি।' গলা খাটো করে বলে বিলায়েত আলি, বয়লারের খালাসী : 'নিজের বাড়ি চাটগাঁ কিনা। বলে, চাটগাঁ ছাড়া সারেঙ কোথায়? কথায় আছে, সারেঙ শুঁটকি দরগা, এই তিন নিয়ে চাটগাঁ। ধান ডাকাত খাল, এ তিন নিয়ে বরিশাল। সারেঙি করা তো ডাকাতি করা নয়।'

'তোর বাড়ি কোথায় রে ছ্যামরা?' সবাই জিগগেস করে একসঙ্গে।

'এ দেশে।' হতাশ মুখে বলে নাসিম। আর সবাইরও মুখ যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

পরদিন বেদম মার খেল আবদুল। জল মাপতে গিয়ে একটা লোহার কাঠি হারিয়ে ফেলেছে।

মারের সময় কেউ ধরতে আসে না, ছাড়াতে আসে না। এ একেবারে গা-সওয়া নিত্যিকার ব্যাপার। তবু চোখ ছাপিয়ে কান্নার কমতি নেই। নদীর জলে

চোখ মুছতে মুছতে আবদুল বলে, 'মাইনের থেকে দাম আর তার সুদ তো কেটে নেবেই, তবু মেরে খামাখা জখম করবে।'

তবু প্রতিবাদ নেই, বিদ্রোহ নেই। নিজের সমর্থনে দুটো কথাও বলা যাবে না। মার ঠেকাবার জন্যে শক্ত করা যাবে না শরীরের হাড়-মাংস।

নাসিম ভাবে এরা সবাই বুঝি তার মতো নিরাশ্রয়, মা-বাপ-মরা।

তা কেন? সবাই সিঁড়ি থেকে শুরু করে উঠতে চায় জাহাজের 'ফানিলে'। সবাই সারেঙের সার্টিফিকট চায়। মার দিতে না দিলে ঐ হাতে সে কলম ধরবে কেন?

তাই সেদিন যখন মকবুলের সঙ্গে জল-তোলা নিয়ে ইয়ার্কি মারতে গিয়ে একটা বালতি নাসিম নদীতে ফেলে দিল তখন মার খেতে তার আর লজ্জা বোধ হল না। অপমানের জ্বালা পর্যন্ত লাগল না তার মনে। মকবুলের সঙ্গে, সমস্ত খালাসীর সঙ্গে সে দোস্তালি অনুভব করলে।

'তোর কি! মাইনে নেই, শুধু মারের উপর দিয়েই গেল।' মকবুল কান্নার মধ্যে থেকে বললে, 'আর আমার পুরো মাইনেটাই বালতির অন্দরে কেটে নেবে। পরে মাসকাবারে বলবে, আমার থেকে আগাম নে। টাকায় দু-আনা করে সুদ দিবি। জাহাজে বসেই মহাজনি করে। কেউ আমাদের দেখবার-শোনবার নেই।' বলে উপরের দিকে তাকায়। যেন উপরআলা শুনছেন এই আর্তের ফরিয়াদ।

'অন্য জাহাজে চলে যেতে পারিস না?'

'তুই আছিস কোন তালে? এক জাহাজ থেকে ছাড়ান নিলে আর কোনো জাহাজেই ঠাঁই নেই। সারেঙদের মধ্যে সাঁট আছে। তাই তো মার খেয়েও মুখ বুজে থাকি যেন বরখাস্ত না করে। একবার বরখাস্ত করলেই বরবাদ হয়ে গেলাম। পানি ছেড়ে তখন গিয়ে হাল ধরতে হবে।'

'আর কোন জাহাজেই বা তুই যাবি?' পাশ থেকে ইয়াদালি ফোড়ন দেয় : 'সব জাহাজেই এই রেওয়াজ।'

'এমনি পালিয়ে যাওয়া যায় না?'

সবাই হেসে ওঠে। সিঁড়ি থেকে 'ফানিলে' ওঠবার সাধনায় যারা জাহাজে ঢুকেছে, তাদের কাছে এটা নেহাত আজগুবি শোনায়।

'আর পালিয়ে যাওয়া সোজা নয়।' গম্ভীর মুখে বলে সেকেণ্ড মেট : 'তোর নাম-ঠিকানা সাহেবের নোটবুকে টোকা আছে। পালাবি আর পুলিসে এজাহার যাবে। বলবে, আমার জেবের মনিবাগ নিয়েছে, ঘড়ি নিয়েছে। কোম্পানি লড়বে সারেঙের হয়ে। ছিলি জাহাজে, যাবি জেলে।'

তবে এমনি করেই দিন যাবে নাসিমের? এই একঘেয়ে জলের শব্দ শুনে-শুনে? মাইনে নেই, থিত-ভিত নেই, এমনি করেই ভাসবে সে দিন-রাত?

'সাহেবকে খুশি করতে চেষ্টা কর, তা ছাড়া আর পথ নেই। দ্যাখ একবার সিঁড়ি ধরতে পারিস কিনা।'

আর কি করে সে খুশি করবে! যা কাজ তার উপরে সে সাহেবের গা-হাত-পা টেপে, গোসলের আগে তেল মেখে দেয়, চুলে বিলি কাটে। পাকের সময় গুখানি সাহায্য করতে আসে বলেই তার হাড়-মাস এখনো আলাদা হয়নি। তবু মন নেই, মাইনে নেই। বরং জরিমানা বাবদ কিছু তার কাটতে পারে না বলে সাহেবের বড়ো আফসোস। তাই মাঝে মাঝে তাকে উপোস করিয়ে রাখে। সে-সে বেলার লঙ্কা-পেঁয়াজের খরচ বাঁচায়।

চাল নুন লঙ্কা আর পেঁয়াজ সারেঙ যোগান দেয়। আর-সব যার-যার মর্জি-মাফিক। তেল আর মশলা, মাছ আর তরকারি। মাসান্তে মাইনের টাকার থেকে যার-যার চাল-নুন, পেঁয়াজ-মরিচের খরচ কেটে রাখে সারেঙ তাও তার মর্জি-মাফিক।

'যদি মন চাস সারেঙের, চুরি কর।' কে যেন বলে ফিসফিসিয়ে।

এই ইস্টিমারের সঙ্গে মাঝে-মাঝে বার্জ বাঁধা থাকে। তাতে বস্তা-বোঝাই চাল যায়, নুন যায়, লঙ্কা যায়। বার্জের সঙ্গে লোক থাকে। তার সঙ্গে কী বন্দোবস্ত সারেঙ-মেস্তরির, স্টোর-রুমে চলে আসে চাল আর লবণ, মরিচ আর পেঁয়াজের ছালা। সেই চোরাই মালের উপর আবার মুনাফা মারে।

না, আর ভালো লাগে না। কোনো আশা নেই নাসিমের। একদিন অন্তর একদিন, একই রাস্তা দিয়ে ইস্টিমার ঘোরাফেরা করে। যেখানে আসার সময় সন্ধেবেলা—সেখানে আসতে কখনো মাঝ-রাত, কখনো বা পরদিন ভোর—শুধু এইটুকুই যা বৈচিত্র্য। নইলে একঘেয়ে জলের শব্দ, যাত্রীর ভিড়, নোঙর ওঠানামার হড়-হড়, সিঁড়ি ও কাছি ফেলবার সময় সেই ডাক-চিৎকার। ভলো লাগে না আর। ক'দিন পর-পর ঘুরে ঘুরে ইস্টিমার কনকদিয়ায় ফিরে আসে। নদী এত ছোট, তার স্রোত এত দুর্বল, ভাবতে পারত না নাসিম। আগে-আগে মনে হত নদী না-জানি চলে গেছে কোন সমুদ্দুরে। এই দেশ থেকে কোন দূর-বিদূরের বিদেশে।

নিরালায় অন্ধকারে নদীর দিকে চেয়ে কখনো একলাটি এসে বসে নাসিম। ঘন কালো জলে জুনিরাত ঝিলমিল করছে। আজ কনকদিয়া এসেছে মাঝরাতে। বাড়ি-ঘরের কথা মনে পড়ে নাসিমের। ভাবে কোথায় তার বাড়ি-ঘর! তার বাড়ি-ঘর! তার বাড়ি-ঘর নেই, সেখানে ভূতের আস্তানা। মনে পড়ে মার কথা। মার মুখ। মনে করে, তার মা নেই। তার মা কবে মরে গেছে। মার মরা মুখের মতোই মনে হয় এই কালো জলের জ্যোৎস্না।

বড়ো চুরি না করতে পারে, ছোট ছিচকে চুরি কেন করতে পারবে না? দা হাতে করে ডাব বেচতে এসেছে গাঁ-গেরামের লোক, সারেঙ সাহেবের জন্য কিনলে দুটো দশ পয়সায়। জাহাজে উঠে এসে, সিঁড়ি যখন তুলে নিয়েছে, নাসিম সারেঙের কাছ থেকে একটা একানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলে ডাঙার উপর। আর ছ-পয়সা? নাসিম জিভ উলটিয়ে মুখ ভেঙচাল। বেচনদার ছোঁড়াটা নদী থেকে কাদা তুলে ছুঁড়ে মারল নাসিমের দিকে। জাহাজ তখন সরে এসেছে, লাগল না ছিটে-ফোঁটাও। সারেঙ আর নাসিম একসঙ্গে হাসতে লাগল।

এমনি, মাছ এসেছে বেচতে। বাঁশপাতা আর গাং-খয়রা। নাও কিছু ছল-চাতুরী করে। দুধ এসেছে হাঁড়িতে, বাঁশের চোঙায় মেপে দেবে। দাম দেব জাহাজে উঠে। ক্ষেতের টাটকা শশা-খিরাই এনেছে ঝুড়িতে করে। ঘুসো চিংড়ি দিয়ে তরকারি হবে, না হয়, অমনি কাঁচা খাব। তোমার দাম মারা যাবে না। আমি সারেঙ সাহেবের চাকর।

এতদিনে একটা নিমা পেয়েছে নাসিম। একখানা পানি-গামছা। লুঙ্গি একখানা পাবে কবে?

চারটে পয়সা চাইল নাসিম।

এমন স্পর্ধার কথা সারেঙ তার জীবনে শোনেনি। চোখ কপালে তুলে সারেঙ বললে, 'কি বললি?। পয়সা?'

কী ভীষণ হারামি কথা না-জানি বলে ফেলেছে, এমনি ভয়-তরাসে চোখে তাকাল নাসিম।

'কী করবি পয়সা দিয়ে?'

'চা খাব এক খুরি।'

অমনি বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় পড়ল তার গালের উপর। ঘুরে ছিটকে পড়ল নাসিম। সারেঙ গর্জে উঠল : 'এমন বেতরিবৎ! আমার কাছে কিনা বিড়ি চায়! বিড়ি কিনবে! চা কিনবে! কোন দিন শুনব বোতল কিনবে! তেরিবেরি করবি তো নদীর গহিনে নিখোঁজ করে দেব।'

চোখের জলে আবার মার কথা মনে পড়ে নাসিমের। মরে গেলে মার মুখ কেমন দেখাবে তাই সে অন্ধকারে জলের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করে। মার মরামুখের কথা ভেবে মনে সে জোর পায়। জোর পায় এই মার সহ্য করতে! 'মাগো' বলেও যদি সে কাঁদতে না পারে, তবে নিঃশব্দে হজম না করে উপায় কি?

তবু এই অত্যাচারিতের দল একত্র হয় না। খোদ উপরআলা ছাড়া আর কারু কাছে তাদের নালিশ নেই। মুক্তিও নেই এই জাহাজের খোল থেকে। কবে কে সিঁড়ি পাবে, কবে কে পাটাতন, দড়িকাছি, নোঙর-লাইট বা মেস্তরির ইলাকা—তারি

আশায় সবাই দিন গোনে। কে কী ভাবে সারেঙের খাতির কাড়তে পারবে। সুদ নিয়ে, ঘুষ দিয়ে, চুরি করে, মার খেয়ে। চমৎকার গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছে সারেঙ সাহেব।

সেই রাত্রেই এক প্যাসেঞ্জারের এক জোড়া জুতো সরালো নাসিম। সারেঙ তা সটান নদীর মধ্যে ফেলে দিলে। বললে, 'বুদ্ধিকে তোর বলিহরি।' আমি জুতো মসমসিয়ে বেড়াই আর আমাকে পুলিশে ধরুক।' পরদিন রাতে নাসিম যোগাড় করলে একটি টিনের সুটকেশ। সেটাও গেল নদীর গহ্বরে। সেটার মধ্যে মোকদ্দমার নথি, পরচা-দাখিলা, ক'কেতা বেজাবেদা নকল।

কিছুতেই মনের মতো হতে পারছে না নাসিম। পারবি, পারবি, আস্তে-আস্তে পারবি। সারেঙের চাউনিটা তাই যেন তাকে বলে কানে-কানে। তার অক্ষমতার জন্যে সারেঙ রাগ করলেও তাকে সে সরাসরি মারে না তাতেই নাসিম উৎসাহ খোঁজে।

কোম্পানির আলোতে তেজ নেই বৃষ্টি নামলে তেরপল নেই, মেয়ে-পুরুষের আলাদা কামরা নেই, তবু সবাইর চোখে ঘুম আছে। এমন ভদ্র যাত্রী নেই যে তাস খেলে বা গান বা খোস-গল্প করে। চাষাভূষোর লাইন। বন্যার তোড়ের মতো যারা খাটে, আর তাল-তাল মাংসপিণ্ড হয়ে যারা ঘুমোয়।

ঘুমের অগোছালে ট্যাক থেকে কার বেরিয়ে এসেছে টাকার পুঁটলি। নাসিম তা হাত-সাফাই করে তুলে নেয় আলগোছে। একবার ভাবে গুণে দেখি কত আছে। ভাবে পালিয়ে যাই পরের ইস্টিশানে। কিন্তু কে জানে, কী অদম্য আকর্ষণে সারেঙের কাছেই নিয়ে আসে। প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বাঘের মুখে গরুর মতো। যে শুধু মারে, যে হাসিমুখে কথা কয় না, ন্যায্য অধিকারের কানাকড়িও দেয় না হাতে ধরে, তাকেই খুশি করতে আগ্রহ হয়। যে অনবরত চুকলি শোনে, একের থেকে অন্যকে আলাদা করে রাখে তারই মন পাবার জন্যে কাড়াকাড়ির ধুম পড়ে যায়। কে কাকে হটিয়ে দেবে, চলে তার টেক্কাটেক্কি।

'মোটে সাত টাকা সাড়ে ন' আনা।' বলে মকবুল : 'এতে কী হবে! দু'কুড়ি সাত না হওয়া পর্যন্ত খেলা থাকে না, বলে আমাদের সারেঙ সাহেব।'

তবু কাপড়-চোপড়ের চেয়ে নগদ টাকা ভালো। সবচেয়ে ভালো, যদি হয় কিছু জেওর, সোনা-রূপা। দাম কত আজকাল! কাগজের টাকা তার কাছে রদ্দি, ওঁচা।

একখানা নতুন লুঙ্গি হয়েছে এতদিনে। এবার একটা হাফশার্ট।

কিন্তু গয়না কোথায় চাষার বউ-ঝিয়ারীদের? বড়ো জোর নাকে আংটি-চুংটি, হাতে কাচের ঝুরো চুড়ি। সোনাদানা নেই কোথাও।

না, আছে। নতুন বউ যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি। গলায় সোনার হাসনা, হাতে বটফুল। পায়ে রূপোর খাড়ু, আঙুলে ওজরি। ফলসা রঙের শাড়ী পরে ঘোমটা টেনে ঘুমিয়ে

আছে এক পাশে। বরযাত্রীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিক-ওদিক। কে কোথায় চেনবার উপায় নেই। নিফাঁক ভিড় আজ জাহাজে। তবু এরি মধ্যে ফাঁক খুঁজছে নাসিম।

নতুন বউর গলার কাছে নাসিম হাত রাখল। নরম তার গলার কাছটা। আঙুল কাঁপল না নাসিমের। একটানে ছিঁড়ে ফেলল হাসনা।

'চোর! চোর!' ভিড় ঠেলে ক'পা এগুতে না-এগুতেই নাসিমকে ধরে ফেলল যাত্রীরা। তারপর সবাই তাকে মার লাগাল। প্রচণ্ড মার! যে এসে জিগ্‌গেস করছে কী হয়েছে, সেই পরক্ষণে মার লাগাচ্ছে। বামাল সরাতে পারেনি চোর, বউর বিছানার গোড়াতেই ফেলে এসেছে। তাতে কি? মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়েছে তো। হার তো ছিনিয়ে নিয়েছিল গলা থেকে। মার, মার চাঁদা তুলে মার।

'বাবা গো—' নাসিম চিৎকার করে উঠল।

আচকান গায়ে, কিস্তিটুপি মাথায়, চটি পায়ে সারেঙ এসে হাজির। বলে 'কি হয়েছে? কে মারছে আমার ছেলেকে?'

ছেলে! সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সারেঙ সাহেবের ছেলে!

কে বললে, 'ও আপনার চাকর ছিল তো জানতাম।'

'চাকর! মিথ্যে কথা! ও আমার বিয়ার ঘরের ছেলে। আমার মা-হারা সন্তান। ওকে মারে কে?'

'ও গয়না চুরি করেছে নতুন দুলহিনের। গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছে হাসনা।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না! চলো, আমি নিজে পুছ করিগে বিবিকে।'

সারেঙ এগিয়ে এল নতুন বউর নজদিগে। বললে, 'আপনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছে কেউ?'

পরদার বিবি ঢাকা-মুখে গলা খাটো করে বললে, 'না। ঘুমের বেহোঁসে গলা থেকে খসে পড়েছে বিছানায়।'

লতাবাড়ি ইস্টিশান দেখা যায় কাছাকাছি ; বরের পার্টি নামবে এইখানে। জাহাজ ঢিমে হয়ে এল। নোঙর নামতে লাগল হড় হড় করে।

কাছির বাঁদ পড়ল গাছের সঙ্গে।

'সিঁড়ি দে, সিঁড়ি দে—' উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল সারেঙ ঃ 'নাসিম কই? নাসিমকে ডাক। সে আজ থেকে সিঁড়ি ধরবে।'

খালাসীদের মধ্যে হল্লোড় পড়ে গেল। নাসিমের দীক্ষা হল এতদিনে, এত অল্প দিনে। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েই কপাল ফিরল তার। আর যারা ধরা পড়েনি, তারা এখনো নাকানি-চুবুনি খাচ্ছে। সিঁড়ি থেকে পাটাতনে প্রমোশন পাচ্ছে না।

আর এ আজ সিঁড়ি, কাল পাটাতন, পরশু শুখানি, পরে একেবারে সারেঙ, কাপ্তেন, জাহাজ-নাখোদা।

'ধর, ধর ও ছেলেমানুষ, ও একা কেন পারবে? তোরা সবাই মিলে ওকে সাহায্য কর।' উপর থেকে জোরালো গলায় হুকুম হাঁকে সারেঙে।

সার্চ-লাইটের আলোয় নাসিমের জলে-ভরা চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

নতুন বউ নেমে যাবে লতাবাড়ি। পায়ে গুজরি বাজিয়ে আসছে।

আলো পড়েছে অনেক দূর। গাছ-গাছালির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে লগি ধরেছে নাসিম। দুলহিনকে বলছে, 'টলে পড়ে যাবেন। লগি ধরুন।'

না, লগি না ধরেই টলতে লাগল নতুন বউ।

পিছন থেকে কে ধাক্কা মারল নাসিমকে। চমকে চেয়ে দেখে, সেই লোকটা, ভিড়ের মধ্যে সবচেয়ে যে তাকে বেশি মেরেছে। আলোতে চিনল তাকে এতক্ষণে। গহরালি।

আলো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে গোলবানু। ঘন করে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। গায়ের চাদরটা বোরখার মতো করে চাপিয়ে দিয়েছে গায়ের উপর। ঘাটে অনেক বিরানা পুরুষের আনাগোনা।

ধরাধরি করে সিঁড়ি তুলতে লাগল নাসিম, একের পর আরেক চিলতে! পাড়ের কাহেকার ঘোলাটে জলের ছায়ায় দেখতে লাগল তার মায়ের মরা মুখ। আর উপরে দাঁড়িয়ে সারেঙ তাকে দরাজ গলায় বাহবা দিচ্ছে। উড়ছে তার সাদা আচকান, সাদা দাড়ি। দিনরাত করে যে সূয্যি, যেন তার মতো চেহারা।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শনি ও মঙ্গলের—মঙ্গলই হবে বোধ হয়—যোগাযোগ হ'লে তেলেনাপোতা আপনারাও একদিন আবিষ্কার করতে পারেন। অর্থাৎ কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্যে ছুটি পাওয়া যায়—আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে—পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয় বিদ্ধ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তা হ'লে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।

তেলেনাপোতা আবিষ্কার করতে হ'লে একদিন বিকেলবেলার পড়ন্ত রোদে জিনিসে মানুষে ঠাসাঠাসি একটা বাসে গিয়ে আপনাকে উঠতে হবে, তারপর রাস্তার ঝাঁকানির সঙ্গে মানুষের গুঁতো খেতে খেতে ভাদ্রের গরমে ঘামে, ধুলোয় চটচটে শরীর নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে রাস্তার মাঝখানে নেমে পড়তে হবে আচমকা। সামনে দেখবেন নিচু একটা জলার মতো জায়গার ওপর দিয়ে রাস্তার লম্বা সাঁকো চলে গেছে। তারই ওপর দিয়ে বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে বাসটি চ'লে গিয়ে ওধারে পথের বাঁকে অদৃশ্য হবার পর দেখবেন সূর্য এখনো না ডুবলেও চারিদিক ঘন জঙ্গলে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। কোনোদিকে চেয়ে জনমানব দেখতে পাবেন না। মনে হবে পাখিরাও যেন সভয়ে সে-জায়গা পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। একটা স্যাঁতসেতে ভিজে ভ্যাপসা আবহাওয়া টের পাবেন। মনে হবে নিচের জলা থেকে একটা ক্রূর কুণ্ডলিত জলীয় অভিশাপ ধীরে ধীরে অদৃশ্য ফণা তুলে উঠে আসছে।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমে সেই ভিজে জলার কাছেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সামনে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মনে হবে একটা কাদা-জলের নালা কে যেন কেটে রেখেছে। সে নালার মতো রেখাও কিছু দূরে গিয়ে দু-ধারে বাঁশ-ঝাড় আর বড়ো-বড়ো ঝাঁকড়া গাছের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আরো দু-জন বন্ধু ও সঙ্গী আপনার সঙ্গে থাকা উচিত। তারা হয়তো আপনার মতো ঠিক মৎস্যলুব্ধ নয়, তবু এ অভিমানে তারা এসেছে—কে জানে আর কোন অভিসন্ধিতে!

তিনজনে মিলে তারপর সামনের নালার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে থাকবেন, মাঝে-মাঝে পা ঠুকে মশাদের ঘনিষ্ঠতায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে চাইবেন।

খানিক বাদে পরস্পরের মুখও আর ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো ক'রে দেখা যাবে না। মশাদের ঐকতান আরও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠবে। আবার বড়ো রাস্তায় উঠে ফিরতি কোনো বাসের চেষ্টা করবেন কি না যখন ভাবছেন, তখন হঠাৎ সেই কাদা-জলের নালা যেখানে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে, সেখান থেকে অপরূপ শ্রুতিবিস্ময়কর আওয়াজ পাবেন। মনে হবে বোবা জঙ্গল থেকে কে যেন অমানুষিক এক কান্না নিংড়ে নিংড়ে বার করছে।

সে-শব্দে আপনারা কিন্তু প্রতীক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে উঠবেন। প্রতীক্ষাও আপনাদের ব্যর্থ হবে না। আবছা অন্ধকারে প্রথমে একটি ক্ষীণ আলো দুলতে দেখা যাবে ও তারপর একটি গোরুর গাড়ি জঙ্গলের ভেতর থেকে নালা দিয়ে ধীর মন্থর দোদুল্যমান গতিতে বেরিয়ে আসবে।

যেমন গাড়িটি তেমনি গোরুগুলি—মনে হবে পাতালের কোনো বামনের দেশ থেকে গোরুর গাড়ীর এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি বেরিয়ে এসেছে।

বৃথা বাক্য ব্যয় না ক'রে সেই গোরুর গাড়ির ছই-এর ভেতর তিনজনে কোনোরকমে প্রবেশ করবেন ও তিন জোড়া হাত ও পা এবং তিনটি মাথা নিয়ে স্বল্পতম স্থানে সর্বাধিক বস্তু কিভাবে সংস্থাপিত করা যায় সে-সমস্যার মীমাংসা করবেন।

গোরুর গাড়িটি তারপর যে-পথে এসেছিল, সেই পথে অথবা নালায় ফিরে চলতে শুরু করবে। বিস্মিত হ'য়ে দেখবেন, ঘন অন্ধকার অরণ্য যেন সংকীর্ণ একটু সুড়ঙ্গের মতো পথ সামনে একটু একটু ক'রে উন্মোচন ক'রে দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হবে কালো অন্ধকারের দেয়াল বুঝি অভেদ্য কিন্তু তবু গোরুর গাড়িটি অবিচলিতভাবে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাবে, পায়ে-পায়ে পথ যেন ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে।

কিছুক্ষণ হাত, পা ও মাথার যথোচিত সংস্থান বিপর্যস্ত হবার সম্ভাবনায় বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষ বাধবে, তারপর ধীরে-ধীরে বুঝতে পারবেন চারিধারে গাঢ় অন্ধকারে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও নিমজ্জিত হ'য়ে গেছে। মনে হবে পরিচিত পৃথিবীকে দূরে কোথায় ফেলে এসেছেন। অনুভূতিহীন কুয়াশাময় এক জগৎ শুধু আপনার চারিধারে। সময় সেখানে স্তব্ধ, স্রোতহীন।

সময় স্তব্ধ, সুতরাং এ-আচ্ছন্নতা কতক্ষণ ধ'রে যে থাকবে বুঝতে পারবেন না। হঠাৎ একসময় উৎকট এক বাদ্য-ঝঞ্ঝনায় জেগে উঠে দেখবেন, ছই-এর ভেতর

দিয়ে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে এবং গাড়ির গাড়োয়ান থেকে থেকে সোৎসাহে একটি ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে।

কৌতূহলী হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে গাড়োয়ান নিতান্ত নির্বিকারভাবে আপনাকে জানাবে—"এজ্ঞে, ওই শালার বাঘ খেদাতে।"

ব্যাপারটা ভালো ক'রে হৃদয়ঙ্গম করার পর, মাত্র ক্যানেস্তারা নিনাদে ব্যাঘ্র-বিতাড়ন সম্ভব কি না কম্পিত কণ্ঠে এ-প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করবার আগেই গাড়োয়ান আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে জানাবে যে, বাঘ মানে চিতাবাঘ মাত্র এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত না হ'লে এই ক্যানেস্তারা নিনাদই তাকে তফাৎ রাখবার পক্ষে যথেষ্ট।

মহানগরী থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে ব্যাঘ্রসংকুল এরকম স্থানের অস্তিত্ব কি ক'রে সম্ভব আপনি যতক্ষণ চিন্তা করবেন ততক্ষণে গোরুর গাড়ি বিশাল একটি মাঠ পার হ'য়ে যাবে। আকাশে ততক্ষণ কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত ক্ষয়িত চাঁদ বোধ হয় উঠে এসেছে। তারই স্তিমিত আলোয় আবছা বিশাল মৌন সব প্রহরী যেন গাড়ির দু-পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে স'রে যাবে। প্রাচীন অট্টালিকার যেসব ধ্বংসাবশেষ—কোথাও একটা থাম, কোথাও একটা দেউড়ির খিলান, কোথাও কোনো মন্দিরের ভগ্নাংশ, মহাকালের কাছে সাক্ষ্য দেবার ব্যর্থ আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবস্থায় যতখানি সম্ভব মাথা তুলে ব'সে কেমন একটা শিহরণ সারা শরীরে অনুভব করবেন। জীবন্ত পৃথিবী ছাড়িয়ে অতীতের কোনো কুজ্মটিকাচ্ছন্ন স্মৃতিলোকে এসে পড়েছেন ব'লে ধারণা হবে।

রাত তখন কত আপনি জানেন না, কিন্তু মনে হবে এখানে রাত যেন কখনও ফুরোয় না। নিবিড় অনাদি অনন্ত স্তব্ধতায় সব-কিছু নিমগ্ন হ'য়ে আছে ; —জাদুঘরের নানা প্রাণিদেহ আরকের মধ্যে যেমন থাকে।

দু-তিনবার মোড় ঘুরে গোরুর গাড়ি এবার এক জায়গায় এসে থামবে। হাত-পাগুলো নানাস্থান থেকে কোনোরকমে কুড়িয়ে সংগ্রহ ক'রে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্টভাবে আপনারা একে-একে নামবেন। একটা কটু গন্ধ অনেকক্ষণ ধ'রেই আপনাদের অভ্যর্থনা করছে। বুঝতে পারবেন সেটা পুকুরের পানা-পচা গন্ধ। অর্দ্ধস্ফুট চাঁদের আলোয় তেমন একটি নাতিক্ষুদ্র পুকুর সামনেই চোখে পড়বে। তারই পাশে বেশ বিশালায়তন একটি জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙ্গা ছাদ, ধসে পড়া দেয়াল ও চক্ষুহীন কোটরের মতো পাল্লাহীন জানালা নিয়ে চাঁদের বিরুদ্ধে দুর্গ-প্রাকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

এই ধ্বংসাবশেষেরই একটি অপেক্ষাকৃত বাসযোগ্য ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। কোথা থেকে গাড়োয়ান একটি ভাঙা লণ্ঠন নিয়ে এসে

ঘরে বসিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে এক কলসি জল। ঘরে ঢুকে বুঝতে পারবেন বহু যুগ পরে মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি হিসাবে আপনারাই সেখানে প্রথম পদার্পণ করছেন। ঘরের ঝুল, জঞ্জাল ও ধূলো হয়তো কেউ আগে কখনও পরিষ্কার করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে গেছে। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী আত্মা যে তাতে ক্ষুব্ধ একটি অস্পষ্ট ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রমাণ পাবেন। সামান্য চলাফেরার ছাদ ও দেওয়াল থেকে জীর্ণ পলস্তরা সেই রুষ্ট আত্মার অভিশাপের মতো থেকে থেকে আপনাদের ওপর বর্ষিত হবে। দু-তিনটি চামচিকা ঘরের অধিকার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সমস্ত রাত বিবাদ করবে।

তেলেনাপোতা আবিষ্কারের জন্যে আপনার দুটি বন্ধুর একজন পান-রসিক ও অপরজনের নিদ্রাবিলাসী কুম্ভকর্ণের দোসর হওয়া দরকার। ঘরে পৌঁছেই, মেঝের ওপর কোনোরকমে শতরঞ্চির আবরণ পড়তে না পড়তেই একজন তার উপর নিজেকে বিস্তৃত ক'রে নাসিকাধ্বনি করতে শুরু করবেন, অপরজন পান-পাত্রে নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে দেবেন।

রাত বাড়বে। ভাঙ্গা লণ্ঠনের কাঁচের চিমনি ক্রমশ গাঢ়ভাবে কালিমালিপ্ত হ'য়ে ধীরে-ধীরে অন্ধ হ'য়ে যাবে। কোনো রহস্যময় বেতার-সংকেতে খবর পেয়ে সে অঞ্চলের সমস্ত সমর্থ সাবালক মশা নবাগতদের অভিনন্দন জানাবে ও তাদের সঙ্গে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করতে আসবে। আপনি বিচক্ষণ হ'লে দেয়ালে ও গায়ে বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গি দেখে বুঝবেন, তারা মশাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কুলীন—ম্যালেরিয়া দেবীর অদ্বিতীয় বাহন অ্যানোফিলিস। আপনার দুই বন্ধু তখন দুই কারণে অচেতন। ধীরে ধীরে তাই শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর গুমোট গরম থেকে একটু পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে টর্চটি হাতে নিয়ে ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠবার চেষ্টা করবেন।

প্রতি মুহূর্তে কোথাও ইট বা টালি খ'সে প'ড়ে ভূপতিত হওয়ার বিপদ আপনাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করবে, তবু কোনো দুর্বার আকর্ষণে সমস্ত অগ্রাহ্য করে আপনি ওপরে না উঠে পারবেন না।

ছাদে গিয়ে দেখবেন, অধিকাংশ জায়গাতে আলিসা ভেঙ্গে ধুলিসাৎ হয়েছে, ফাটলে ফাটলে অরণ্যের পঞ্চম বাহিনী ষড়যন্ত্রের শিকড় চালিয়ে ভেতর থেকে এ অট্টালিকার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে ; তবু কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় সমস্ত কেমন অপরূপ মোহময় মনে হবে। মনে হবে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে, এই মৃত্যু সুষুপ্তিমগ্ন মায়াপুরীর কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী রাজকুমারী সোনার কাঠি রূপার কাঠি পাশে নিয়ে যুগান্তরের গাঢ় তন্দ্রায় অচেতন, তা যেন আপনি টের পাবেন। সেই মুহূর্তে অদূরে সংকীর্ণ রাস্তার ওপারে একটি ভগ্নস্তূপ ব'লে যা মনে হয়েছিল তারই একটি জানালায় একটি আলোর ক্ষীণ রেখা আপনি

হয়তো দেখতে পাবেন। সেই আলোর রেখা আড়াল ক'রে একটি রহস্যময় ছায়া মূর্তি সেখানে এসে দাঁড়াবে। গভীর নিশীথরাত্রে কে যে এই বাতায়নবর্তিনী, কেন যে তার চোখে ঘুম নেই আপনি ভাববার চেষ্টা করবেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। খানিক বাদে মনে হবে সবই বুঝি আপনার চোখের ভ্রম। বাতায়ন থেকে সে-ছায়া স'রে গেছে, আলোর ক্ষীণ রেখা গেছে মুছে। মনে হবে এই ধ্বংসপুরীর অতল নিদ্রা থেকে একটি স্বপ্নের বুদ্‌বুদ্ ক্ষণিকের জন্য জীবনের জগতে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আপনি আবার সন্তর্পণে নিচে নেমে আসবেন এবং কখন এক সময়ে দুই বন্ধুর পাশে একটু জায়গা ক'রে ঘুমিয়ে পড়বেন জানতে পারবেন না।

যখন জেগে উঠবেন তখন অবাক হয়ে দেখবেন এই রাত্রির দেশেও সকাল হয়, পাখির কলরবে চারিদিকে ভ'রে যায়।

আপনার আসল উদ্দেশ্য আপনি নিশ্চয় বিস্মৃত হবেন না। এই সময়ে ষোড়শোপচার আয়োজন নিয়ে মৎস্য-আরাধনার জন্যে শ্যাওলা-ঢাকা ভাঙা ঘাটের একটি ধারে ব'সে গুঁড়িপানায় সবুজ জলের মধ্যে যথোচিত নৈবেদ্য সমতে বড়শি নামিয়ে দেবেন।

বেলা বাড়বে। ওপারের ঝুঁকে পড়া একটা বাঁশের ডগা থেকে একটা মাছরাঙা পাখি ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে যেন উপহাস করবার জন্যই বাতাসে রঙের ঝিলিক বুলিয়ে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ও সার্থক শিকারের উল্লাসে আবার বাঁশের ডগায় ফিরে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় আপনাকে বিদ্রূপ করবে। আপনাকে সন্ত্রস্ত ক'রে একটা মোটা লম্বা সাপ ভাঙা ঘাটের কোনো ফাটল থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে অচঞ্চল গতিতে পুকুরটা সাঁতরে পার হ'য়ে ওধারে গিয়ে উঠবে, দুটো ফড়িং পাল্লা দিয়ে পাতলা কাঁচের মতো পাখা নেড়ে আপনার ফাৎনাটার ওপর বসবার চেষ্টা করবে ও থেকে-থেকে উদাস ঘুঘুর ডাকে আপনি আনমনা হ'য়ে যাবেন।

তারপর হঠাৎ জলের শব্দে আপনার চমক ভাঙবে। নিথর জলে ঢেউ উঠেছে, আপনার ছিপের ফাৎনা মৃদু-মন্দভাবে তাতে দুলছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবেন একটি মেয়ে পেতলের একটি ঝক্‌ঝকে ঘড়ায় পুকুরের পানা ঢেউ দিয়ে সরিয়ে জল ভরছে। মেয়েটির চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু গতিবিধিতে সলজ্জ আড়ষ্টতা নেই। সোজাসুজি সে আপনার দিকে তাকাবে, আপনার ফাৎনা লক্ষ্য করবে, তারপর আবার মুখে ফিরিয়ে ঘাড়টা কোমরে তুলে নেবে।

মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার

ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হ'য়ে আছে।

কলসি নিয়ে চলে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি হঠাৎ বলবে, "ব'সে আছেন কেন? টান দিন।"

সে-কণ্ঠ এমন শান্ত মধুর ও গম্ভীর যে এভাবে আপনা থেকে অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলা আপনার মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকবে না। শুধু আকস্মিক চমকের দরুণ বিহ্বল হ'য়ে ছিপে টান দিতে আপনি ভুলে যাবেন। তারপর ডুবে যাওয়া ফাৎনা আবার ভেসে ওঠবার পর আবার ছিপ তুলে দেখবেন বড়শিতে টোপ আর নেই। একটু অপ্রস্তুত ভাবে মেয়েটির দিকে আপনাকে একবার তাকাতেই হবে। সেও মুখ ফিরিয়ে শান্ত ধীর পদে ঘাট ছেড়ে চ'লে যাবে। কিন্তু মনে হবে মুখ ফেরাবার চকিত মুহূর্তে একটু যেন দীপ্ত হাসির আভাস সেই শান্ত করুণ মুখে খেলে গেছে।

পুকুরের ঘাটের নির্জনতা আর ভঙ্গ হবে না তারপর। ওপারের মাছরাঙাটা আপনাকে লজ্জা দেবার নিষ্ফল চেষ্টা ত্যাগ করে অনেক আগেই উড়ে গেছে। মাছেরা আপনার শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞা নিয়েই বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে না। খানিক আগের ঘটনাটা আপনার কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হবে। এই জনহীন ঘুমের দেশে সত্যি ওরকম মেয়ে কোথাও আছে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।

এক সময়ে হতাশ হয়ে আপনাকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তে হবে। ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবেন আপনার মৎস্য-শিকার-নৈপুণ্যের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে কেমন ক'রে আপনার বন্ধুদের কর্ণগোচর হয়েছে। তাদের পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে এ-কাহিনী কোথায় তারা শুনল, জিজ্ঞাসা ক'রে হয়তো আপনার পান-রসিক বন্ধুর কাছে শুনবেন—"কে আবার বলবে! এইমাত্র যামিনী নিজের চোখে দেখে এল যে।"

আপনাকে কৌতূহলী হ'য়ে যামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হবে। তখন হয়তো জানতে পারবেন যে, পুকুর ঘাটের সেই অবাস্তব করুণনয়না মেয়েটি আপনার পান-রসিক বন্ধুটিরই জ্ঞাতিস্থানীয়া। সেই সঙ্গে আরো শুনবেন যে, দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থাটা সেদিনকার মতো তাদের ওখানেই হয়েছে।

যে ভগ্নস্তূপে গতরাত্রে ক্ষণিকের জন্য একটি ছায়ামূর্তি আপনার বিস্ময় উৎপাদন করেছিল, দিনের রূঢ় আলোয় তার শ্রীহীন জীর্ণতা আপনাকে অত্যন্ত পীড়িত করবে। রাত্রির মায়াবরণ স'রে গিয়ে তার নগ্ন ধ্বংসমূর্তি এত কুৎসিত হ'য়ে উঠতে পারে আপনি ভাবতে পারেন নি।

এইটিই যামিনীদের বাড়ি জেনে আপনি অবাক হবেন। এই বাড়িরই একটি ঘরে আপনাদের হয়তো আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। আয়োজন যৎসামান্য হয়তো যামিনী নিজেই পরিবেশন করছে। মেয়েটির অনাবশ্যক লজ্জা বা আড়ষ্টতা যে নেই আপনি

আগেই লক্ষ্য করেছেন, শুধু কাছে থেকে তার মুখের করুণ গাম্ভীর্য আরো বেশি ক'রে আপনার চোখে পড়বে। এই পরিত্যক্ত বিস্মৃত জনহীন লোকালয়ের সমস্ত মৌন বেদনা যেন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সব-কিছু দেখেও তার দৃষ্টি যেন গভীর এক ক্লান্তির অলসতায় নিমগ্ন! একদিন যেন সে এই ধ্বংস-স্তূপেই ধীরে ধীরে বিলীন হ'য়ে যাবে।

আপনাদের পরিবেশন করতে করতে দু-চারবার তাকে তবু চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠতে আপনি দেখবেন। ওপরতলার কোনো ঘর থেকে ক্ষীণ একটা কণ্ঠ যেন কাকে ডাকছে। যামিনী ব্যস্ত হ'য়ে বাইরে চ'লে যাবে। প্রত্যেকবার ফিরে আসবার সঙ্গে তার মুখে বেদনার ছায়া যেন আরো গভীর হ'য়ে উঠেছে মনে হবে—সেই সঙ্গে কেমন একটা অসহায় অস্থিরতা তার চোখে। খাওয়া শেষ করে আপনারা তখন একটু বিশ্রাম করতে পারেন। অত্যন্ত দ্বিধাভরে কয়েকবার ইতস্তত ক'রে সে যেন শেষে মরিয়া হয়ে দরজা থেকে ডাকবে, "একটু শুনে যাও মণিদা।"

মণিদা আপনার সেই পানরসিক বন্ধু। তিনি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর যে-আলাপটুকু হবে তা এমন নিম্নস্বরে নয় যে, আপনারা শুনতে পাবেন না।

শুনবেন, যামিনী অত্যন্ত কাতরস্বরে বিপন্নভাবে বলছে, "মা তো কিছুতেই শুনছেন না। তোমাদের আসার খবর পাওয়া অবধি কি যে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন কি বলব।"

মণি একটু বিরক্ত স্বরে বলবে, "ওঃ, সেই খেয়াল এখনো! নিরঞ্জন এসেছে ভাবছেন বুঝি?"

হ্যাঁ, কেবলই বলছেন—"সে নিশ্চয় এসেছে। শুধু লজ্জায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না, আমি জানি। তাকে ডেকে দে। কেন তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস।" কি যে আমি করব ভেবে পাচ্ছি না। অন্ধ হ'য়ে যাবার পর থেকে আজকাল এত অধৈর্য বেড়েছে যে, কোনো কথা বুঝোলে বোঝেন না, রেগে মাথা খুঁড়ে এমন কাণ্ড করেন যে তখন ওঁর প্রাণ বাঁচানো দায় হ'য়ে ওঠে।"

"হুঁ, এতো বড়ো মুস্কিল দেখছি। চোখ থাকলেও না হয় দেখিয়ে দিতাম যে যারা এসেছে তাদের কেউ নিরঞ্জন নয়।"

ওপর থেকে দুর্বল অথচ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠের ডাকটা এবার আপনারাও শুনতে পাবেন। যামিনী এবার কাতর কণ্ঠে অনুনয় করবে, "তুমি একটিবার চলো মণিদা, যদি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারো।"

"আচ্ছা তুই যা, আমি আসছি।"—মণি এবার ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলবে, "এ এক আচ্ছা জ্বালা হয়েছে যা হোক। বুড়ির হাত পা প'ড়ে গেছে, চোখ নেই, তবু বুড়ি পণ ক'রে ব'সে আছে কিছুতেই মরবে না।"

ব্যাপারটা কি এবার হয়তো জানতে চাইবেন। মণি বিরক্তির স্বরে বলবে, ব্যাপার আর কি! নিরঞ্জন ব'লে ওঁর দূর সম্পর্কের এক বোনপোর সঙ্গে ছেলেবেলায় যামিনীর সম্বন্ধ উনি ঠিক করেছিলেন। বছর চারেক আগেও সে-ছোকরা এসে ওঁকে ব'লে গেছ্‌ল বিদেশের চাকরি থেকে ফিরে এসে ওঁর মেয়েকে সে বিয়ে করবে। সেই থেকে বুড়ি এই অজগর পুরীর ভেতর ব'সে সেই আশায় দিন গুণছে।

আপনি নিজে থেকে এবার জিজ্ঞাসা না ক'রে পারবেন না, "নিরঞ্জন কি এখনো বিদেশ থেকে ফেরেনি?"

"আরে সে বিদেশ গেছ্‌ল কবে, যে ফিরবে! নেহাৎ বুড়ি নাছোড়বান্দা ব'লে তাঁকে এই ধাপ্পা দিয়ে গেছ্‌ল। এমন ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে উদ্ধার করতে তার দায় পড়েছে। সে কবে বিয়ে থা' করে দিব্যি সংসার করছে। কিন্তু সে-কথা ওঁকে বলে কে? বললে বিশ্বাসই করবেন না, আর বিশ্বাস যদি করেন তা হ'লে এখুনি তো দম ছুটে অক্কা! কে মিছিমিছি পাতকের ভাগী হবে?"

"যামিনী নিরঞ্জনের কথা জানে?"

"তা আর জানে না! কিন্তু মার কাছে বলবার উপায় তো নেই। যাই, কর্মভোগ সেরে আসি।"—বলে মণি সিঁড়ির দিকে পা বাড়াবে।

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনাকে হয়তো উঠে দাঁড়াতে হবে। হঠাৎ হয়তো ব'লে ফেলবেন, "চলো, আমিও যাব।"

"তুমি যাবে!" মণি ফিরে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে নিশ্চয় আপনার দিকে তাকাবে।

"হ্যাঁ, কোনো আপত্তি আছে গেলে?"

"না, আপত্তি কিসের?"—বলে বেশ বিমূঢ়ভাবেই মণি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

সংকীর্ণ অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে যে-ঘরটিতে আপনি পৌঁছবেন, মনে হবে, ওপরে নয়, মাটির তলার সুড়ঙ্গেই বুঝি তার স্থান। একটিমাত্র জানলা, তাও বন্ধ, বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমে আপনার চোখে সবই ঝাপসা ঠেকবে, তারপর টের পাবেন, প্রায় ঘরজোড়া একটি ভাঙা তক্তাপোষে ছিন্ন কন্থাজড়িত একটি শীর্ণ কঙ্কালসার মূর্তি শুয়ে আছে। তক্তাপোষের একপাশে যামিনী পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

আপনাদের পদশব্দ শুনে সেই কঙ্কালের মধ্যেও যেন চাঞ্চল্য দেখা দেবে : "কে, নিরঞ্জন এলি? অভাগী মাসিকে এতদিনে মনে পড়ল, বাবা তুই আসবি ব'লে প্রাণটা যে আমার কণ্ঠায় এসে আটকে আছে। কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে পারছিলাম না। এবার তো আর অমন করে পালাবি না?"

মণি কি যেন বলতে যাবে, তাকে বাধা দিয়ে আপনি অকস্মাৎ বলবেন, "না মাসিমা, আর পালাব না।"

মুখ না তুলেও মণির বিমূঢ়তা ও আর একটি স্থানুর মতো মেয়ের মুখে স্তম্ভিত বিস্ময় আপনি যেন অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু কোনোদিকে তাকাবার অবসর আপনার থাকবে না। দৃষ্টিহীন দুটি চোখের কোটরের দিকে আপনি তখন নিস্পন্দ হ'য়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছেন। মনে হবে সেই শূন্য কোটরের ভেতর থেকে অন্ধকারের দুটি কালো শিখা বেরিয়ে এসে যেন আপনার সর্বাঙ্গ লেহন করে পরীক্ষা করছে। ক'টি স্তব্ধ মুহূর্ত ধীরে ধীরে সময়ের সাগরে শিশির বিন্দুর মতো ঝ'রে পড়ছে আপনি অনুভব করবেন। তারপর শুনতে পাবেন, "আমি জানতাম তুই না এসে পারবি না বাবা। তাই তো এমন ক'রে এই প্রেতপুরী পাহারা দিয়ে দিন গুণছি।"

বৃদ্ধা এতগুলি কথা ব'লে হাঁফাবেন ; চকিতে একবার যামিনীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আপনার মনে হবে বাইরের কঠিন মুখোশের অন্তরালে তার মধ্যেও কোথাও যেন কি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে—ভাগ্য ও জীবনের বিরুদ্ধে, গভীর হতাশার উপাদানে তৈরী এক সুদৃঢ় শপথের ভিত্তি আলগা হ'য়ে যেতে আর বুঝি দেরি নেই।

বৃদ্ধা আবার বলবেন, "যামিনীকে নিয়ে তুই সুখী হবি, বাবা। আমার পেটে হয়েছে ব'লে বলছি না, এমন মেয়ে হয় না। শোকে-তাপে বুড়ো হ'য়ে মাথার ঠিক নেই, রাতদিন খিট খিট ক'রে মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিই—তা কি আমি জানি না। তবু মুখে ওর রা নেই। এই শ্মশানের দেশ—দশটা বাড়ি খুঁজলে একটা পুরুষ মেলে না। আমার মতো ঘাটের মড়ারা শুধু ভাঙা ইঁট আঁকড়ে এখানে সেখানে ধুকছে, এরই মধ্যে একাধারে মেয়ে পুরুষ হ'য়ে ও কি না করছে।"

একান্ত ইচ্ছে সত্ত্বেও চোখ তুলে একটিবার তাকাতে আপনার সাহস হবে না। আপনার নিজের চোখের জল বুঝি আর গোপন রাখা যাবে না।

বৃদ্ধা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলবেন, "যামিনীকে তুই নিবি তো বাবা! তোর শেষ কথা না পেলে আমি ম'রেও শান্তি পাব না।"

ধরা গলায় আপনি তখন শুধু বলতে পারবেন, "আমি তোমায় কথা দিচ্ছি মাসিমা। আমার কথার নড়চড় হবে না।"

তারপর বিকালে আবার গোরুর গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়াবে। আপনারা তিনজনে একে একে তাতে উঠবেন। যাবার মুহূর্তে গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে সেই করুণ দুটি চোখ খুলে যামিনী শুধু বলবে—"আপনার ছিপটিপ যে পড়ে রইল।"

আপনি হেসে বলবেন, "থাক না। এবারে পারিনি ব'লে তেলেনাপোতার মাছ কি বারবার ফাঁকি দিতে পারবে।"

যামিনী মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ঠোঁট থেকে নয়, মনে হবে, তার চোখের ভেতর থেকে মধুর একটি সকৃতজ্ঞ হাসি শরতের শুভ্র মেঘের মতো আপনার হৃদয়ের দিগন্ত স্নিগ্ধ ক'রে ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি চলবে। কবে একশো না দেড়শো বছর আগে, প্রথম ম্যালেরিয়ার মড়কের এক দুর্বার বন্যা তেলেনাপোতাকে চলমান জীবন্ত জগতের এই বিস্মৃতিবিলীন প্রান্তে ভাসিয়ে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল—আপনার বন্ধুরা হয়তো সেই আলোচনা করবেন। সেসব কথা ভালো ক'রে আপনার কানে যাবে না। গাড়ির সংকীর্ণতা আর আপনাকে পীড়িত করবে না। আপনি শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনে একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, শুনবেন—"ফিরে আসব, ফিরে আসব।"

মহানগরের জনাকীর্ণ আলোকোজ্জ্বল রাজপথে যখন এসে পৌঁছবেন তখনও আপনার মনে তেলেনাপোতার স্মৃতি সুদূর অথচ অতি অন্তরঙ্গ একটি তারার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। ছোটোখাটো বাধা-বিড়ম্বিত ক'টি দিন কেটে যাবে। মনের আকাশে একটু ক'রে কুয়াশা জমছে কিনা আপনি টের পাবেন না। তারপর যেদিন সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে তেলেনাপোতায় ফিরে যাবার জন্যে আপনি প্রস্তুত হবেন সেদিন হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় ও কম্প দেওয়া শীতে, লেপ-তোশক মুড়ি দিয়ে আপনাকে শুতে হবে। থার্মোমিটারের পারা জানাবে এক শত পাঁচ ডিগ্রি, ডাক্তার এসে বলবে, ম্যালেরিয়াটি কোথা থেকে বাগালেন?" আপনি শুনতে শুনতে জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাবেন।

বহুদিন বাদে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে যখন বাইরের আলো-হাওয়ায় কম্পিত পদে এসে বসবেন, তখন দেখবেন নিজের অজ্ঞাতসারে দেহ ও মনের অনেক ধোয়া-মোছা ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে। অস্ত-যাওয়া তারার মতো তেলেনাপোতার স্মৃতি আপনার কাছে ঝাপসা একটা স্বপ্ন ব'লে মনে হবে। মনে হবে তেলেনাপোতা ব'লে কোথাও কিছু সত্যি নেই। গম্ভীর কঠিন যার মুখ আর দৃষ্টি যার সুদূর ও করুণ, ধ্বংসপুরীর ছায়ার মতো সেই মেয়েটি হয়তো আপনার কোনো দুর্বল মুহূর্তের অবাস্তব কুয়াশাময় কল্পনা মাত্র।

একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতলায় নিমগ্ন হ'য়ে যাবে।

অঙ্গার

প্রবোধকুমার সান্যাল

বছর আষ্টেক হোলো দিল্লীতে আমি চাকরি করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক আধবার আসি ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নৈলে, ইদানীং আর আসা হয়ে ওঠে না!

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল—ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হ'তে চললো আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছুদিন শ্বশুর বাড়ীতে ছিলুম, কিন্তু সেখানেও আর থাকা চললো না। তোমার ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতন দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন ক'রে হোক মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথাও থাকবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। নুটু পাস ক'রে চাকরি খুঁজছে, এখনো কোথাও কিছু সুবিধে হয় নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কোম্পানীর কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া ক'রে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহ'লে অনেকটা সাহায্য হতে পারে! ইতি—

দিল্লীতে আমার এই চাকরির খোঁজ প্রথম পিসেমশায় আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়ের প্রতি আমার সেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই আমি পঁচিশটা টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুম, তোর ছেলে যতদিন না উপার্জনক্ষম হয়, ততদিন প্রতি মাসে আমি তোর নামে পনেরো টাকা পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, নুটু, হারু—সকলের সঙ্গেই আমার চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পুজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতুম। তিন বছর এই ভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের হাল কি-প্রকার দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কি ভাবে তাঁদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ খবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহু

লোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিসপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে—ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিত প্রাপ্তিস্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এক রকম ক'রে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার দিনকয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তা'রা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মণি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। ভাবলুম টাকার দরকার হ'লে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত, আর তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হোলো এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম, এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি—দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশুনা করে ফিরবো। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়েছিল, তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে কতকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ কি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙ্গালীপ্রধান ও আর একদিকে চলছে যুদ্ধ-সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তা'রা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলেছে, দুর্ভিক্ষ ; গভর্ণমেন্ট বলছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক ধরে আমার কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনো দিকে মন দিতে পারি নি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেজ ছেলে টুনুর সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁ-হাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিরে টুনু?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্তকণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোড়দা?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে?

খবর?—ব'লে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মৃতপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আর কি? কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, একি তোর চেহারা হয়েছে রে? পঁচিশ বছর বয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুনু বললে, বাংলাদেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা—

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি বুঝি?

টুনু বললে, না, অফিস থেকে পাই কন্‌ট্রোলের দামে। চারজন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশী পাইনে। এই ত' যাবো, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো, দেখতেই ত পাচ্ছি। বেশ আছো।—আচ্ছা, চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস? তারা কি ফরিদপুরে নেই?

না—ব'লে একটু থেমে টুনু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়োনা ছোড়দা!

কেন রে? তারা থাকে কোথায়?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এফ্ নম্বরে। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কি একবার। আসি তা হ'লে—এই বলে টুনু আবার চললো নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

টুনুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে যেরকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহ'লে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো, নটু হয়ত ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ ; চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চিরনির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশী মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধে সরবরাহের কন্‌ট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়াখেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত নটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে কী না সম্ভব?

ওদের খবর নেবো কি নেবো না। এই তোলাপাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ অফিসের সাহেব জানালেন, আগামীকাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টিকছিল না। আমার হোটেলের নীচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙ্গালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই কটা দিন কোনোমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁত খুঁত করছিল। বিশেষ করে যাবার আগের দিনটি ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে বার করতে আমার বিলম্ব হোলো না। মনে করেছিলুম তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়ীটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা এদিকে মনিহারি দোকান, ভিতরে ভূষিমালের আড়ৎ। নীচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নীচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোণদড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য ক'রে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে বিলম্ব হোলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম। না, ভুল আমার হয়নি—টুনুর দেওয়া এই নম্বরই ঠিক।

এদিক ওদিক দুচারজনকে ধ'রে জিজ্ঞেস পড়া করতে গিয়ে যখন একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময় বছর বারো তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপর তলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানারঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মিনু?

মিনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস আমাকে?

না।

তোর মা কোথায়?

ভেতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল দেখি? এ যে একেবারে গোলকধাঁধাঁ! আয় নেমে আয়।

মিনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি?

পোড়ারমুখি। ব'লে তা'র হাত ধরলুম :—চল্ ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বল্‌ব, আমি কে? মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলেছিস?

আমাকে দেখে উপরতলাকার লোকগুলি একটু স'রে দাঁড়ালো। বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তার ভালো লাগেনি। তার দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মিনু তখন বললে, ওই যে, চৌবাচ্চার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চ'লে যান, ওদিকে সবাই আছে।

এই ব'লে সে উপরে উঠে গেল। চোখে মুখে তার কেমন যেন বন্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মিনু—পরণে একখানা পাৎলা সস্তা ডুরে, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা—কিন্তু এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে তার সর্বাঙ্গে। তার অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিস্ময় চমক দেবার উৎসাহ আর আমার ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা?

কে?—ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। বললে, কা'কে চান্?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রং কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ, পরণে নীল কাঁচের চুড়ি। এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশী। বললুম, তুমি কে?—এই ব'লে অগ্রসর হলুম।

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হারু। হাসিমুখে বললুম, কি, হারু, চিনতে পারিস? তোর মা কোথায়?

সে আমাকে চিনলো কি না জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে?

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায়?

দিদি এখুনি আসবে, বাইরে গেছে। আসুন না আপনি? বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ির বাসিপাট এখনো শেষ হয় নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এর আগে এমন করে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো,—এপাশে নর্দমা, ওপাশ কুৎসিত কলতলা। এক ধারে ঝাটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোর ভিড়! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন ক'রে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন! এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এলো।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটাওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, একি, নলিনাক্ষ যে? কবে এলে?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দু ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান আহ্নিক পূজা গঙ্গাস্নান, দান ধ্যান—এই সব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি। কিন্তু তিন বছরে তাঁর একি পরিবর্তন? আমিষ রান্নাঘরে ব'সে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি?

বললুম, পিসিমা, প্রণাম করবো। পা ছুঁতে দেবেন?

পা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কলকাতায় আমরা কমাস এসেছি, তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কার খবর রাখে বলো। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে!

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা—আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম—কিন্তু আজ ছ'মাস হতে চললো আপনাদের কোনো খোঁজ খবর নেই।

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি, নলিনাক্ষ!

পিসিমার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন ঔদাসীন্য আর অবহেলায় ভরা। একদিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুশী হননি, এ তাঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাঁগা, দিদি—? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীলোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়ালো। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনরায় বললে, তুমি বাজারে যাবে, গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাটকা-তপসে মাছ এসেছে—একেবারে ধড়পড় করছে!

তার লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে স'রে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে, নলিনাক্ষ?

বিশেষ কিছু না!—ব'লে আমি হাসলুম—আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকবো ব'লেই আমি এসেছিলুম, পিসিমা।

তা বেশ ত', বেশ ত'—তবে কি জানো বাবা, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট কিনা— বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁ'র দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললুম, শোভনা কোথায়, পিসিমা?

সে আসছে এখুনি, বোধ হয় ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয়?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই? তবে তেলটা, নুনটা, মধ্যে মাঝে দোকান থেকে আনে বৈকি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথার দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কিন্তু কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বললুম, শোভনার ছেলেটি কোথায়? কত বড়টি হয়েছে?

পিসিমা বললেন, তা'র খুড়ো-জ্যাঠা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না, নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তা'রা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে? শোভনা পারবে থাকতে?

তা পারবে না কেন বলো? এক টাকায় দুসের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কতদিন? অসুখ হ'লে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বারো চোদ্দ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ্য করবো, নলিনাক্ষ? ভিক্ষে কি করি নি? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি। —বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই, কেউ আমাদের চাল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ!

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললুম, পিসিমা, টুনুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কারো খবর নিতে পারে না। টুনুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসেছিলেন, অতটা লক্ষ্য করি নি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মিনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, মা, মা শুনছ? এই নাও একটা আধুলি ... হরিশবাবু দিল—

মিনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে বললে, যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরো— বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মিনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে স'রে গিয়ে সে অনুযোগ ক'রে কেবল বললে, তুমিই ত' বলেছিলে!

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলচিস্, মিনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ, বাবা। এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলুম। গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারম্বার ঠেলে উঠছিল, যেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। আমি এই পরিবারে মানুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একটা লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন ব'লে জেনে এসেছি—এরা তারা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!

মনে ছিল না জানালাটা খোলা। বৌবাজারের পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। সেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বালতি ঘিরে ব'সে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে প'ড়ে রয়েছে।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হারু আর মিনুর কান্না—পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছে হোলো, তাদের কোনো অপরাধ নেই—নিরপরাধকে অপরাধী ক'রে তোলার জন্য দিকে দিকে যেসব ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, ওরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই বাইরে শোনা গেল, কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তাকে ডাকতেই সে যেন সহসা আঁৎকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন ক'রে?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান ক'রে। কেমন আছিস তোরা শুনি।

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো! জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত?

শোভনা চুপ ক'রে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম—এইসব গল্প করার জন্যেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এদিকে ওদিকে চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না?

সবিস্ময়ে বললুম, ভাড়া লাগে না? এমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বললে, যাঁর বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ!

শোভনা বললে তাঁর কেউ নেই একলা থাকেন কিনা তাই—

বোধ হয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরু পাড় ধুতি প'রে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোর ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস্!

ঠিকানা ইচ্ছে করে দিইনি ছোড়দা!

কিন্তু মাসোহারার টাকা নেওয়া বন্ধ করলি কেন রে?

একটু থতিয়ে শোভনা বললে, ছেলের জন্যেই নিতুম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমার নয়, তাই নেওয়া বন্ধ করেছি!

প্রশ্ন করলুম, তোদের চলছে কেমন ক'রে?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চ'লে যাবে—তুমি সেকথা শুনতে চাও কেন ছোড়দা?

চুপ ক'রে গেলুম। একথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বললুম, নুটু কোথায়?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবার নেশা করতে শিখেছে, সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, নুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে? হারুর পড়াশুনাও ত' বন্ধ। ও কি করে এখন?

শোভনা নত মুখে বললে, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সেদিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন ব'সেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়ালো শোভনার ওপর। কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুরিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি, শোভা। মিনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়িটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস ত।

বাইরে জুতোর মসমস শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙ্গা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল। মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ—লোকটির বয়স বেশী নয়। চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বললে, কই বিনোদ কোথা গেল? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙ্গা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই। নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে, দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলের ঘটি, দাও। এ-দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না,—কোথাও কিছু পায় না। আরে পাবে কোত্থেকে—গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই দু'খানা কচুরি চিবিয়ে প'ড়ে থাকি। —বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চ'লে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে শোভনা বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে?

না। ওর সবাই ছিল, যখন উপার্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তার জন্যে আত্মহত্যা করেন। ছেলেটি আছে মামার বাড়ি। ছোড়দা, বলতে পারো আর কত দিন এমনি ক'রে বাঁচতে হবে? এ যুদ্ধ কি কোন দিন থামবে না?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখানা শির ওঠা, রক্তহীন ও স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোট বোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক লকে হয়ে উঠেছে, আমার কোনো সান্ত্বনা, কোন উপদেশ শোনবার জন্যে সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টিকে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে—

মান-সম্ভ্রম?—শোভনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কোথায় মান-সম্ভ্রম, ছোড়দা? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক্ হয়ে গেলুম! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড়? কোন্ মিথ্যেবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল করে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা বোনের উপবাসী মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বা'র করে, সেদিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে, তাদেরই কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্র সমাজে কোথাও বাড়লো? যাও খোঁজ নাও ছোড়দা, ঘরে-ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়ীতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জ্বলে-পুড়ে গেল দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা-পিসিমা-খুড়িমা-বোন-বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ? মান-সম্ভ্রম! মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু কনট্রোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে—তোমরা তার কোনো সুবিধে পাও না?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তার গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা হা হা ক'রে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিসিমার কাছে মার খেয়ে মিনু ও হারু এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বললে, কেন কাঁদছিস কেন, শুনি? দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও-বাড়ির হরিশবাবুর কাছ থেকে মিনু পয়সা এনেছিল কিনা—হারু কি যেন ব'লে ফেলেছিল তাই—

শোভনার মাথায় বোধহয় আগুন ধ'রে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, মা? কেন তুমি ওদের মারলে শুনি?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না? কলঙ্কের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেরে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে?

পিসিমা চিৎকার ক'রে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কিসের লা? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ? পেটের ছেলেমেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই করবো—তুই বলবার কে?

শোভনা গর্জন ক'রে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটে অন্ন যোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার? মেরে মেরে মিনুটার গায়ে দাগ করলে—তোমার কী আক্কেল? একেই ত' ওর ওই চেহারা এরপর ঘর-খরচ চলবে কোত্থেকে? লজ্জা নেই তোমার?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই ব'লে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ করে ছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়ীতে বসে বিনোদবালার ঠিকানা কে যোগাড় ক'রেছিল? গাড়িভাড়া কা'র কাছে নিয়েছিলি তুই?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, তাহলে আমিও বলি? মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায়? হরিশ-যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মিনুকে? আমাকে কেরাণীবাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল? উত্তর দাও? জবাব দাও?

হোটেলের পাঁউরুটি আর হাড়ের টুকরো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে? নুটু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে?

মুখ সামলে কথা বলিস, শোভা।

এমন সময়ে বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ঝগড়া মিটাবার জন্যে। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বললুম, পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর, ভাই। এরকম অবস্থার জন্যে কা'র দোষ দিবি বল্? তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মিনুর,—এমন কি ওই বিনোদবালা, মাস্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোনো দোষ নেই! কিন্তু অপরাধ যাদের, তারা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা! যাক্‌গে, আমি এখন যাই, আবার একসময়ে আসবো।

শোভনা কেঁদে বললে, আর তুমি এসো না ছোড়দা!

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বললুম, পাগল কোথাকার!

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোলো না বাবা, নলিনাক্ষ। কিছু মনে ক'রো না।

বিনোদবালা বললে, চলো, ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে-খেয়ে তৈরী হও দিকি? গলাবাজি করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর, তাহলে এমন ঝকমারি কাজে হাত দিতুম না!

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গলোকের কদর্য কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের ওপর দিগন্ত-জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্তদারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে ব'সে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর শাকসব্জী দিয়ে ঘেরা ঘরকন্নার মধ্যে আচারশীলা মাতৃরূপিণী পিসিমা, লাজুক একটা সদ্য-ফোটা ফুলের মতন কুমারী ভগ্নী শোভনা, চাঁপার কলির মতন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হারু, নুটু, মিনু—এরা কি সেই তারা? কেন একটি সুখী পরিবার ধীরে ধীরে এমন সমাজ-নীতিভ্রষ্ট হোলো? কেন তাদের মৃত্যুর আগে তাদের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটালো এমন ক'রে? কোন্ দয়াহীন দস্যুতা এর জন্যে দায়ী?

এই কয়মাসের মাসোহারার টাকাটা আমি অনায়াসে খরচ করতে পারি বৈ-কি। অন্তত দিল্লী যাবার আগে ওদের এই অবস্থায় রেখে চুপ ক'রে চলে যেতে পারি নে। সুতরাং অপরাহ্নকালটা নানা দোকানে ঘুরে ঘুরে কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা গেল। শতকরা দশগুণ বেশী দামে চাল এবং পাঁচগুণ বেশী দামে আর সব খাবার জিনিসপত্র এখান ওখান থেকে কিনতে লগলুম। কিনতে কিনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেটা মাত্র এই বিগত শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ, টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। স্বল্পালোক কলকাতার পথঘাট পেরিয়ে একখানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে চললুম আবার শোভনাদের ওখানে। নিজের বদান্যতার কোনো গৌরব বোধ করছিনে, বরং সমস্ত খাদ্যসামগ্রীগুলোকে ঘৃণ্য মনে হচ্ছে। খাদ্য আজ জীবনের সকল প্রশ্নকে ছাপিয়ে উঠেছে বলেই হয়ত খাদ্যের প্রতি এত ঘৃণা এসেছে। এসব পদার্থ আগে ছিল ভদ্রজীবনের নীচের তলাকার লুকানো আশ্রয়ে, সেটার কোনো আভিজাত্য ছিল না—আজ সেটা যেন মাথার ওপর চ'ড়ে বসে আপন জাতিচ্যুতির আক্রোশটা সকলের উপর মিটিয়ে নিচ্ছে!

তবু দুর্গম পথঘাট পেরিয়ে সেগুলো নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম বৌবাজারের বাড়ির দরজায়। বহু পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ব্যয় ক'রে দু-তিনজন লোকের সাহায্যে সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাখলুম সেই সরু আনাগোনার পথের একধারে। মাস তিনেকের মত খাদ্যসম্ভার কিনে এনেছিলুম। জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলুম।

ভিতর দিকে কোথায় যেন একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল, তারই একটা আভা এসে পড়েছিল আমার গায়ে। কলতলার ওপাশ থেকে শোনা গেল, নারী-কণ্ঠের সঙ্গে ইস্কুল-মাস্টারের কথালাপের আওয়াজ জড়ানো। তা ছাড়া নীচের তলাটা নিঃসাড়—মৃত্যুপুরীর মতো।

আমি কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গেলুম। ডাকলুম, মিনু? হারু?

কোনো সাড়া নেই। যে ঘরখানায় দুপুরবেলায় আমি বসেছিলুম, সে ঘরখানা ভিতর থেকে বন্ধ। বুঝতে পারা গেল, ক্লান্ত হয়ে পিসিমারা সবাই ঘুমিয়েছে। আমি আবার ডাকলুম, মিনু, ও মিনু?

বোধ করি বাইরের থেকে আমার গলার আওয়াজটা ঠিক বোধগম্য হয়নি, ঘরের ভিতর থেকে শোভনা সাড়া দিয়ে বললে, দিনরাত এত আনাগোনা কেন গা তোমার? মিনু ও-বাড়ীতে গেছে, আজ তাকে পাবে না, যাও। হতভাগা, চামার!

আমি বললুম, শোভা, আমি রে, আর কেউ নয়, আমি—ছোড়দা। দরজাটা খোল দেখি?

ছোড়দা?—শোভনা তৎক্ষণাৎ দরজাটা খুলে দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে ব'সে পড়লো। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললে, ছোড়দা, পেটের জ্বালায় আমরা নরককুণ্ডে নেমে এসেছি! তুমি আমাকে মাপ করো, তোমার গলা আমি চিনতে পারিনি।

শোভনার হাত ধ'রে আমি তুললুম। বললাম, কাঁদিসনে, চুপ কর। তোরা ত' একা নয় ভাই, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমনি করে মরতে বসেছে। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না, এমনি করেই এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে হবে, শোভা। শোন, কালকেই আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম—ওগুলো তুলে রাখ।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠলো। যেন ভাবী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, তুমি বাঁচালে, ছোড়দা! তোমার দেনা আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না! —এই ব'লে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা কাপড়ের একটা পুঁটলী রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্যসামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকীর নীচে রেখে এলো। বললে, ছোড়দা মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না! মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে!

শোভনা করুণকণ্ঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না।

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ করে রইলুম। কারণ সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায় বললে, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা? ভাবো ত, সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা ঢেউ খেলছে, আনন্দে মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান,—সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তারা ঘরে তুলে আনছে! মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি।

কিন্তু একি শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো। সভয় চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদের ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমাদের ঘর কাঙালীর কান্নায়? বলতে পারো তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো। তারপর কম্পিত অধীর কণ্ঠে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা—আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও ছোড়দা!

এগুলো তুলে রাখ আগে সবাই মিলে?

রাখবো, ঠিক রাখবো—একটি চাল-ডালের দানা গুণে গুণে রাখবো—কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি ... তুমি যাও, একটুও দেরী করো না ... লক্ষ্মীটি ছোড়দা ...

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে গায়ের উপর এসে প'ড়ে বললে, ওঃ, নতুন লোক দেখছি। চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরণে একটা খাকি সার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললুম, কে তুমি?

আমি কারখানার ভূত, স্যার। —এই ব'লে হঠাৎ শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো, কথা আছে।

কথা কিছু নেই, ছাড়ো। ব'লে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে! —লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বললে, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে?

বাঃ—বেরিয়ে যাবো ব'লে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগলি!

চিৎকার ক'রে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগ্‌গির? চলে যাও—দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—

লোকটা বোধ হয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো?

শোভনা আর্তনাদ ক'রে উঠলো—ছোড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই? ... দাঁড়াও, আজ খুন করবো—বঁটিখানা...

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুলো—রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো, জানেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারি খেয়ালী। তবে কি জানেন স্যার, আমরা হচ্ছি, 'এসেন্‌সিয়াল সার্ভিসের' লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা-লক্কর নিয়ে কাজ করি—মেয়েমানুষের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে। এসব জানে ওই 'আই-ই' মার্কা লোকগুলো, ওরা নানারকম ভাঁড়ামি করতে পারে।

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে বেরিয়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এলো। লোকটি শান্তকণ্ঠে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ খেয়ালের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা—এই যাচ্ছি স'রে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধ'রে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললে, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের ঘরে রইলুম এ-রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাঝরাত্তিরে আমাকে নিশ্চয় ডেকে ঘরে নিয়ো, নৈলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলুম। —আচ্ছা, বেশ কাল না হয় আড়াই সের চালই দেওয়া যাবে। আয় বিনোদ, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে সেই কদাকার লোকটা ইস্কুল-মাষ্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

শোভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ থামবে, তুমি ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ হবে, আমাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?

আস্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃদ্‌পিণ্ড থেকে আবার রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ মানুষ থাকে, তাদের ব'লো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা আনিনি ; আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি...

শোভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু অন্ধকার, অনন্ত অন্ধকার। কেবল মনে হলো, অঙ্গারের আগুন যেমন পুড়ে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে আসে, তেমনি মহানগরের ক্ষুধাশ্রান্ত কাঙ্গালীরা চারিদিকে চোখ বুজে পথে-ঘাটে নালা-নর্দমায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনি কান পেতে শুনছে!

হারাণের নাতজামাই

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝ রাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল।

সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁক আর উলুধ্বনিতে আকস্মিক আবির্ভাব জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ শুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও হয়তো পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশী।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাট বেঁধে বসবার কোন চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে ঘিরে ফেলল ছোট হাঁসতলা পাড়াটুকুর ক'খানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আঁটঘাট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষীদের, জানা যাবেই, এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘসে গফুরালী বলে, 'দেইখা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠেছে। দেইখা লমু।'

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টকে কলা দেখিয়ে, কোনও গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে? তাদের গাঁয়ের কলঙ্ক তারা

সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষীরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা।

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ। হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপ্ দপ্ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশী বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়িটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'হারাণ দাসের কোন্ বাড়ি?'

তার পাশের বাড়ির হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মত রাখাল পাল্টা প্রশ্ন করে—'আজ্ঞা, কোন্ হারাণ দাসের কথা কন?'

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে, তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয়, একেবারে তুখোড় হয়ে উঠেছে চালাকীবাজিতে।

এদিকে হারাণ বলে, 'হায় ভগবান।'

ময়নার মা বলে, 'তুমি উঠলা কেন কও দিকি?'

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কি হয়েছে ভাল বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা ঢিমে মাথায় অত সহজে কোন কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব।

ভুবনকে বলে ময়নার মা, 'বুড়ো বাপটার তরে ভাবনা!'

ভুবন বলে, 'মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।' ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, 'হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাত্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।'

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে।

তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপসোসে ফুঁসে ওঠে, 'আঃ! ভাল শাড়িখান পরতে পারলি না?'

'বলছ নাকি?' ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙীন শাড়ীখানা বার করে। ময়নার পরণের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙীন শাড়িটি।

বলে, 'ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস।' ভুবনকে বলে, 'ভাল কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিপাড়া, থানা গৌরপুর।'

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কি রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালীভাব।

'গাঁ ভাইঙ্গা রুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কি, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই।'

ভুবন বলে, 'তবেই সারছে। দশবিশটা খুন জখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।'

'থামেন আপনে, বসেন,' ময়নার মা বলে 'দ্যাখেন কি হয়।'

শ' দেড়েক চাষী চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলবার আছে। তবু চাষীদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা রীতিমতো নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে, হাকিমের দস্তখতী পারোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তাল্লাস করতে। তাল্লাস করে আসামী না পায়, ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বে-আইনী কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, 'মোরা তাল্লাস করতি দিমু না।'

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, 'দিমু না!'

এমনি যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণ গলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, 'রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইরো না। মোর ঘরে কোন আসামী নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম? বিকালে জামাই আইছে, শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাস করতে চান, তাল্লাস করেন।'

মন্মথ বলে, 'ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।'

ময়নার মা বলে, 'দ্যাখেন আইসা, তাল্লাস করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রূপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা্যা তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপ্নারে কমু কি দারোগাবাবু, মাইয়াটা কাইন্দা মরে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা'—মন্মথ বলে, 'ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিও।'

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই, ময়নার মা?' গা জ্বলে যায় ময়নার মার। বলে, 'সদর দিয়া আইছে। তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই। চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে!'

গৌর আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙের একটি মাত্র আওয়াজের মতো।

ময়নার রঙীন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে চায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষী মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি. এ. পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোরাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে এককোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আপসোস হয় যে যোয়ান মর্দ মাঝবয়সী চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটার এই আলুথালু বেশ!

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়ের দুজন বুড়োকে এনে সনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারী সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মতো। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, 'এ তোমার নাতনীর বর'?

হারাণ বলে, 'হায় ভগবান!'

ময়নার মা বলে, 'জিগান মিছা, কানে শোনে না, বদ্ধ কালা।'

'অ!' মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

'এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মর মর, তখন যায় এখন যায়।'

'তুমি অমনি ছুটে এলে?'

'আসুম না? রতিভরি সোনারূপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু?'

'ওঃ! তাই ছুটে এসেছ? তুমি হিসেবী লোক বটে।' মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে। আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তাল্লাস ও তছনচ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দুপা পিছু হটে এখনো চাষীর দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তাল্লাস চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই, সে ঘরেও কাঁথাকালি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়ীতেই। অল্প নেশায় রঙীন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য—চোখ তার রঙীন শাড়ি জড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি বাইশ বছরের যোয়ান ভাইটা, উসখুস করে ক্রমাগত। ভুবনের চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না।

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, 'শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো না গিয়া বাছা? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে'—ময়নার মার গলা ধরে যায়, 'আপনারে কি কমু দারোগাবাবু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, 'গুরুজনের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও!

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই। মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপ্টা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ-দিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ায় জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড় থানার বড় দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়া পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোক বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে! এমন তামাসা কেউ কখনো করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা! সে যে এমন রসিকতাও জানে, কে তা ভাবতে পেরেছিল?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভরা এমন যে ভয়ঙ্কর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, 'মাগো মা ময়নার মা, তোর মদ্যি এত?'

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, 'কিলো ময়না, জামাই কি কইলো? দিছে কি?'

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটে খাটো যোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা সার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, 'জগমোহন নাকি? কখন আইলা?'

নন্দ বলে, আরে শোন, শোন, তামুক খাইয়া যাও।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, 'কি কাণ্ড বুঝলা নি?'

'কেমনে কমু?'

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওরি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা শুদ্ধ গরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, 'বাড়িতে নাই। তুমি কেডা, হারাম-জাদাটারে খোঁজ ক্যান?'

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

'অ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে?'

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনো ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে।

'শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখান।'

'নিজের হইলে বুঝতা।' জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে!

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্তসমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীরে শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল, জানা ছিল, এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, 'আস বাবা আস। ও ময়না, পিড়া দে। ভাল নি আছে বেবাকে? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া?'

'আছে।'

আরেকটুকু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটা ছাঁটা এই কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভাল ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদা ফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির পণ করেছে জগমোহন? লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, 'আসে নাই? হারামজাদা আসে নাই? হায় ভগবান!'

'নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, 'বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।'

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন দ্যাখে না, কি হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন কিন্তু কোন খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

'খাড়াইয়া রইলা ক্যান? বস বাবা বস।'

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

'মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।'

'না, যামু গিয়া অখনি।'

'অখনি যাইবা?'

'হা একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে?'

'শুইছিল?' ময়নার মার চমক লাগে, 'মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব?'

'ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।'

তারপর বেধে যায় শাশুড়ি-জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠাণ্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ! মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা। অন্যে তো কয় না।'

'অন্যের কি? অন্যের বৌ হইলে কইতো।'

'বড় ছোট মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা যুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।'

'কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে।' শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, 'আইছে নাকি? আইছে হারামজাদা? হায় ভগবান, আইছে?' ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বৌ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

'কি হইছে গো ময়নার মা?' নিতাই পালের বৌ শুধায়, 'মাইয়া কাঁদে ক্যান?'

তাদের দেখে সম্বিত ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে—'কাঁদে ক্যান? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব না?'

'জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া?'

'শুনবা বাছা শুনবা। বইতে দাও, জিরাইতে দাও।'

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারো নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কি?'

'বাপ নাকি?' জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

'বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।'

'বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।'

'রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কি কইব?'

'জামায়ের অভাব কি। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।'

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারি। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে, শুধু শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গট গট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনো বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু যোগাড় করতে হবে। খাক না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামায়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, 'ঘরে আস।'

'খাসা আছি। শুইছিলা তো?'

'না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।'

'ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী!'

ময়না তখন কাঁদে।

'তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।'

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, 'আসে নাই? ছোঁড়া আসে নাই? হায় ভগবান!'

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের, তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া যোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারি গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দুচোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামায়ের সাথে লড়াই নেই!

আপন মনে আবার হাঁকে হারাণ, 'আসে নাই? মোর মরণটা আসে নাই? হায় ভগবান!'

জগমোহন চুপ করে ছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর। —'উয়ারে ধরছে ক্যান?'

ময়নার কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, 'মণ্ডল খুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।'

'ক্যান ধরছে?'

'কাইল জব্দ হইছে, সে রাগে বুঝি।'

বসে বসে কি ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, 'মাথা খাও, মুখে দাও।'

আবার বলে, 'রাত কইরা ক্যান যাইবা বাবা? থাইকা যাও।'

'থাকনের যো নাই। মা দিব্যি দিছে।'

'তবে খাইয়া যাও? আখা ধরাই? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরাণডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।'

'না, রাইত বাড়ে।'

'আবার কবে আইবা?'

'দেখি।'

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যারাতেই পুলিশহানার সেইরকম সোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশী। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ি।

'কি গো মণ্ডলের শাশুড়ি,' মন্মথ বলে ময়নার মাকে, 'জামাই কোথা?'

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এটা আবার কে?'

'জামাই।' ময়নার মা বলে।

'বাঃ, তোর তো মাগী ভাগ্যি ভাল, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—'

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, 'মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন।'

বাড়ীর সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামী নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত আট-গুণ বেশী লোক পথ আটকায়। রাত বেশী হয়নি, শুধু এগাঁয়ের নয়, আশেপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারে নি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, 'ছোঁড়া গেল কই? কই গেল? হায় ভগবান!'

ছিন্নমস্তা

আশাপূর্ণা দেবী

গাছের মাথা হইতে রোদ নামিয়া উঠানের কোণে পড়িয়াছে... এইমাত্র স্কুল বাড়ীর ঘণ্টা পড়ার শব্দ শোনা গেল। দশটার গাড়ীতে বর-কনে আসিবার কথা। স্টেশন হইতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতে খুব জোর আরও আধ ঘণ্টাই হোক, তার বেশী তো নয়।

অতএব সময় আর নাই।

জয়াবতী তাড়া দিতেছিলেন ঃ 'আলপনা দেওয়া যে তোর আর এগোচ্ছে না মণ্টি? বৌ এসে কি কাঁচা পিটুলিতে পা দেবে? ... আলপনা শুকিয়ে ফুটফুটে করবে, তবে না 'বৌছত্তরে'র বাহার।'

মণ্টি কলিকাতায় মামার বাড়ী থাকিয়া স্কুলে পড়ে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে আলপনা আঁকিয়া নাকি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য তাহার সহপাঠিনী মল্লিকা ঘোষ নাকি সমস্ত ক্রেডিটটা মণ্টির চাঁপার কলির মতো আঙুলের ডগাগুলিকেই দেয়, কিন্তু সেটা একটা ধর্তব্যের কথা নয়।

কন্যাগুণগর্বিতা মণ্টি-জননী মণ্টিকে লইয়া জয়াবতীর বাড়ী আলপনা দেওয়াইতে আসিয়াছেন। একমাত্র ছেলে জয়াবতীর, বিবাহান্তে বৌ লইয়া বাড়ী আসিতেছে আজ।

কিন্তু স্কুলের বিদ্যাটা যেন খুব বেশী কাজে লাগিতেছে না আজ।

এত বড়ো উঠান দেখিয়াই হাঁপাইয়া উঠিয়াছে বেচারা।

স্কুল-বাড়ীর দোতলার হলের পালিশ করা মেঝেয় তুলি বুলানো এক, আর এই প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো উঠান ভরাট করিয়া লতা-পদ্ম আঁকা আর।

'চাঁপার কলি' ঘষিয়া ক্ষয় হইয়া 'চাঁপা-কলায়' পরিণত হইতে বসিয়াছে। তাহার উপর আবার জয়াবতীর তাড়া। মায়ের উপর রাগে হাড় জ্বলিয়া যাইতেছিল মণ্টির!

জয়াবতীর উপরও কম নয়, 'বলা খুব সহজ, নিজে করিয়া দেখুন না একবার' —এই গোছের মনোভাবটা লইয়া একই নক্সার পদ্ম সর্বত্রই আঁকিতে থাকে শেষ পর্যন্ত। আধুনিক অতি-আধুনিক যাবতীয় আলপনার নক্সা জানা ছিল তাঁর, কিছুই আর মনে পড়ে না।

এদিকে হাত নিসপিস করিতেছে জয়াবতীর।

মণ্টির মতো আঙুলের ডগায় চাঁপার কলির সাদৃশ্য না থাকিলেও শিল্পচাতুর্যের খ্যাতি জয়াবতীরও বড়ো কম ছিল না। আশেপাশের পাড়া হইতে আমন্ত্রণ আসিত তাঁহার পূজা-পার্বণে, বিবাহ-উৎসবে। সমারোহের বিবাহে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাইতে, ছানার হাঁস, ক্ষীরের মাছ, মাখনের পদ্ম, মুগের ডালের ময়ূর ইত্যাদির গঠন-নৈপুণ্যে কুটুম্ববাড়ীর লোককে তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিতেন জয়াবতী।

নূতন জামাইয়ের জল-খাবারের ফলের রেকাবিতেই কি কম কারুকার্য করিয়াছেন আজ পর্যন্ত?

তা' ছাড়া, আলপনা? পীঁড়ির আলপনা তো বটেই মেঝের আলপনাও। সত্যই প্রশংসা করিবার মত কাজ ছিল। কতো বাড়ীতে গোবর-মাটি-লেপা উঠানে এমন 'বৌ-ছত্র' আঁকিয়াছেন যে, দর্শকমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে, জয়াবতীর নিপুণ করস্পর্শে নির্জীব উঠানও যেন 'হাসিয়া উঠিয়াছে'।

আর এ-তো শানবাঁধানো উঠান—যে উঠান ছেলের ম্যাট্রিক পাশের বছর নূতন করিয়া বাঁধাইয়াছিলেন জয়াবতী, বৌ আসিয়া দাঁড়াইবার আসন্ন মধুর কল্পনায়।

কিন্তু ছেলেবেলা হইতে পরের বৌয়ের বৌ-ছত্র আঁকিয়া আঁকিয়া হাত পাকাইলেও নিজের ছেলের বৌ আসার সময় আর শুভ কাজে হাত বাড়াইবার অধিকার রহিল না, সে হাতে বিধাতা কোপ মারিয়া দিয়াছেন।

ছেলের কৈশোরকাল হইতেই ছেলের বিবাহ লইয়া স্বামীর সহিত কতো জল্পনাকল্পনা পরামর্শে, কতো সোহাগ কলহে রাত্রি কাটিয়াছে। একটিমাত্র সন্তানকে ঘিরিয়া দুইটি মানুষের আশার আর শেষ ছিল না। সব আশায় ছাই দিয়া দিব্যি কাটিয়া পড়িলেন দেবনাথ।

জয়াবতীর জন্য রহিল আনন্দহীন গুরুদায়িত্বের বোঝা।

ছেলের বিবাহ আজ আর রঙীন কল্পনা নহে, কঠিন কর্তব্য। ভালোয় ভালোয় কাজটা মিটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত আহার নিদ্রা নাই তাঁহার।

বৌ-বরণ করিবার জন্য জ্ঞাতি-জা কনকলতা একখানা খসখসে নূতন বেনারসী শাড়ী জড়াইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছিল। বিমলেন্দুর জলপানির টাকায় সাধ করিয়া এই শাড়ী কিনিয়া রাখিয়াছিলেন জয়াবতী বিমলেন্দুর বৌ বরণ করিতে।

সিন্দুক খুলিয়া সেই শাড়ী বাহির করিয়া দিয়াছেন কনকলতাকে।

কনকলতা কাপড়ের আঁচল সামাল করিতে করিতে দুধে-আলতার পাথরখানা আনিয়া বসাইয়া দিয়া তোষামোদের সুরে বলে ঃ 'একি আর তোমার হাত মেজদি, যে এক দণ্ডে হয়ে যাবে?'

জয়াবতী মণ্টির মার অপ্রতিভ মুখখানার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠেন ঃ 'ছোট বৌয়ের যেমন কথা। বুড়ো মাগীর সঙ্গে ওই ছেলেমানুষের তুলনা? এই যে অতোখানি করেছে এরই মধ্যে তাই ঢের। গাড়ীর সময় হয়ে গেলো তাই তাড়া দেওয়া।'

কনকলতা বাতাসের গতি আঁচ করিয়া কথার মোড় ঘুরায়—তা তো বটেই। তুলনা নয়,—এমনি বলছি। যেমন অদৃষ্ট, চিরদিন পাঁচজনের করে এসে এখন নিজের ঘরে চোর। আজ কোথায় তুমি নিজে এই চেলির শাড়ী পরে বৌ-ছেলে বরণ ক'রে—

—'থাক ছোট বৌ ওসব কথা। দেখো দিকিন, দুধ ওথলানোর কি হলো? বৌ দোরে পা দেওয়া মাত্র যেন উথলে ওঠে।'

সস্তার করুণরস আমদানি করিয়া অন্তর্নিহিত গভীর বেদনাকে খেলো করিবার প্রবৃত্তি নাই জয়াবতীর।

গোছগাছ করিতে করিতেই বরকনে আসিয়া পড়ে।

'কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণার'—কবিগুরুর লেখনী-নিঃসৃত এই প্রেমিকের উক্তিটি অনায়াসেই বাঙালী ঘরে শাশুড়ী-বৌ সম্বন্ধে খাটানো যায়। অধিকাংশ পুত্রবতী জননীরই কি জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ গড়িয়া ওঠে না পুত্রের বিবাহ-কল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া? সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত পুত্রের মাতার ধ্যানের মূর্তি কি একটি ডানাবিহীন পরীমূর্তি নয়?

কল্পনার তো রাশ টানিতে হয় না, তাই সেই ধ্যানের মূর্তিকে লইয়া লীলায়িত হইয়া ওঠে কতো স্বপ্ন, কতো সুষমা। নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয় আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে। পরের মেয়েকে কেমন করিয়া আপন করিতে হয়, দেখাইয়া দিবেন তিনি। করুণা হয় তাহাদের উপর যাহারা ছেলের বিবাহ দিয়া 'বৌ-কাঁটকী-শাশুড়ী' নাম কিনিয়াছে। কৃপা হয় তাহাদের উপর, যাহারা কালো-কোলো খাঁদা-বোঁচা বৌ ঘরে আনিয়াছে। পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে একটি সুন্দর মুখ দেখিলেই কৌতূহল প্রবল হইয়া ওঠে, তাহার কুল, জাতি, গোত্রের পরিচয় জানিতে।

বিশেষত জয়াবতীর মতো এক সন্তানের মার। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে গাঁথিয়া ছেলেকে সংসারী করিয়া দেওয়াই যেন জীবনের চরম ও পরম কর্তব্য এঁদের।

কিন্তু ধ্যানের ধারণা যখন সত্যই মূর্তি হইয়া আসিয়া ধরা দেয়?

না, কথাটা বলা ঠিক হইল না,—ধরা দিলে অনেক সমস্যাই মিটিত। আধুনিক মেয়েরা স্বামীকেই বড়ো ধরা দেয়—তা আবার শাশুড়ীকে! ধরা দেয় না, শুধু মূর্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

পরবর্তী ঘটনাটা ধরিবার চেষ্টা, আর ধরা না দিবার আক্ষেপ-বিক্ষেপের সমষ্টি।

তবু বিমলেন্দুর বৌয়ের মতো, বিয়ের কনে আসিয়াই নিজ মূর্তি ধরার দৃষ্টান্ত আধুনিক মহলেও কম। শহরের মেয়েকে বাগ মানাইতে পারিবেন কিনা এই সন্দেহে পল্লী অঞ্চলের মেয়ে আনিয়াছিলেন জয়াবতী, প্রতিভা আসিয়া শহরকে টেক্কা দিল।

বিয়ের কনে কে কবে শাশুড়ীকে শুনাইয়া বরকে মুখনাড়া দেয় ঃ 'এই যে শুনেছিলাম, এত ভালো অবস্থা—ততো ভালো অবস্থা,—তার খুব দেখছি বটে! বাড়ীতে এমন একখানা বড়ো আয়না নেই যে, দাঁড়িয়ে চুলটা বাঁধি। ঘর-সংসার গুছিয়ে তবে ভদ্রলোকের মেয়ে ঘরে আনতে হয়—বুঝলে? বাহারের মধ্যে দরজা-জানলায় ছেঁড়া কাপড়ের পর্দা ঝোলানো! হাসি পায়।'

দালান ঝাঁট দিতে দিতে কথাটা কানে গেল জয়াবতীর।

ধাক্কাটা প্রথম, তাই চলন্ত হাতটা হঠাৎ যেন অবশ হইয়া আসে। এ পর্যন্ত এ অঞ্চলে 'সাজুনে-গুছুনে-সৌখীন' বলিয়া খ্যাতি ছিল জয়াবতীর। জয়াবতীর ভাঁড়ারে প্রত্যেকটি টিন রং-করা, মার্কিক-সই। শেলফ, আলমারি বোতল, কাচের জারের প্রাচুর্যে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে। জয়াবতীর ঘর-দোর ছিমছাম ফিটফাট, ট্রাঙ্ক-বাক্স, সিন্দুক-দেরাজ—সব শাড়ীর পাড়ের ঘেরাটোপে ঢাকা, বিছানা ফরসা, বালিশের ওয়াড়ে ঝালর। এ-সব আবার এদেশের ক'জনের আছে?

সম্প্রতি বৌ আসিবে বলিয়া নিজের পুরানো আমলের ভয়েল শাড়ী কাটিয়া সমস্ত জানালা দরজায় পর্দা লাগাইয়া তো পাড়ার লোকের ঈর্ষাভাজনই হইয়াছেন। লোকে বলে ঃ 'বৌ আসছে বৈ তো রাণী আসছে না, অতো বাড়াবাড়ি কিসের?'

জয়াবতীর সেই সাধের গৃহসজ্জা দেখিয়া বড়োমানুষের মেয়ের নাকি হাসি পায়! বিমলেন্দু কি উত্তর দেয়, শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া রহিলেন জয়াবতী, কিন্তু গলা শোনা গেল না তার।

জলপানি পাওয়া গ্র্যাজুয়েট ছেলে জয়াবতীর, ক্লাশ নাইনের দাপটে বোবা বনিয়া গেল নাকি?

তা' বোবা ছাড়া আর কি? বারে বারে প্রতিভার কণ্ঠস্বরই তো কানে আসে ঃ 'এই অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে হবে মনে করলেই তো আমার আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হয়ে আসছে। কি বললে,—আমাদের হুগলীও পাড়াগাঁ? বেশী বোকো না। কিসে আর কিসে? হুগলীতে কি নেই শুনি? কলের জল, লাইট, ফ্যান,—কিসের অভাব? বাবার যেমন কাণ্ড, বিয়ে দেবার আর দেশ পেলেন না—ত্রিবিণীতে বিয়ে! ... আবার তো শুনছি, ... সাংঘাতিক ম্যালেরিয়াও আছে। মরবো আর কি।'

চিরদিনের শান্তশিষ্ট জয়াবতীর শীতল রক্তে হঠাৎ যেন আগুন ধরিয়া যায়। যে ছেলেকে কোনও দিন উঁচু কথাটি বলেন নাই, তাহার সম্বন্ধে একটা তীব্র কটূক্তি মনে মনে উচ্চারণ করিয়া বসেন।

জিভ কি পক্ষঘাতগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে বিমলেন্দুর? তাই একটাও উত্তর জোগাইল না? ... কি করবেন, পর্দা ঠেলিয়া জয়াবতী নিজে তো আর ছেলে-বৌয়ের ঘরে ঢুকিয়া উচিতমতো উত্তর দিতে পারেন না।

পারেন না বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি কথার সমুচিত উত্তর অবিরত মনের ভিতর পাক খাইতে থাকে।

পরিপাটি করিয়া, ঝাঁটপাট দিয়া ঝক্‌ঝকে মাজা ঘড়াটি লইয়া ঘাটে যাইবার সামর্থ্য ও স্পৃহা দুইই চলিয়া যায় যেন।

এই বৌ হইল বিমলেন্দুর!

জয়াবতীর দীর্ঘ তপস্যার ফল? প্রায় আজীবনের আশার-কুসুম? তবু মুখোমুখি কিছুই বলা চলে না। ব্যবহারেও উনিশ-বিশ করাও শক্ত। বিমলেন্দুকে যে বলিবেন কিছু, তাই বা সম্ভব কোথায়?

বিমলেন্দুই যদি উল্টা বলিয়া বসে ঃ 'ছেলে-বৌয়ের ঘরে কি তুমি আড়ি পাততে গিয়েছিলে?' তখন?

অতএব মনের রাগ মনে চাপিয়া প্রত্যহের মতোই বৈকালিক জলযোগ সাজাইয়া লইয়া স্নেহ-পূর্ণ কণ্ঠে ডাক দিতে হয় বৌকে। অল্পাহারের কথা তুলিয়া অনুযোগ-অভিযোগও করিতে হয়।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত তিক্ত-বিরস হইয়া থাকে। বৌকে আপন করিয়া লইবার সাধু সংকল্প এই একটি মাত্র ঝাপটায় কোথায় উড়িয়া যায়।

দিন বারো-চৌদ্দ পরে বধূকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেল বিমলেন্দু।

জয়াবতী যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

কিন্তু কেন এমন হইল? বিমলেন্দুর জন্য প্রাণ কেমন করিল না কেন জয়াবতীর? বিমলেন্দুর বিদায়-বেদনাটা যেন ভাসা-ভাসা ঝাপসা। উৎসব শেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বিদায় লওয়ার মতোই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। নূতন বৌয়ের মতো বিমলেন্দুও যেন একজন অভ্যাগত মাত্র।

অথচ বিমলেন্দুর পাঠ্যাবস্থা হইতে এই বিদায়-পর্বটা কী এক শোকাবহ ঘটনার সামিলই করিয়া তুলিতেন জয়াবতী! তিনদিন আগে হইতে কান্না সুরু হইত তাঁহার। এজন্য স্বামীর কাছেই কি কম তিরস্কার খাইয়াছেন?

উঠিতে বসিতে উপচাইয়া পড়া সেই অশ্রু-সমুদ্র কোথায় শুকাইয়া গেল আজ?

বত্রিশ নাড়ীর যে বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াও মাতা-পুত্রকে কোথায় যেন অদৃশ্য ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এতদিন, তেমনি কোনো অদৃশ্য আঘাতেই কি নির্মূল হইয়া গেল সেই বন্ধন।

ক'দিনের আগোছালো সংসারটাকে গুছাইয়া লওয়াই কি এতো বড়ো দরকারী কাজ হইল জয়াবতীর, যে ছেলে-বৌ বাড়ীর চৌ-কাঠ ডিঙাইতে না ডিঙাইতেই আগাগোড়া ওলট-পালট করিয়া গুছাইতে শুরু করিয়া দিলেন?

মুক্তি জিনিসটা কাম্য হইতে পারে, কিন্তু বেশ সহজপাচ্য কি?

পরিপাক করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়?

মাস দুই পরে আবার নিজে হইতেই তো বৌ আনার কথা তুলিতে হইল। কিসের যেন একটা ছুটিতে সম্প্রতি বাড়ি আসিয়াছিল বিমলেন্দু। জয়াবতীর মনে হইল—ছেলে যেন ভার-ভার, মনঃক্ষুণ্ণ।

মায়ের দিকে যে দৃষ্টিতে চাহিতেছে, সে কি অভিযোগের নয়?

বরাবর বাড়ী আসিলেই মায়ের সঙ্গে যতো গল্প হয় তাহার রাত্রে খাওয়ার সময়। সারা পাড়া নিশুতি হইয়া যায়, শুধু জয়াবতীর ঘরে তিনদিনের খরচের কেরোসিন একদিনে পোড়ে।

এবারে পাঁচ মিনিটে খাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল বিমলেন্দু, মাকে একবার বলিয়াও গেল না। জয়াবতী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন ছেলের গমন-পথের পানে।

অনেক রাতে যখন নীচের কাজকর্ম সারিয়া জয়াবতী উপরে উঠিলেন, তখন ছেলে ঘুমে অচেতন। মাথার কাছে চিঠির প্যাড আর ক্যাপ-খোলা ফাউন্টেন পেনটা পড়িয়া আছে। হ্যারিকেনের সামনে একটা বই আড়াল করিয়া দিয়া দিব্যি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

চিরদিনের ঘুম-কাতুরে ছেলে, পরীক্ষার পড়ার সময় যেমন হ্যারিকেনে বই আড়াল করিয়া দিয়া খাতাপত্র ছড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িত। জয়াবতী আসিয়া আলোটাকে মাথার কাছ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া পরম যত্নে গুছাইয়া তুলিয়া রাখিতেন বই খাতাপত্র।

আজ শুধু বিনাবাক্যে আলোর শিখাটা একটু কমাইয়া দিয়া পাশের ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়েন। ওঃ বৌকে লেখা হইতেছিল বাবুর। তাই মায়ের সঙ্গে একটা কথা বলারও ফুরসৎ হইল না!

পরদিনই ছেলের কাছে বৌ আনার কথা তুলিলেন জয়াবতী।

বিমলেন্দু যেন আলগোছ হইয়াই ছিল। চক্ষুলজ্জার খাতিরেও একবার বলিল না : 'যাক্ না আরো কিছুদিন, এতো তাড়া কি?'

বিয়ের কনে এবার ঘর করিতে আসিল।

ঘর করিতেই যে আসিয়াছে, সে দাবীর ভাব প্রতিভার ব্যবহারে ষোলো আনা ছাপাইয়া আঠারো আনায় ওঠে। এ বৌ লইয়া ক'দিন সদ্ব্যবহার রাখিতে পারে লোকে? নতুন বৌ একটু কুণ্ঠিত, একটু নম্র, একটু সলজ্জ হইবে না? কেন, আর কারো বাড়ীতে কি বৌ কোনো দিন দেখে নাই প্রতিভা?

প্রতিভার কথাবার্তা 'চ্যাটাং চ্যাটাং', হাঁটা-চলা দুমদাম, কাজকর্ম বেপরোয়া। এই তো বৌ আনার পর পাঁচ দিনও যায় নাই, শনিবারে বাড়ী আসিয়াছে ছেলে, বিমলেন্দুকে জল-খাবার দিবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া আসিতেছেন জয়াবতী, রান্নাঘরে ঢুকিয়া অবাক!

প্রতিভা চায়ের জল চাপাইয়া দিয়া নিমকির ময়দা মাখিতে বসিয়াছে।

মিনিটখানেক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জয়াবতী কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন : 'আকাচা কাপড়ে ছিষ্টি ভাঁড়ার ছুঁলে বৌমা?

প্রতিভা খুন্তির কোণ দিয়া নিমকির গায়ে ঠোক্কর মারিতে মারিতে তীক্ষ্নস্বরে বলে : 'আকাচা কাপড় মানে? আপনার সামনেই তো কাপড় কেচে এলাম দেখতে পেলেন না?'

'দেখবোনা কেন? কাণা তো নই? পরলে তো সেই তোমাদের ঘরের আলনার জামা-কাপড়? আর সেই অবধি তো বিছানায় বসেছিলে।'

'আপনার সংসারে বুঝি কাচা কাপড় পরলে একপায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়? জানতাম না তা'—বলিয়া চাকি, বেলুন ছাড়িয়া আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়ায় প্রতিভা! ফর্সা রং, এতটুকু এদিক ওদিকেই লাল হয়ে ওঠে।

চায়ের জলটা উথলাইয়া উনুনের গায়ে পড়িতে থাকে। জয়াবতী বোকার মতন দাঁড়াইয়া থাকেন। করিবেন কি? বৌকে খোসামোদ করিয়া ডাকিয়া আনিবেন, না নিজেই তাহার পরিত্যক্ত কাজটা শেষ করিবেন?

দুইটাই যে সমান অসম্ভব।

হঠাৎ এক সময় চোখ পড়িল, চা খাবার না খাইয়াই বেড়াইতে বাহির গেল বিমলেন্দু। বোধকরি জীবনে এই প্রথম।

বৌ যে 'সাতখানা করিয়া' লাগাইয়াছে গিয়া তাহাতে আর সন্দেহ কি!

দিন যায়।

কেমন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে ছেলে, আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে বৌ, নিরুপায় আক্রোশে শুধু চাহিয়া চাহিয়া দেখেন জয়াবতী।

প্রত্যেক শনিবারে বাড়ী আসে বটে বিমলেন্দু, রবিবারে থাকিয়া সোমবার ভোরের গাড়ীতে কলিকাতা ফেরে, কিন্তু ক'টি কথা কহিতে পান জয়াবতী। চোখে দেখিতে পান ক'বার।

বাড়ী আসিয়া ঘরে ঢুকিবার আগে যা দুই একটা মামুলী কুশল-প্রশ্ন করে, নিতান্তই দায়-সারা সেটা। তারপর সেই যে 'ইষ্টদেবী'র মন্দিরে গিয়া ঢুকিল, আর পাত্তা পাওয়া যায় না ছেলের।

রাত্রি দশটায় জয়াবতী যখন বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে আহারের জন্য ডাক দেন, তখন নামিয়া আসে বিমলেন্দু, চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়।

চির-অভ্যাসের বশে ছেলের রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্যবস্তুগুলোর আয়োজন করেন ঠিকই, কিন্তু কাছে বসিয়া মাথার দিব্যি দিয়া সবগুলি ছেলের উদরসাৎ করাইবার স্পৃহা যেন আর নাই।

ভালো করিয়া না খাইলে শুধু রাগই বাড়িয়া উঠে।

একদিন তো ফট্ করিয়া বলিয়াই বসিয়াছিলেন ঃ 'এবার থেকে বাড়ী এলে বৌমাই যেন রাঁধে, নইলে খেয়ে পেটও ভরে না, ভালোও লাগে না দেখি।'

বিমলেন্দু কিন্তু অপ্রতিভ হওয়ার পরিবর্তে মায়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হানিয়া স্বচ্ছন্দে বলিয়া গেল ঃ 'তোমার মনটনগুলো আজকাল কী সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! আশ্চর্য।'

অপমানহত কালো মুখ লইয়া বসিয়া থাকিলেন জয়াবতী, উত্তর জোগাইল না। উত্তর দিবেনই বা কাকে? ছেলে ততক্ষণে উপর কোঠায়।

পাড়াগাঁয়ে পাড়া বেড়াইবার প্রথাটা রীতিমতই আছে, বিশেষত একটা উপলক্ষ্য জুটিলে। কারো বাড়ী নতুন বৌ আসা তো বেশ একটা বড়ো দরের উপলক্ষ্য। বৌ কেমন হইল—এই কৌতূহল লইয়া পাড়া ঝাঁটাইয়া মহিলার দল বেড়াইতে আসেন জয়াবতীর বাড়ী।

অপরের কাছে জয়াবতী খেলো হইতে রাজী নন। তাই বৌয়ের তিনি প্রশংসাই করেন। কিন্তু অন্তঃসারহীন কৃত্রিম সেই ভাষা বুঝিয়া ফেলিবার মতো বুদ্ধি এ দেশের বারো বছরের মেয়েটিরও আছে।

জয়াবতীর কাছে জ্ঞাতব্য তথ্য সব সংগ্রহ করিয়া অবশেষে তাহারা আবার উপরে উঠিয়া বৌয়ের ঘরেও উঁকি মারিতে যান। সেখানেও তথ্য সংগ্রহ হয় কিছু।

পাড়ার লোকে বেড়াইতে আসিলে তাঁহাদের সম্মানার্থে যে নীচে নামিয়া আসিয়া আসন-পীড়ি দিবে—এতো গরজ পড়ে নাই প্রতিভার। তবে উপরে কেউ উঠিয়া আসিলে গুছাইয়া গল্প করিতে আপত্তি নাই তার। জয়াবতীর দুর্ব্যবহারের পরিচয় দিবার জন্যও তো শ্রোতার প্রয়োজন?

শ্রোতারাও অবশ্য শুনিতে অরাজী নয়।

শুনিয়া আবার জয়াবতীর কাছে আসিয়া গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের অভিনয় করিতেও তো মজা আছে।

—'বৌয়ের তো খুব সুখ্যাতি করিস, শুনেছিস তোর বৌয়ের কথা?

কথাটি বলিয়া লাহিড়ীদের বড় গিন্নী আঁচলের কোণ খুলিয়া দোক্তার কৌটোটি বাহির করেন।

জয়াবতী নিস্পৃহ ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলেন ঃ 'কেন, কি বললে?'

—'শুনলে তুই রেগে মরবি মেজ বৌ, তবে আমাদের শুনলে কষ্ট হয়। আহা, একটা ছেলের বৌ, ... মনের মতন না হলে কি কম দুঃখের কথা!'

জয়াবতী উদাসীনভাবে বলেন—'আরে দিদি, মনই নেই, তা মনের মতন। সেই একজনের সঙ্গে সবই চিতায় গেছে। এখন ওরা ভালো থাকলেই ভালো।'

—'আহা, তা তো বুঝলাম, তবু বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই। বেটার বৌ এসে কোথায় একটু দেখবে শুনবে—তা নয়, বৌ যেন মানোয়ারি গোরা। আমি কোথায় ভালমানুষি করে বললাম—'হ্যাঁ গা বাছা, আজ একাদশীর দিন—ঝি আসেনি, শাশুড়ী মাগী খেটে মরছে, তুমি বরং বাসন ক'খানা মাজলে পারতে,—মুখ ঝামটা দিয়ে বললে কি—কে জানে, কবে কি তিথি-নক্ষত্র পড়ছে, পাঁজী-পুঁথি নিয়ে তো বসে নেই। আমার কাজ ওঁর পছন্দ হলে তো—শোনো দিকি কথা।'

জয়াবতী অবশ্য অনেক শুনিতেছেন তবু অপরের সামনে দোষারোপে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন,—'হ্যাঁ, এখন তো ওই বদনামই হবে। আমার ভ্যাড়াকান্ত ছেলেকেও তাই বুঝিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে চব্বিশ ঘণ্টা ওপরতলায় বসে আছেন। কুটোটি নাড়েন না। পছন্দ মতন কাজ করলেই, পছন্দ হয়। কাজ দেখলে গা জ্বলে যায়!'

চেষ্টাকৃত ভদ্রতার আবরণ খসিয়া পড়ে ... কেন কি দায় পড়িয়াছে জয়াবতীর বৌয়ের সুনাম রাখিতে? বৌ যদি পাড়ার লোকের কাছে নিন্দা করিয়া বেড়ায় তাঁহার?

লাহিড়ী-গিন্নী গভীর পরিতাপের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়া বলিয়া ওঠেন—'হাঁরে, বিমল যে তোর সোনার ছেলে! সে কিছু বলে না?'

—'তেমন স্যাকরার হাতে পড়লে সোনাও লোহা হয়ে যায় দিদি।'

—'কি জানি বাবা! কলিকাল আর কাকে বলেছে! আহা পাঁচটা সাতটা নয়— একটা ছেলে, বৌ ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে পর করে নিলে! মরে যাই, চিরদিনের ভালোমানুষ, তোর কপালে এতো দুর্ভোগ!'

লাহিড়ী-গিন্নী বোধ হয় সহজে থামিতেন না, এমন মনোহর পরিবেশটী গড়িয়া উঠিয়াছিল। আসর মাটি করিয়া দিল নাতিনী লাবণ্য আসিয়া : 'দিদিমা, শীগগির চলো, বাবা এসেছে, মামিমা তোমায় ডাকছে।...'

যতো মুখরোচক আলোচনাই হোক, জামাই আসিয়াছে, আর বসিয়া থাকা চলে না। লাহিড়ী-গিন্নী উঠিয়া পড়েন।

উঠিতে পারেন না জয়াবতী!

হাতের ঘড়া-ঘটিটার মতোই নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকেন।

আবরণ জিনিসটা একবার খসিয়া গেলে অবস্থাটা হইয়া ওঠে মারাত্মক। ...চক্ষুলজ্জার বালাই আর থাকে না কোন পক্ষেরই।

জয়াবতী প্রায় প্রত্যহই কাঁদিয়া কাটিয়া পাড়ার কারুর না কারুর বাড়ী বেড়াইতে যান, আর মনের ভার লাঘব করিয়া আসেন। প্রতিভা বাড়ীতেই সমব্যথী জুটাইয়া আনিয়া সারাদিন 'শাশুড়ী-চরিত' আলোচনান্তে পড়ন্ত বেলায় চুল বাঁধে, গা ধোয়, পরিপাটি করিয়া সাজিয়া ছাদে গিয়া বসে, নয়তো বরকে চিঠি লেখে।

জয়াবতী আসিয়া দুমদাম করিয়া সংসারের কাজ করেন আর বৌকে শুনাইয়া. শুনাইয়া রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন, ... বৌ কখনো অগ্রাহ্যভরে ঠোঁট উল্টায়, কখনো পাল্টা একটা কটু মন্তব্য করে।

তবু সব সহ্য হয়, সহ্য হয় না বিমলেন্দুর পরিবর্তন।

আজকাল আর মায়ে-ছেলের কাথাবার্তা নাই বলিলেই চলে, গুম হইয়াই থাকে বিমলেন্দু। অথচ বৌয়ের সঙ্গে যে 'গল্প ফুরাইতে চায় না, সেটা তো চোখে পড়ে অহরহ।......

মা বলিয়া তো সমীহ করে না কেউ।

তা'ছাড়া—আর একটি বদ-অভ্যাস সৃষ্টি হইয়াছে জয়াবতীর—ছেলে বৌয়ের ঘরের জানালার ধারে কাছে কোন একটা কাজের ছুতায় দাঁড়াইয়া পড়া।

হায়! কোন জয়াবতীর এতো অধঃপতন!

সুখ তো তাহাতে নাই-ই, বরং দুঃখই বাড়ে। ... ঘরের জানালায় কান না পাতিলে কি একথা শুনিতে পাইতেন জয়াবতী ঃ 'আসল কথা হিংসে! হিংসে! বিধবারা ভারি হিংসুটে হয়, বরাবর জানি আমি। নিজেদের সাধ-আহ্লাদ সব ঘুচে গেছে কিনা, তাই পরের সুখ দেখলে হিংসেয় প্রাণ ফাটে। এই যে—তুমি আমার কাছে একটু বসো কি দু'দণ্ড গল্প করো—সহ্য হয় না। বুক ফেটে যায়।'

হয়তো বিমলেন্দু ক্ষীণ একটু প্রতিবাদ করে, কিন্তু সে এমনই ক্ষীণ যে জয়াবতীর কানে আসে না। ... বৌয়ের পরবর্তী উত্তরটাই কানে আসে ঃ 'আহা, তুমি আর বুঝবে কি? তোমার সামনে তো ভিজে বেড়ালটি। ......বলি পাড়ায় পাড়ায় নিন্দে ছড়ায় কি বাতাসে উড়ে গিয়ে? বাড়ীর লোক না রটালে? এতো বলে মরে যাচ্ছি, কলকাতায় নিয়ে চলো আমায়—'

—'আমিও তো খুঁজে মরে যাচ্ছি গো প্রতিভারাণী। বাড়ী পাচ্ছি কই?'

কে বলিল কথাটা?

বিমল?

জয়াবতী বাঁচিয়া আছেন তো? ... সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিকে? আরো বাঁচিবার প্রয়োজন আছে?

তবু ভাত বাড়িয়া খাইতে ডাকিতে হয়।

এই দুর্গতি জয়াবতীর। বাড়ীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই যে ডাকিয়া দিবে। ... অবশ্য ডাকেন বলিয়া যে, সে ডাক স্নেহ বিগলিত এমন নয়। স্বভাব-বহির্ভূত স্বরে কথা কহিতে দেখা যায় আজকাল জয়াবতীকে—'কি গো, বড় মানুষের মেয়ের ভাতটাত খাওয়ার ফুরসুৎ হবে? নাকি বাঁদী হাঁড়ী নিয়ে বসে থাকবে বেলা বারোটা অবধি।'

তা' এহেন সম্বোধনে যাকে ভাতের থালার গোড়ায় আসিয়া বসিতে হয়, মেজাজ তাহারই-বা ভাল থাকিবে কোন হিসাবে?

প্রতিভাও সশব্দে আসে, ভাত-তরকারি ফেলিয়া ছড়াইয়া যথেচ্ছভাবে খায়। উপকরণের ত্রুটি ধরিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসে। তাহার বাপের বাড়ীতে নাকি তিন রকম মাছ রান্না না হইলে পাতের কাছেই আসে না কেউ, ভাতের চাইতে তরকারির পরিমাণ বেশী না হইলে যে আবার খাওয়া যায়, বিয়ের আগে নাকি জানাই ছিল না প্রতিভার, ইত্যাদি।

এমন কি একটা মন্তব্যের পরদিন জয়াবতী প্রতিভার ভাত বাড়িয়া দিয়া থালার পাশে একটি কাঁসি সজনে খাড়ার চচ্চড়ি আনিয়া বসাইয়া দেন।

—'এটা কি হলো।'

প্রতিভার তীক্ষ্ণ প্রশ্নে আজকাল তেমন আহত হন না জয়াবতী, সমান তীক্ষ্ণ-সুরে তিনিও বলেন—'তরকারির অভাবে কষ্ট করে খাবার তো দরকার কিছু নেই বৌমা, বেশী খেলেই রাঁধবো বেশী বেশী।'

প্রতিভা হাতের উল্টোপিঠের সাহায্যে পাত্রটা খানিকটা দূর ঠেলিয়া দিয়া বলে—'তা বলে বিধবা মাগীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে! আপনার লোভের জিনিস!'

—'কী! কী বললে বৌমা।'

আহত জন্তুর মতো একটা বিকৃত চীৎকার বাহির হয় জয়াবতীর কণ্ঠে। দুঃসহ স্পর্ধার এই নূতন রূপ দেখিয়া সমস্ত শরীর যেন থরথর করিয়া ওঠে।

প্রতিভা অবশ্য দমে না তাহাতে, মুচকি হাসির সঙ্গে বলে—'মিথ্যে আর কী বলেছি? কাঁসি-ভর্তি চচ্চড়ি তো খান বসে বসে। দেখেছি বলেই বলছি।'

কথাটা যদি মিথ্যা হইত, তবে বোধ করি জয়াবতীর সর্বাঙ্গে এমন আগুন ধরিয়া যাইত না। ... মিথ্যা নয়, বড়ো বেশী সত্য। এই সজিনা খাড়ার ওপর আজীবন দুর্বলতা জয়াবতীর।

বাড়ীর উঠানেই গাছ, ফলও ধরে অজস্র, আর প্রত্যহ রাঁধা চাই জয়াবতীর। ... এই লইয়া দেবনাথ কতো হাসিতেন। হাসিতেন বটে, আবার দৈবাৎ কোনোদিন একটু কম আছে দেখিলে নিজেই গাছ ঠেঙাইয়া পাড়িয়া দিতেন।

শুনিতে হাসির কথা—কতো সময় একা হাতে জয়াবতী ইচ্ছার অনুরূপ কুটিয়া উঠিতে না পারিলে পেন্সিলকাটা ছুরি লইয়া ছাড়াইয়াই দিয়াছেন রাশি রাশি।

জয়াবতী অনুযোগ করিলে বলিতেন 'তা হোক, হাসুকগে পাড়ার লোকে। ডাঁটা-চচ্চড়ির বহর কম হলে মহারাণীর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে যে। তখন উপায়? কেন ছাড়ানো কিছু খারাপ হচ্ছে কি? দেখো না।'

বিমলেন্দুও কতো দিয়েছে ছেলেবেলায়।

জয়াবতীর সজিনা খাড়া-প্রীতি পাড়ার লোকের অবিদিত নয়। তাঁর নিজের বাড়ী গাছ থাকা সত্ত্বেও যে যার গাছের ডাঁটা উপহার দিয়া যায় প্রত্যেক বছর।

প্রীতির সেই দুর্বলতাকে 'লোভ' বলে নাই কেউ কোনোদিন। হেনস্থার চোখে দেখে নাই ব্যাপারটা। আদরের ছিল।

আজ বিমলের বৌ আসিয়া সেই বস্তুটার খোঁটা দিল এমন নির্লজ্জ ভাষায়!

অনেক মুখরা হইয়াছেন আজকাল জয়াবতী, তবু আজিকার এই আঘাতটা যেন মূক করিয়া দিল তাঁকে। ... কিভাবে যে তিনি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন, কিভাবে ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, সে আর মনে নাই।

হঠাৎ কোনো আক্রমণের মুখোমুখি হইয়া গেলে, মানুষ যেমন দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ছুটিতে থাকে আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক প্রেরণায়, তেমনি আত্মরক্ষার ভাবই যেন ছিল জয়াবতীর পলায়নে।

কিন্তু অমন আছড়াইয়া পড়িয়া নালিশ জানাইলেন তিনি কাহার কাছে?

ঘোর সংসারী জয়াবতী এমন আকুল হইয়া কবে ডাকিয়াছেন ঠাকুরকে?

আজই কি এতো প্রয়োজন পড়িয়া গেল দর্পহারী মধুসূদনকে? তাই অনবরত মাথা কুটিতে থাকেন তাঁহার উদ্দেশে।

কিন্তু মধুসূদনের এমন প্রখর শ্রবণশক্তির প্রমাণই বা কবে কে পাইয়াছে? বধির বলিয়াই তো চিরদিনের দুর্নাম তাঁহার। আজ জয়াবতীর আবেদনটাই এতো তাড়াতাড়ি কানে ঢুকিয়া গেল? ... আর আশ্চর্য! প্রতিভার মতো একটা তুচ্ছ প্রাণীর দর্পচূর্ণ করিতে একেবারে গদাটারই প্রয়োজন হইল বীরপুরুষের!

বিরাট সেই গদাটা যে প্রতিভার দর্পের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারিণীর পাঁজর ক'খানাও চূর্ণ করিয়া বসিবে, সে বোধও রহিল না? এমনি বেহুঁশ?

না কি জয়াবতীর কাণ্ডজ্ঞানহীন আবদারে নিতান্তই বিরক্তচিত্তে বেপরোয়া ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন মারাত্মক অস্ত্রটাকে? আচমকা সেই ধাক্কাটা লাগিল গিয়া বিমলেন্দুর গায়ে?

তা নয় তো—যে বিমলেন্দু নিত্য দুই বেলা ট্রামের ফুটবোর্ড হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়ে সেইদিনই বা সে সোজাসুজি রাস্তার বদলে রাস্তায় চলন্ত বাসের তলায় পড়িল কেন?

সেদিনের মাথা-কোটার মাত্রাটা কি বড়ো বেশি হইয়া গিয়াছিল জয়াবতীর? তাই নিজেও তিনি বিমলেন্দুর নিস্পন্দ মূর্তিটার মতোই নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন হাসপাতালের খাটখানার সামনে? বিমলেন্দুর মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ডের জন্যও মাথা কুটিবার শক্তি আর খুঁজিয়া পাইলেন না?

পাড়ার লোকে বলাবলি করিয়াছিল—'এ ধাক্কা সামলাতে পারবে না মাগী, পাগল হয়ে যাবে—'

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল পাগল হওয়া অতো সোজা নয়।

দুই চোখের কোলে কালির রেখা আর গালের হাড় দুইটা একটু-উঁচু দেখানো ছাড়া বিশেষ আর কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না।

আবার একদা দেখা গেল—শীত পড়িতে না পড়িতেই চির-অভ্যাসবশে রোদে পিঠ দিয়া বড়ি দিতেছেন জয়াবতী, আলাদা আলাদা পাত্রে তিল, পোস্ত আর ছাঁচি কুমড়োর বড়ি। নৈপুণ্যের ঘাটতি কিছু নাই।

দেখা গেল—শীতের শেষের দিকে নাড়াচাড়া করিতেছেন কোটা আমসি, আর কুলের আচারের পাথর লইয়া।

দেখা গেল—কুয়োর জলে ডাল আধ-সিদ্ধ থাকিবার ভয়ে মাজা চকচকে পিতলের ঘড়াটা লইয়া 'ঘাটের জল' আনিতে।

এই তো উঠানের মাচা হইতে লক-লকে কুমড়ো ডাঁটার ডগা কাটিয়া চুপড়ি বোঝাই করিতে দেখিলাম আজ।

অতএব অনায়াসেই কল্পনা করা যায়—ভাঙা পাথুরিখানায় করিয়া সর্ষে-বাটা, লঙ্কা-বাটা আর পোস্ত-বাটা সাজাইয়া লইয়া দিব্য গুছাইয়া রান্না করিতে বসিয়াছেন জয়াবতী।

তা পৃথিবীর নিয়মই তো এই—

পাঁজর ভাঙিয়া গেলেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না মানুষের।

এখনো অবশ্য প্রতিভার ভাত বাড়িয়া আহারে তাগিদ দিতে ডাকাডাকি করিতে হয় জয়াবতীকেই—তৃতীয় প্রাণী আর কই? তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাবের সমস্ত সম্ভাবনা পর্যন্ত তো মুছিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে বিমলেন্দু।

চকচকে কালো পাথরের বড়ো থালায় পরিপাটি করিয়া সাদা ধবধবে আতপ চালের অন্ন বাড়িয়া রাখিয়া জয়াবতীই ডাকেন—'বৌমা, অ বৌমা, নেবে এসো মা, মুখে দুটো দিয়ে যাও।'

কণ্ঠস্বরে মমতার মাত্রাটা বড়ো বেশী পরিস্ফুট হইয়া ওঠে না? আশে-পাশে জ্ঞাতিদের বাড়ী হইতে শুনিতে পাওয়া যায় ... অবাক হয় তাহারা জয়াবতীর মমতা আর মহানুভবতার পরিচয়ে।

স্নেহ-বিগলিত করুণ স্বর করুণতর হইয়া ওঠে অনুরোধ উপরোধের সময় ... পাখা হাতে করিয়া কল্পিত মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে বলেন—'খেতে পারছিনা বললে চলবে কেন মা? শরীরটাকে তো রাখতে হবে? ভালো জিনিস খাওয়ার বরাত তো ঘুচিয়েছেন ভগবান, পোড়া বিধবার গুচ্ছির শাক-পাতা-ডাল-চচ্চড়ি না খেয়ে উপায় কি? ভাত ক'টা ফেলে উঠো না মা, বরং আর দু'গাছা ডাঁটা দিই।'

মহিলা সমাজের চিত্ত-জগতে প্রতিবেশীর ঘরের সদ্য বিবাহিতা বধূর আচার ব্যবহার যতোটা কৌতূহলকর, সদ্য বিধবার আহার-বিহারটা তার চাইতে কিছু কম নয়, হয়তো বা বেশী। ... কাজেই প্রায়ই ঠিক আন্দাজমতো সময়ে জয়াবতীর বাড়ীতে আবির্ভূতা হন কনকলতা, লাহিড়ী-গিন্নী, মন্টির মা।...

ইঁহাদের মুখপানে চাহিয়া করুণ নালিশ জানান জয়াবতী : 'এই দেখো ভাই, খাওয়ার দশা! তাই তো বলি বৌমাকে, মরবার তো পথ নেই মা, বেঁচে থাকতেই হবে চিরকাল। বিধবার পরমায়ু মার্কণ্ডের পরমায়ু, না খেলে চলবে কেন? কচু, ঘেচু, শাকপাতাই খেতে হবে গুচ্ছির। যেমন কপাল!'

সমস্বরে সায় দেন সমাগতার দল।

জয়াবতীর দুঃখেই শুধু বিগলিত হন না তাঁরা, বিগলিত হন জয়াবতীর করুণ হৃদয়ের পরিচয়ে। ... আর কেহ হইলে হয়তো বা "অপয়া" রব তুলিয়া বিদায় করিয়াই দিতো বৌটাকে।

আচ্ছা—জয়াবতীর কণ্ঠস্বরটাই শুধু কানে ঢোকে তাঁদের, দৃষ্টি পড়ে না মুখচ্ছবির পানে? ... কণ্ঠস্বরে—মমতার যে প্রস্রবণ বয়, চোখের দৃষ্টিতে কি আছে তাহার স্নিগ্ধচ্ছায়া? ... চোখের দৃষ্টিতে আর ঠোঁটের কোণের অতি সূক্ষ্ম রেখায় লুকানো বিষাক্ত হাসির আভাসে?

ফসিল

সুবোধ ঘোষ

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড় ; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আটষট্টি বর্গমাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজ আছেন, ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এককুড়ির উপর মহারাজের উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি ; তিনি নরপাল, ধর্মপাল এবং অরাতিদমন। চারপুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'ত ; এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে অপরাধীকে শুধু উলঙ্গ ক'রে নিয়ে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পাড়ে ; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ী তরবারির ঘটা ; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল।

সচিব আছে, সেরেস্তাদারও আছে। ক্ষত্রিয় তিলক আর মোগল তকমায় অদ্ভুত মিলন দেখা যায় দপ্তরে। যেন দুই যুগের দুই জাতের আমলাদের যৌথ প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন। সেই অপূর্ব অদ্ভুত শাসনের তাপে উত্যক্ত হয়ে রাজ্যের অর্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল অঞ্জনগড়—শুধু ঘোড়ানিম আর ফনীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকুরে মাটির ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়। কুর্মি আর ভীলেরা দু'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসীল বিভাগ আর ভীল ও কুর্মি প্রজাদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টিম আছে। হয় শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভূষি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা, যব, জনার চাই-ই।

তসীলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে ক্ষাত্রবীর্যের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলেদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্তি হয় সোজা কোন ধাঙড়-রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ ক'লকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার একটা এ ঝোপ ; সালসার মত-সুগন্ধ মাটিতে। তাদের যেন নাড়ীর টানে বেঁধে রেখেছে এ মাটি। বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায় ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্তনে তাদের দিনসন্ধ্যার সমস্ত মুহূর্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড় থেকে দয়াধর্ম একেবারে নির্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুঃস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে আলপনা আঁকা হাতীর পিঠে চড়ে আর জুলুস নিয়ে পথে বার হন—প্রজাদের আশীর্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি, সেখানে লাঠি চলবেই আর দু'চারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে আশীর্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয় ; প্রজারা সেইভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন আদায় উসুল আর তসীল চলছিল বটে, কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল, তাতে গদির গৌরব অটুট রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টীমের খরচ। রাজবাড়ীর বাপের কেলে সিন্দুকের রূপো আর সোনার গাদিতে হাত দিতে হয়। আর সিন্দুকও খালি হতে থাকে।

অঞ্জনগড়ের এই উদ্বিগ্ন অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্টের পদে নিযুক্ত হয়ে এল একজন ইংরেজী আইননবিশ উপদেষ্টা। আমাদের মুখার্জীই এল ল-এজেন্ট হয়ে। মুখার্জীর চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জী হয়ে গেল ডি ফ্যাক্টো সচিবোত্তম, আর সচিবোত্তম রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলার ইতিহাস-পড়া ডিমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে অত্যন্ত

শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে—যে সৎসাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জী তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের উন্নতির সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেণ্ট সাহেবকে, একদিকে যেমন কট্টর অন্যদিকে তেমনি হমদরদ। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জীর নির্দেশে বন্ধ হল লাঠিবাজি। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড়া করা হলো। স্টেটের জরীপ হ'ল নতুন করে ; সেন্সাস নেওয়া হ'ল। এমনি কি মরচে পড়া কামান দুটোকেও পালিশ দিয়ে চকচকে করে ফেলা হ'ল।

ল-এজেণ্ট মুখার্জীই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। কলকাতা থেকে জিওলজিষ্ট আনিয়ে সার্ভে ও সন্ধান করিয়ে একদিন বুঝতে পারে মুখার্জী, এই অঞ্জনগড় রত্নগর্ভ, এর গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ। ক'লকাতার মার্চেন্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকুরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রী স্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজেয়িক, কংক্রীট আর ভিনিসিয়ান শার্শির বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্মান লিমুজিন সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানী আইরিশ পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত ধক্-ধক্ শব্দে অঞ্জনগড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চেন্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে—মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে খোঁয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, 'কুলির ধাওড়া, পাম্প-বসান ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো, কেয়ারী করা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরি পায়, মুরগি বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্যে সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে ; আরও বাইশ বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালিয়ান ব্যাণ্ডমাষ্টার হ'লেই ভাল।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের উপর ছড়িয়ে মুখার্জী বিভোর হয়ে ভাবে, তার ইরিগেশন স্কীমটার কথা। —উত্তর থেকে দক্ষিণ সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে খিলান-কড়া করা-গাঁথুনির শ্লুস-বসানো বড় বড় ডাম। অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢলটা কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মত। প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথা পিছু এক বিঘা জমি দিতে

হবে বিনা সেলামিতে, আর পাঁচ বছরের মত বিনা খাজনায়। আউশ আর আমন ; তা ছাড়া একটা রবি। বছরে এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারি, আলু আর তামাক ; দক্ষিণেরটায় আখ, যব আর গম। তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক ; ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটি এস্টিমেটে সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে, রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয় ; এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল, এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব কভি নেহি। মুখার্জী উঠলো ; দেখা যাক, বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কিনা।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির গোছটাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জীর সামনে এগিয়ে দিলেন দুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ! আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভুট্টা জনার যা ফলবে, তার উপর যেন তসীলদারের জুলুম না হয়। আমরা নগদ টাকায় খাজনা দেব। আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য ঃ কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো, বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান, গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখছ ত মুখার্জী, শালাদের হিম্মৎ।

—হ্যাঁ দেখছি।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়লেন—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি, দু'দিন দু'রাত ধরে দেখি।

মুখার্জী মহারাজাকে শান্ত করে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মরিসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে

ফিরেছে। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা, একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিষ। ফয়জাবাদ স্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেনের কামরায় তুলে দাও। বাস্—নগদ একটি আনা, হাতে হাতে!

দুলাল বলেছে—ভাইসব, এইবুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুর্মিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেন্ট, ছুটি ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এসব সে-ই কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে ; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এস দুলাল। বল তো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্তি করে নেব।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাতত কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক।

—আচ্ছা তাই হবে। সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দেয়।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হ'ল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাঁকাচুলেভরা মাথা থেকে পাকড়ীটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ, কে আমাদের দুসমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোনমতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মত দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ে—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ......।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল—মাহাতোর জন্য।

ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেল।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন, মুখার্জীর কিছু জানতে বাকি রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘেই বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পান। ফিউডল দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জর এই সব নরপালদের তা' হলে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয় তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক্।

পেয়াদারা এসে মহারাজাকে জানালো—কুর্মিরা রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে ; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখার্জীর। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হ'ল। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো। মেষ শিশুর মত ভীরু, দুলাল যেন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে!

—তুমিই এসব সয়তানী করছ? মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধূলো আমি।

—চুপ থাক।

—জী সরকার।

—চুপ! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

মহারাজা বললেন—বিলাতী বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি খাটতে পারবে না।

—জী সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

—দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হ'ল মুখার্জীর ওপর—সিণ্ডিকেটকে এখুনি নোটিশ দাও, যেন আমার বিনা সুপারিশে আমার কোন কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র। —যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির সাহেবদের কথা মানতে বাধ্য। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না। ......আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। ......আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করবার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিণ্ডিকেটেরও একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন সর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জী? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজা আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ফুসে ফুসে ছটফট করছে।

মুখার্জী সবিনয়ে নিবেদন করে—মন খারাপ করবেন না সরকার! আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জী বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা। সিণ্ডিকেটের দুষ্ট উৎসাহেই কুর্মি সমাজের এই নাচানাচি। এই অশুভযোগ ছিন্ন না করে দিলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়।

দুলাল মাহাতোর কুঁড়ের কাছে মুখার্জী এসে দাঁড়ালো। দুলাল ব্যস্তভাবে বের হয়ে এসে একটা চৌকী এনে মুখার্জীকে বসতে দিল। মাথার পাগড়ীটা খুলে মুখার্জীর পায়ের কাছে দুলাল বসলো মাটির ওপর। মুখার্জী এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে বলে। যেন একটা অভিমানের সুরে মুখার্জীর গলার স্বর ভেঙ্গে পড়ে—একি করছো মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমরা ; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিণ্ডিকেট আজ তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাঁচাবে।

মুখার্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলে—কসম, এজেন্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্য আমরা জান দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটা একটু জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জী দুলালের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়ে—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেকদিন ; এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান আহার আর পোষাক বদলাবার কথা মুখার্জীকে ভুলতে হ'ল আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিণ্ডিকেটের অফিসে।

দেখুন মিষ্টার গিবসন, রাজা-প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের জন্য যে-কোন সুবিধা দরবারের কাছে আবেদন করলেই তো পেয়ে যাবেন।

গিবসন বললেন—মিষ্টার মুখার্জী, আমরা মনিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরো লড়বো।

—সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলেছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তা'হলে কি করে বাঁচে বলুন তো!

ঝোঁকের মাথায় মুখার্জী তার ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেললো।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক, ওয়েলথ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? গিবসন বিদ্রূপের স্বরে উত্তর দেয়।

—তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন, মিষ্টার গিবসন কুলি ভর্তির সময় দরবার থেকে অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজাও খুশি হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয় ভাল হবে।

—সরি, মিষ্টার মুখার্জী! গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুরুট ধরালেন।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জীর কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মুখার্জী। আর সেই মুহূর্তে অফিস ছেড়ে চলে যায়।

ম্যাককেনা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার গিবসন?

—মুখার্জী, দ্যাট মংকি অব অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ওকে মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টামহি গ্রাহ্য করিনি।

—ঠিক করেছ। শুনেছ তো ওর ওই ইরিগেশন স্কিমটার কথা? সময় থাকতে ওই স্কিম ভণ্ডুল করে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক লেবার অভারের মধ্যে পড়তে হবে। কারবার এখন বাড়তির মুখে, খুব সাবধান।

—কোন চিন্তা নেই। পোষা বিড়াল মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করবো।

পরস্পর হাস্য বিনিময় করে ম্যাককেনা বলেন—মাহাতো এসে বসে আছে যে; ওকে ডেকে নিয়ে এস, আর সেই কাজটা এবার সেরেই ফেল।

সিণ্ডিকেটের অফিসের পিছনের দরজার কাছে বসে ছিল মাহাতো। অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলে—এই যে, দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দেব।

সই করে মাহাতো। মাহাতোর পিঠ থাবড়ে ম্যাককেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মৎ মাহাতো, আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা থাকবে তোমাদের জন্য, সব সময়, ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জী শুধু আকাশ পাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মত সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধহয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলোর মাথায় ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সে-ই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান, খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার শুষ্ক মুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের চারিদিক পায়চারী করছেন ছটফট ক'রে। মুখার্জী ঢুকতেই একেবারে অগ্ন্যুদ্গার করলেন।

নাও, এবারে গদিতে থুতু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার ওপর আর স্টেট চালিও।

হতভম্ব মুখার্জী সচিবোত্তমের দিকে তাকায়। মুখার্জীর হাতে সচিবোত্তম তখুনি তুলে দিলেন একটি চিঠি। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট। —স্টেটের ইন্টারণাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করে বলেন—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্যি কথা। আমি সব জানি মুখার্জী। আমি অন্ধ নই।

—সব জানি? এ কি বলছেন সরকার?

—থাম, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধূলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায়, তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে! কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের উপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যজন করে তাঁকে সুস্থ করতে থাকে। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জী, ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজা আবার কথা পাড়লেন। —ফৌজদার সাহেব এবার আপনিই আমার ইজ্জত বাঁচান।

সচিবোত্তম বললেন—তাই হোক, কুর্মিদের আপনি শায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব, আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল সুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জী এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে মহারাজার চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবত শশক হলেও মুখার্জী আন্দাজ করে নিতে পারে। সত্যিই তো এদিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি। তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে

তার শেষ কথাটা জানালো। —আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জী, কি যে বল! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে ; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না, মুখার্জী।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জীর হাতপায়ের গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। শুধু বিকেল হ'লে ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আণ্ডার-নেক হিট চালায়। কড় কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের স্রোতে ভিজে ঢোল হয়ে যায় কালো ওয়েলারের পায়ের ফ্ল্যানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে মুখার্জী চার্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও বিশ্রাম করার নাম করে না মুখার্জী। ক্যাণ্টারে ঘোড়া ছুটিয়ে সারা পোলো লনটাকে বিদ্যুদ্বেগে পাক দিয়ে বেড়াতে থাকে। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভ'রে যেন স্পীড পান করে।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ করেন। —বড় রাফ খেলা খেলছো মুখার্জী।

সেদিনও সন্ধ্যের আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হ'ল অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে। মহারাজা সাজগোজ করে খেলার মাঠে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিল এল—চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে, এখনো ধসছে, নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুর্মি কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ! মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। —সচিবোত্তম, কোথায়? কোই হ্যায়? শিগগির ডাক, সিণ্ডিকেটের দেমাক এইবার গুঁড়ো করবো।

—হুকুম করুন সরকার ; একজন চাপরাশি কাছে এসে দাঁড়ায়।

চেঁচিয়ে ওঠেন মহারাজা। —সচিবোত্তম, তার মানে আমাদের বুড়ো দেওয়ানসাহেব, তাঁকে শিগগির একবার ডাক। সিণ্ডিকেটের দেমাক এইবার গুঁড়ো করবো।

সচিবোত্তম এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন—দুঃসংবাদ?

—কিসের দুঃসংবাদ?

বিনা টিকিটে কুর্মিরা লকড়ি কাটছিল। ফরেস্ট রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তারপর? —মহারাজার চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভাল ছিল! তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশ জন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাস এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিক্যাল এজেন্টের নোটটা যেন চকচকে সূচীমুখ বর্শার ফলার মত ভেসে বেড়াতে থাকে।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

—অন্তত সিণ্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে। —সচিবোত্তম উত্তর দিলেন।

মুখার্জীকে ডাকলেন মহারাজা। —এই তো ব্যাপার মুখার্জী। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্‌ দেখাও ; একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জী বলে—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটক করে ফেলুন।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কী লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড় দিয়ে দুলালের ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

মুখার্জী বলে—আমার শরীর ভাল নয় সরকার ; কেমন গা বমি-বমি করছে। আমি যাই।

চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। মার্চেন্টরা খুবই ঘাবড়ে গিয়েছে। তৃতীয় সীমের ছাদটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধুলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আসছে—বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌। কোয়ার্টসের পিলারগুলো চাপের চোটে তুবড়ির মত ধুলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরই মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পীটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝপথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। —কাজে যাও সব, কিছু হয় নি। কেউ ঘায়েল হয় নি, মরে নি কেউ।

মার্চেন্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছেন। গিবসন বলেন—মাটি দিয়ে ভরাট করার উপায় নেই, এখনো দু'দিন ধরে ধসবে। হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ। অন্তত একশো নাম কমিয়ে দাও।

ম্যাককেনা বলেন—তাতে আর কি লাভ হবে। দি মহারাজার কানে পৌঁছে গেছে সব। তা ছাড়া, দাট মাহাতো ; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? কালকের সকালেই

সহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারী কমিটি ; একটা গান্ধিয়াইট বদমাসও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার?

সে রাতে ক্লাবঘরে আর আলো জ্বললো না। একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটি প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জীর।

অভূতপূর্ব দৃশ্য! মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মূর আর প্যাটার্সন! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেন্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জীকে অভ্যর্থনা করলেন। —মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জী। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলে—নিশ্চয়, অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার সেটা মুখার্জীর কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জী চমকে ওঠে, ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুখ। তারপর শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে থাকে।

গিবসন মুখার্জীর পিঠ ঠুকে বলে—এসব কাজে একটু শক্ত হতে হয় মুখার্জী ; নার্ভাস হবেন না।

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পীটের কাছে মোটর গাড়ী আর মানুষের একটা ভীড়। ফৌজদারের গাড়ীর ভেতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাসটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাস এল আরো। ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে লাসগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিল একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জীর চোখদুটো। গাড়ীর বাম্পারের ওপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোন এক জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে, দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল, আর ছেনি হাতুড়ী গাঁইতা ; কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভুত হাতিয়ার। অনুমান করছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধ হয় একদিন আকস্মিক কোন ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল ; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের দাগ নেই।

চোর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আমি যেদিন পেঁপে চারাটা পুঁতলাম ঠিক সেদিন ও আমাদের বাড়ীতে এল। তখন শ্রাবণ মাসের বিকেল।

স্কুলে যাবার সময় রাস্তার নর্দমার পাশে সবুজ কচি, আমার আঙুলের সমান, কি তার চেয়েও ছোট লিকলিকে একটা পেঁপে চারা চোখে পড়েছিল। কচু আর কাঁটা-নটের জঙ্গলের মাঝখানে চারাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার তখনি লোভ হচ্ছিল, ওটা তুলে নিই। কিন্তু ক্লাসে গাছটা রাখবার সুবিধা হবে না, এ ও পাঁচটা ছেলে হয়তো ওটা হাতে নিয়ে দেখতে চাইবে, দেখতে দেখতে হাতের চাপে নরম চারাটাকে চটকে ফেলবে—তাছাড়া জামার পকেটে লুকিয়ে রাখলেও বেলা চারটে পর্যন্ত জল-মাটি ছাড়া ওইটুকু গাছ শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাবে চিন্তা করে তখন সোজা স্কুলে চলে গেছি। স্কুল ছুটি হওয়া মাত্র অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে কারো সঙ্গে একটা কথা না বলে আবার সোজা সেই নর্দমার পাশে কচু আর কাঁটা-নটের জঙ্গলের কাছে চলে এসেছি। তারপর হাত বাড়িয়ে টুক্ করে পেঁপে গাছটা তুলে নিয়েছি। বর্ষাকাল। জলে ভিজে ভিজে মাটি এমনি নরম হয়েছিল। আমার খুব ভাল লাগল অত তাড়াহুড়ো করে গাছটাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলার পরও যখন দেখলাম দশ নম্বর সূঁচের মতন সরু লম্বা আর দুধের মতন সাদা রঙের মূলটা আর মূলের চারপাশের চুলের মতন সরু ছুঁচালো শিকড়গুলোর একটাও ছিঁড়ে বা ভেঙে যায় নি। যেন মূল ও শিকড় সমেত চারাটা আমার হাতে উঠে আসতে তৈরী হয়েছিল।

হ্যাঁ ; তখন বিকেল। আমাদের রান্নাঘরের পিছনে ছাই আর জঞ্জাল নিয়ে চার হাত পাঁচ হাত একটুকরো জমি দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমনি পড়ে আছে। দিনরাত ছায়ায় ঢাকা থাকে বলে সেখানে কোন গাছ হয় না। এত বড় একটা যজ্ঞ ডুমুরের গাছ ডালপালা ছড়িয়ে জমিটা অন্ধকার করে রেখেছে, সেখানে আর অন্য কিছুর চারা বা গাছ মাথা তুলতে সাহস পায় না। শীতের গোড়ার দিকে মা ফি-বছর ধনেশাক লাগাতে গেছে, কিন্তু হয়নি। বাবা এই সেদিনও ডাঁটার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। বীজ ফুঁড়ে অগুনতি কুঁড়ি বেরিয়েছিল। কুঁড়িগুলো যখন দুপাতার ছোট ছোট গাছ হয়ে বড় হচ্ছিল, তখন আস্তে আস্তে সব ফ্যাকাশে রং ধরে শুকিয়ে খড়কের মতন হয়ে

হয়ে মরে গেছে। দুটো একটা ডুমুরের ডাল কেটে বাদ দিয়েও বাবা সুবিধা করতে পারেনি। মুশকিল এই যে, সবটা গাছ কাটা যায়নি। কাটতে গেলে আমাদের পিছনটা একেবারে বে-আব্রু হয়ে পড়বে, এই ভয়ে বাবা ডুমুর গাছটা রেখেছিল।

তা হোক, আমার পেঁপেগাছ বাড়বে না। ছায়ায় থেকে-থেকে ফ্যাকাশে রং ধরে একদিন খড়কের মতন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি যত্ন করে চারাটা পুতলাম। পুঁতে বেশ করে খানিকটা বাড়তি মাটি উঁচু করে গুঁড়ির চারপাশে তুলে দিলাম। চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল মগে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে চারাটাকে প্রায় স্নান করিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি যখন শূন্য মগ হাতে করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন ও আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সুকুমারদের বাড়ির সেই যে ছোকরা চাকর—নামটা অবশ্য তখনি মনে পড়ে গেল—মদন। মিট্‌মিট্‌ করে হাসছে। বগলে একটা ছোট পুঁটলি। পরণে ময়লা ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট। গায়ের গেঞ্জিটা আরো বেশী ছেঁড়া। পিঠের দিকটা কেমন আছে চোখে পড়ছে না, দেখলাম বুকের দিকটা ফুটো হয়ে-হয়ে জামাটার আর কিছু নেই।

'হাসছিস কেন?' আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

'গাছ দেখছি।' আমাকে গম্ভীর দেখে মদনও গম্ভীর হয়ে গেল। 'বটের চারা?'

'তোর মাথা।' রাগ করে বললাম, 'বাড়ির ভিতর কেউ বটগাছ লাগায় নাকি আহাম্মক। পেঁপে চারা। বটের পাতা এমন হয়?'

কথা না বলে মদন চোখ তুলে মাথার ওপর যজ্ঞডুমুরের ছড়ানো ডালপাতার দিকে চেয়ে রইল। তখন আমি লক্ষ্য করলাম মদনটা খুব শুকিয়ে গেছে। হাত-পা কাঠির মতন হয়েছে দেখতে। কানের পাশে গলায় ময়লা জমে ছাতা পড়েছে। ওর মাথায় কেমন চমৎকার টেড়ি দেখেছি—তার কিছু ছিল না, যেন অর্ধেক চুল উঠে গেছে, ছোট হয়ে গেছে মাথাটা। এইটুকুন ছোট-ছোট চুল—তা-ও কতকাল যেন তেল-জলের মুখ দেখেনি।

একটা ঢোক গিললাম।

'কোথায় ছিলি এতকাল। সুকুমারদের বাড়িতে তো দেখিনি?'

'ব্যামো হয়েছিল। দেশে গিছলাম।' মদন আমাদের উঠোনের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'মা-ঠাকরুন আছেন ঘরে?'

আমার চোখে চোখ রেখে যখন ও প্রশ্ন করল তখন হঠাৎ আমার মাথায় কথাটা এল।

'সুকুমারদের বাড়িতে আর তুই চাকরি করিস নে?'

মুখ বেজার করে মদন ঘাড় নাড়ল।

'মা কোথায়?'

চুপ করে ওর রোগা হাত-পা ও ছেঁড়া জামাটা আর-একবার দেখতে দেখতে পরে বললাম, 'মার শরীর খারাপ। সবে আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে। শুয়ে আছে।'

'ভাই হয়েছে বুঝি?'

মুখ বেজার করে আমি মাথা নাড়লাম।

'বোন। রংটা যদিও আমার চেয়ে ফরসা হয়েছে।'

মদন চুপ করে থেকে আমার পেঁপে চারাটা দ্যাখে।

একটা কথা মনে হল। কিন্তু চেপে গেলাম।

'কেন মাকে,—আমার মাকে কি দরকার?'

মদনের চোখের দিকে তাকাই।

মদন অল্প হাসল।

'দরকার আছে।'

'আয় আমার সঙ্গে।'

কলতলায় গিয়ে হাত ও পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলি। মুখটা ধুয়ে ফেললাম। হাতের পুঁটলি চৌবাচ্চার সিমেন্টের ওপর নামিয়ে রেখে মদন হাত ধোয়, পা ধোয় তারপর আঁজলা করে ঢকঢক করে অনেকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেয়। রোগা পেটটা ফুলে ওঠে। মাথায় আমরা দুজন সমান। আমার বয়স বেশি কি মদনের বয়স—চিন্তা করছিলাম। হয়তো দুজনে এক বয়সের ছিলাম।

'আয় ইদিকে আয়।'

ঘরের পৈঠায় উঠে মাকে ডাকলাম।

মদন আমার পেছনে দাঁড়ায়।

বাচ্চা বোনটাকে নিয়ে মা সম্ভবত শুয়ে ছিল। আমার ডাক শুনে উঠে বসল। রোগা ফ্যাকাসে মুখখানা দরজার কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কেন, কি হয়েছে।'

'মদন—সুকুমারদের বাড়ির মদন। এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

মা হঠাৎ চুপ করে রইল। মদনকে ভাল করে দেখল।

'কি হয়েছিল তোর?' একটু পর মা প্রশ্ন করে।

'ব্যামো—কালাজ্বর।' মদন একপা এগিয়ে চৌকাঠ ঘেঁসে দাঁড়ায়।

'এখন আর জ্বর হয়?'

মদন মাথা নাড়ল।

আবার কি ভাবল মা। তারপর ঃ

'ও বাড়ি গিয়েছিলি?'

মদন এবারও কথা না কয়ে ঘাড় কাত করল। মানে সুকুমারদের বাড়ির কথা হচ্ছে। আমি চুপ থাকি।

'গিন্নীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে'। মদন মার দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকায়। 'আমাকে আর রাখবে না,—গিন্নীমা বলল, অন্য লোক রাখা হয়ে গেছে।'

'সে কি রে!' অবাক হবার সুরে মা বলল, 'তুই ওদের পুরোনো লোক, এতকাল কাজ করলি!' একটু থেমে মা পরে আস্তে আস্তে যেন অনেকটা নিজের মনে বলল, 'তা অসুখ-বিসুখ তো মানুষের হবেই—অসুখ করল, দেশে গেল, এর মধ্যে অন্য লোক রাখা হয়ে গেল! না হয় রাখল, কিন্তু—' আবার কি ভেবে মা মদনের মুখ দ্যাখে।

'আর কারো বাড়ি গিয়েছিলি? কেউ কথা দিলে?'

মদন মাথা নাড়ল। আর তৎক্ষণাৎ আমি বলে বসলাম, 'সুকুমারদের বাড়িতে 'না' করে দিতে ও সোজা এখানে চলে এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'তুমি চুপ কর, তুমি থাম!' মা আমাকে ধমক দিতে আমি চুপ করলাম। চুপ করে মদনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও কাঁদতে আরম্ভ করেছে। কান্নার শব্দ নেই। চোখে জল আসছে আর হাতের পিঠ দিয়ে ক্রমাগত তা মুছতে চেষ্টা করছে।

'তা কর্তা আসুক—' মা বলল, 'একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।' বাচ্চা বোনটা কেঁদে উঠতে মা ঘুরে বসল।

চোখ মোছা শেষ করে মদন আমার দিকে তাকায়। আমিও ওর মুখ দেখি। একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ওর ঠোঁটের ধারে উঁকি দেয়। সম্ভবত আমার ঠোঁটের কিনারেও এমন একটা রেখা জেগেছিল। বস্তুত আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না অতবড় বাড়ির চাকর আমাদের বাড়িতে চাকরি করবে। তেতলা বাড়ি, মোটরগাড়ি, রেডিও, আরও তিনটে চাকর-চাকরাণী, হইচই খাওয়া দাওয়া—আমাদের ছোট উঠোন, টালির ঘর, কেরোসিনের আলো, টিমটিমে ঠাণ্ডা সংসার।

সন্ধ্যার দিকে বাজারের থলে হাতে ঝুলিয়ে বাবা ঘরে ফিরল।

আমি আমার ছোট্ট ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসার উদ্যোগ করছি। মদন বাইরে পইঠার অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। দুটো পয়সা দিয়েছিল মা ওকে। সেই

সকালের ট্রেনে দুটো পান্তা খেয়ে দেশ থেকে ট্রেনে চেপেছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। তার ওপর সবে ব্যারাম থেকে উঠে এসেছে। পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনে খেয়ে মদন অন্ধকারে বসে ঝিমোচ্ছিল, মাঝে মাঝে চড়-চাপড় দিয়ে গা থেকে মশা তাড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি কান পেতে ছিলাম বাবা কি বলে শুনতে। হাত মুখ ধুয়ে বাবা বিশ্রাম করতে বসে। মা উঠে চা তৈরী করে দেয়। বস্তুত এই খারাপ শরীর নিয়েই মাকে রান্না ও ঘরের আরও পাঁচটা কাজ করতে হচ্ছিল। চা খেতে খেতে বাবা সব শুনল। শুনে হাসল।

'কেন তিনটে লোক আছে, ড্রাইভার আছে, বাগানের কাজ করতে বাইরের একটা লোক রাখা হয়েছে—না হয় আর-একটা—কত বয়স, আমাদের মিণ্টুর চেয়ে বড় হবে না—কি নাম যেন ছেলেটার? মদন। পুরনো লোক ওদের—এভাবে ওকে মুখের ওপর "না" করে দিলে?' একটু থেমে বাবা শেষ করল, 'বড়লোক কি আর গরীবের দুঃখ বোঝে! এখন বেচারা যায় কোথায়।'

মা যেন ও-ঘর থেকে আরও কি বলল।

বাবা চিন্তা করছে। বুঝতে পারলাম বাবা চিন্তা করে দেখছিল সবটা বিষয়।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে চৌকাঠের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। মদন বাবার পায়ের কাছে চুপ করে বসে আছে। বলতে কি মদনের জন্য আমার বুকের ভিতর ভয়-ভয় করছিল। যদি বাবা 'না' বলে বসে, যদি বাবা বলে যে—

'কত মাইনে দিত ওরা বললি?'

'দশ টাকা'।

'আর দু'বেলা ভাত দু'বেলা জলখাবার?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মদন ঘাড় কাত করল। বাবা আবার চিন্তা করছে। মা ছোট বোনটাকে দুধ খাওয়ায়। মার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা প্রশ্ন করে,

'তুমি কি ওষুধটা খেয়েছিলে?'

মা মাথা নাড়ে।

'ওষুধটা ভাল। ওইটুকুন শিশি। ছ'টাকা দাম। তা ভাল জিনিষ। খাও। নিয়মিত খেতে থাকলে শরীরে বল পাবে।' ব'লে বাবা আবার মদনকে দ্যাখে। তারপর :

'আমি গরিব। কেরাণী মানুষ। অত মাইনে দিতে পারবো না। অথচ একটা লোকও চাই। মিণ্টুর মার শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। তা বাপু—'

মা মদনের মুখ লক্ষ্য করছে। আমিও তাকিয়ে আছি ওর দিকে। মদন ঘাড় হেঁট করে নখ খুঁটছে।

বাবা বলল, 'দু'বেলা ভাত খাবে—আর সকালে বিকালে ওই একটু চা রুটি—আমাদের যা হয়—আর আর—' হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বাবা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

অর্থাৎ বাবা ইতস্তত করছিল। একটা বাড়তি লোকের খোরাক জুগিয়ে অতিরিক্ত দুটাকা একটাকা ঘর থেকে বার করে দিতেও বাবার কষ্ট হবে আমার জানতে বাকি ছিল না। অনেক কষ্ট করে বাবা মার জন্য একটা ওষুধ কিনে এনেছে। আমার স্কুলের দু মাসের মাইনে জমে গেছে। বাবা এসবই চিন্তা করছিল, মুখ দেখে বুঝলাম।

মা মদনের দিকে তাকাল।

'দশ টাকা মাইনে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না বাপু,—তিন টাকার বেশি পাবে না।'

অবাক হয়ে দেখলাম, মদন তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছে।

বাবা খুশী হল।

'তা ছাড়া কাজকর্ম আমার সংসারে আর তেমন কি—অতিথি-অভ্যাগত নেই, বাইরের লোক নেই। তিনজন তো আমরা মানুষ।'

মদন আবার ঘাড় কাত করেছে। হ্যারিকেনের আলোয় চোখে পড়ল ওর মুখে হাসি ফুটেছে। মানে, তাতেই সে রাজী। মদন আমাদের বাড়ীতে থেকে গেল। আমার এত ভাল লাগছিল!

বড় বড় চারটে ডুমুরের ডাল কেটে ফেলল মদন। আকাশটা ফরসা হয়ে গেল। আমার পেঁপে চারাটা ফট্‌ফটে রোদের মুখ দেখে হাসতে লাগল।

'এইবেলা গাছটার জোর বাড় হবে,' মদন বলল, 'ওই ডুমুরের ডাল দিয়ে আমি বেড়া তৈরী করে দেব—ছাগল গরু এসে মুখ লাগাতে পারবে না।'

'আরো দু-চার রকমের চারাগাছ এনে পুতব,' আমি বললাম, 'জমিতে এখন রোদ লাগছে, এখন গাছ বাড়বে।'

'তার জন্যে চিন্তা কি—আমি যখন এসে গেছি আর চিন্তা নেই, আমি হরেক রকমের চারা এনে লাগিয়ে দেব।' খুশী হয়ে মদনকে চুমো খাবার মতন আমার মনের অবস্থা। সকালে মাকে বাটনা বেটে দিয়ে, জল তুলে দিয়ে, ঘর বারান্দা ঝাঁট দিয়ে একটু অবসর হতে ও ছুটে এসেছিল রান্নাঘরের পিছনে। পেঁপেচারাটা ছায়ায় ঢেকে আছে দেখে তখনি ও কাটারি হাতে করে ডুমুর গাছে উঠেছে। রোগা শরীর। পা দুটো ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল। ভয় পেয়ে আমি নীচে দাঁড়িয়ে বলছিলাম, 'সাবধান, দেখবি পড়ে টড়ে না যাস!' গাছের ডালে কাটারির কোপ বসাতে বসাতে মদন বলছিল, 'আমরা চাষীর ছেলে, হুট করে কি গাছ থেকে পড়ে যাই—' আমি আর কিছু বলিনি।

এতবড় চারটে ডাল কাটা হয়েছে দেখে বাবা চোখ কপালে তুলল। 'এটা করলি কি মদন, বাড়ীর আব্রু নষ্ট করে ফেললি।'

মা পিছনে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। বাবা যখন ডুমুর গাছের অবস্থা দেখে খুব একটা হায় আফসোস করতে আরম্ভ করল, তখন মা মুখ থেকে আঁচল সরাল : আমি তো বুড়ো হতে চললাম, তোমার ছেলের বৌ আসতে এখনো ঢের দেরি। অত আব্রু রাখার দরকার কি—তাছাড়া—

যেন একটু অবাক হয়ে বাবা মার মুখ দেখছিল।

মা বলল, 'তাছাড়া আমাদের পিছনটা তো ফাঁকা। পোড়ো মাঠ। মানুষের মুখ দেখা যায় না। আব্রুর দরকার পড়ে না।'

অর্থাৎ মা যে মদনের কাজটা সমর্থন করল আমি বুঝে গেলাম। কেন করবে না। আমি বাগান করতে চাইছি, আর মদন এ বাড়ির কাজে লাগতে না লাগতে আমাকে সাহায্য করছে, মা কি সেটা ভাল চোখে না দেখে পারে!

তা ছাড়া এমনিও মদন মার খুব বাধ্য হয়ে পড়ল। মা শুধু চোখের ইঙ্গিত করতে মদন এটা এনে দেয়, ওটা বাড়িয়ে দেয়। কয়লার গুঁড়ো জমে ছিল। মাটি এনে মদন নিজে থেকে এত এত গুল তৈরী করে ফেলল। মাকে বলতে হল না। রোদে শুকিয়ে সব গুল নিজেই তুলে রান্নাঘরের কোণায় এনে জড়ো করে রাখল। মা বলল, 'গরিবের ছেলে গরিবের সংসারেই তোকে মানিয়েছে বাবা।'

'ও বাড়ি আমি আর ইয়ে করতেও যাব না।' মদন একটা খারাপ কথা বলতে যাচ্ছিল, মা ধমক দিতে ও চুপ করল। তারপর কি ভেবে মা হাসল : 'কেন ওরা কি তোকে খেতে টেতে দিত না?'

'ছাই দিত!' যেন কথাটা বলতে মদনের মুখ চুলবুল করছিল। 'সরু চালের ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ, ঘন দুধ—এই এত বড় টুকরো মাছের—সব ওরা খেয়েছে। কর্তা খেয়েছে গিন্নী খেয়েছে খোকা খেয়েছে—আমাদের ঝি চাকরের জন্যে মোটা চালের ভাত আর ডাল আর পুঁইচচ্চড়ি—মাসের মধ্যে এক আধদিন কুচো চিংড়ি পেতাম চচ্চড়িতে—আর ডালের কি চেহারা—গঙ্গাজল। এমনভাবে হাত নেড়ে ঠোঁট ঠেকিয়ে মদন সুকুমারদের বাড়ির খাওয়ার বর্ণনা করছিল যে, আমি ও মা একসঙ্গে জোরে হেসে ফেললাম। বাবা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে, কেউ দেখতে পাইনি।

বাবা ধমক লাগায়।

'হয়েছে হয়েছে—একজনেরটা খেয়ে এসে নিন্দে করতে নেই—বলে, যার নুন খাব তার গুণ গাব—নিন্দে করা পাপ।' আমাদের হাসি নিবে গেল। মদন চুপ করে রইল। আমি সেখান থেকে সরে গিয়ে আমার পেঁপে গাছের তদারক করতে লেগে

গেলাম। রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি বাবার গলা শুনছিলাম। 'তা অত গুল দেওয়াবার কি দরকারটা ছিল—একটা কচি বাচ্চা পেটের দায়ে নয় এখানে চাকরি করছে—তাই বলে তুমি সব কাজ ওকে দিয়ে সারছ। বুঝলাম মাকে বলা হচ্ছে। মা বলছিল, 'আমি কিচ্ছু বলিনি বরং আমি না করেছি—নিজে থেকে ও মাটি এনে বসে এসব দিয়েছে।'

তারপরও বাবা গুমগুম করে কি বলছিল আমি শুনতে পাইনি। না, একটা বাচ্চা ছেলে রাতদিন খাটুক বাবা যেমন পছন্দ করে না, মা-ও তা চায় না। আমি নিজের চোখে দেখতাম। ঘি, ঘন দুধ, বড় মাছ আমরা কেউ খেতে পেতাম না। মাসের আটাশ দিন ডাল তরকারি শাক চচ্চড়ি হত। কিন্তু তা হলেও যদি মা কোনোদিন পটলটা বেগুনটা ভাজত, কি বড়টড়া করত, আমাকে বাবাকে তো বটেই, মদনকেও দুটো-একটা না দিয়ে মা শান্তি পেত না, ভাত খেতে পারত না। চোখের ওপর তো দেখলাম, মদন আমাদের বাড়িতে কাজে লাগতে না লাগতে মা আমার একটা ছেঁড়া হাফ প্যান্ট সুন্দর করে সেলাই (ভাল বা ছেঁড়া বলতে আমারও অতিরিক্ত প্যান্ট ঐ একটাই ছিল) করে ওকে পরতে দিয়েছে। বাবা সামনের মাসে মাইনে পেলে মদনকে একটা গেঞ্জিও কিনে দেবে, মা এখন থেকেই বলে রাখছে। যদি মা অল্প ক'দিনের মধ্যে ওকে এতটা আদরযত্ন করতে আরম্ভ না করত তো মদনই কি মার এমন বাধ্য হয়ে পড়ত? মার মুখে শোনা, আমি স্কুলে চলে গেলে মদন সারাটা দুপুর মার কাছে বসে থাকে, কাগজ জ্বেলে আমার ছোট বোনের দুধ-বার্লি গরম করে দেয়, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলে ছুটে গিয়ে উঠোনের দড়ি থেকে জামা-কাপড়গুলো তুলে ঘরে এনে রাখে—'মিন্টু আমার ছেলে, তুইও আমার ছেলে।' আমি ক'দিন মাকে বলতে শুনেছি। শুনে ফ্যাকাশে ড্যাবডেবে চোখে মদন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসত।

পাঁচ দিনের মাথায় পেঁপেচারাটার আরো দুটো কুঁড়ি-পাতা দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছ'টা ডাঁটা, আর পুতুলের ছাতার মতো ছোট ছোট ছ'টা পাতা হয়েছে। 'এখন আর চারা না, রীতিমতো একটা গাছ বলা চলে,' ভাবতাম আমি, আর অবাক খুশী চোখে বাদলা হাওয়ায় ছোট ছাতার মতন পাতাগুলোর কাঁপন দেখতাম। মদন ডুমুরের ডাল কেটে সুন্দর একটা বেড়া তৈরী করে দিয়েছে।

'আমি আরো কিছু চারা এনে পুঁতব,' মদন বলত, 'আতা, করমচা, বাতাবিনেবু, পেয়ারার চারা।'

'কোথা থেকে আনবি?' আমি বলতাম, 'পারবি যোগাড় করতে? বৌবাজারে এসব চারা পাওয়া যায় রথের মেলায়। এখন তো রথ শেষ হয়ে গেছে।'

'আরে ধেৎ, রথের মেলা—কিনে আনব নাকি? এমনি সব নিয়ে আসব।'

'কোথা থেকে শুনি?' উৎসাহে খোলা বই ফেলে রেখে আমি মদনের বিছানায় গিয়ে বসতাম। আমার পড়ার ঘরেই দুজনের শোবার জায়গা। পাশাপাশি বিছানা। বাবা-মা খেয়ে ও-ঘরের দরজায় খিল এঁটে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ত। বেশ একটু রাত জেগে আমি পড়তাম। মদন আমার পড়া শুনতে শুনতে কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনোদিন একটা-দুটো কথা শুরু করে পরে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাবা-মা শুনতে না পায়, এমনভাবে নিচু গলায় দুজন কথা বলতাম।

'তুই কি পেয়ারা করমচার চারা দেখে এসেছিস কোথাও?'

'আমি কি এ পাড়ায় নতুন,' মদন প্রশ্ন শুনে চাপা গলায় হাসত, 'কার বাড়িতে কোন্ গাছ আছে আমি সব জানি।'

'শুনি না কোথা থেকে করমচার চারা যোগাড় করবি?' আমি তখন মদনের বালিশে মাথা রেখে তার পাশে শুয়ে পড়েছি।

মদন আমার পেটের ওপর হাত রাখে, তারপর আমার কাছে মুখ এনে কথাটা বলে, শুনে আমি চুপ করে থাকি। একটু ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলি, 'এমনি তো দেবে না ওরা, চুরি করে আনতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো—চুরি করব। সুকুমারদের বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে বাগানের সব ফল আর মূলের চারা নিয়ে আসব। যেগুলো আনতে পারা যাবে না, ভেঙে মুচড়ে নষ্ট করে রেখে আসব।'

উত্তেজনায় মদন তখন উঠে বসেছে।

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'চুরি করে ওসব আনলে মা রাগ করবে।'

'মাকে বলতে গেছি নাকি, চুরি করে এনেছি কি দেখিয়ে এনেছি?' মদন আমার পেটে চিমটি কাটল। 'রাত থাকতে উঠে আমরা বেরিয়ে পড়ব, কেমন?'

আমি ঘাড় নাড়ি। কি ভেবে একটু পরে বলি, 'সুকুমারের ওপর তোর খুব রাগ, কেমন? ওর মা তোকে আর ও-বাড়ি রাখল না বলে?'

'বয়ে গেছে ও-বাড়ির কাজ করতে।' ভেংচি কেটে মদন আমার কথার উত্তর দেয়। একটু চুপ থেকে পরে : 'রাগ থাকবে না? রোজ ইস্কুলে যাবার সময় সুকুমার পায়ের জুতোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলত, বুরুশ করে দে। লাটসাহেবের ছেলের জুতো বুরুশ করতে করতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে যেত—আর আজ কিনা বলে এখানে তোর সুবিধে হবে না, অন্য বাড়িতে কাজ পাস কিনা দ্যাখ গে।'

'সুকুমারও বলেছে এ-কথা?'

'তবে।'

যেন মদনের চোখে জল এসে পড়েছিল। আলো নিবিয়ে শুয়ে শুয়ে সেদিন সুকুমারের চেহারাটা মনে করছিলাম। ব্যারিস্টারের ছেলে। ভাল জামা-জুতো পরে স্কুলে আসে। আমার সহপাঠী। কিন্তু তা হলে হবে কি—সুকুমার আমার সঙ্গে ভালো করে মিশবে দূরে থাক, কথাই বলে না। আমার সঙ্গে না, হাবুলের সঙ্গে না, সনাতনের সঙ্গে না। ওর বন্ধু অংশু অনুপম-নীহার। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। আমরা খালি পায়ে স্কুলে আসি। আমাদের জামা-প্যাণ্ট ময়লা ছেঁড়া—

ভাল হবে, খুব ভাল হবে। মদনের প্রস্তাবটা মাথায় ঘুরছিল। ওদের বাগানের সব ফলের গাছ, ফুলের গাছ যদি ছিঁড়ে ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দেয়া যায়, বেশ হয়।

অন্ধকারে একসময় মদন আমার কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনে।

'ঘুমিয়ে পড়লি?'

'না।'

'সুকুমারের বাবা রোজ বাড়িতে মদ খায়।'

'ধেৎ!' আমি অল্প হাসলাম।

'হ্যাঁরে—ওদের টাকা-পয়সা থাকবে না। গাড়ি-বাড়ি সব বিক্রি হয়ে যাবে।' মদন থমথমে গলায় বলল, 'ওরা যদি আমাদের মতন গরিব হয়ে যায় তবে খুব মজা হয়, কেমন না?'

অন্ধকারে মাথা নেড়ে আমি উত্তর করলাম, 'তা হয় বটে।'

দু'দিন আমরা চেষ্টা করলাম। কিন্তু দু'দিনই ব্যর্থ হলাম।

শেষ রাত্তিরের অন্ধকার টিপটিপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা সুকুমারদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কি, অমনি মোটা লাঠি বাগিয়ে বাগানের মালী আমাদের তাড়া করেছে। আর সুকুমারদের কুকুরটা! বাঘের মতন লাফিয়ে মদনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত ; কোনোরকমে ছুটে পালিয়ে এসেছি।

'কত বড় একটা পেয়ারা, দেখলি তো!' বাড়ি ফিরে মদন আফসোসের গলায় বলত, 'একবার যদি পাঁচিলের ওপর উঠতে পারতাম, পাঁচ-সাতটা পেয়ারা আনা যেত।'

'থাক গে—শেষে ধরা-টরা পড়ে—' আমি মদনকে সান্ত্বনা দিতাম। কিন্তু মদন চুপ করে থেকে যেন ও-বাড়ির বাগানের ডাঁশা পেয়ারাগুলোর কথা ভাবত। নর্দমার পাশে একটা মাধবীলতার চারা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পেঁপে গাছের গুঁড়ি থেকে আধ

হাত দূরে সরিয়ে চারাটা পুতলাম। মদনকে বললাম, 'তুই দু' মগ জল এনে ঢেলে দে। আমি একটা বাঁশের কঞ্চি কোথাও পাই কিনা দেখি। লতাটা তরতর করে বেয়ে উঠবে।'

বাঁশের কঞ্চি নিয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম মদন তেমনি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কি ভাবছে। ওদিকে মা মদনকে ডাকছে কয়লা ভেঙ্গে দিতে। মদন নড়ছে না, সাড়া দিচ্ছে না। এক-পা এক-পা করে মা রান্নাঘরের পিছনে চলে আসে। 'বেলা হয়েছে উনুন ধরাতে হবে, তোরা কি কেবল বাগানের পিছনে লেগে থাকবি।' কিন্তু মার কথা শুনে মদন মুখ তুলল না। 'তোর কি হয়েছে, ভূতে পেয়েছে?' মা হাসে।

হুট করে আমার থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম মদন অসন্তুষ্ট হল আমার কথা শুনে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল একবার।

শুনে মা হাসছিল : 'ছিঃ, পরের জিনিসের ওপর লোভ করতে নেই। এমন একটা খুব ভাল জিনিস না পেয়ারা।'

তারপরও মদন মুখ নিচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। উঠোনে বাবার খড়মের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে মার কয়লা ভাঙতে গেছে।

না পেয়ারা না, ভাবছিল সে ভূষণের কথা। সুকুমারদের বাগানের মালী। 'ওর সেবার জ্বর হয়েছিল, আমি নিজের হাতে কয়লা ভেঙে উনুন সাজিয়ে ওর উনুন ধরিয়ে দিলাম, সাগু জ্বাল দিয়ে দিলাম। আর আজ শালা আমায় লাঠি নিয়ে তেড়ে মারতে আসে!'

আমি হাসি : তুই তো আর এখন ওদের চাকর নস—ও-বাড়ির কেউ না তুই—কাজেই।'

'বটে!' দাঁত কিড়মিড়িয়ে মদন ভেংচি কাটে। 'ওই শালা ভূষণের মাথাটা আমি ইঁট মেরে ভেঙে দেব।'

'না না ওসব করতে যাবি নে, খামোকা একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি।' আমি মদনকে বুঝিয়ে বললাম, 'জানতে পারলে বাবা রাগ করবে। বাবা গণ্ডগোল পছন্দ করে না। সাদাসিধে মানুষ, নিরিবিলি থাকতে চায়।' বলে আমি স্কুলে চলে গেলাম। কিন্তু মদন আমার কথা শুনল কি? যেন ও বাড়ির ওপর তার আক্রোশের আর শেষ ছিল না। হ্যাঁ, তখন বিকেল, বেশ জোরে বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে, রাস্তায় জল জমেছে। আমরা স্কুল থেকে ফিরছি। আমি হাবুল সনাতন পিছনে হাঁটছি। আগে আগে চলেছে সুকুমার আর তার বন্ধুরা। হঠাৎ দেখলাম বিপরীত দিক থেকে আমাদের মদন সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। সম্ভবত মা মুদি দোকানে কিছু কিনতে পাঠিয়েছে ওকে।

মদন নিশ্চয় সুকুমারদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে হাবুলের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তবে দোকানের দিকে যাবে চিন্তা করলাম। কিন্তু চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী ব্যাপার ঘটল। ইচ্ছা করেই মদন এটা করল, সবাই বুঝল। পা দিয়ে রাস্তার জল ছিটিয়ে সুকুমারের সাদা ধবধবে সাটিনের শার্ট প্যান্ট নোংরা করে দিয়ে মদন ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু যাবে কোথায়। সুকুমারকে দেখে শুনে বাড়ি নিয়ে যেতে একটু দূরে দূরে যে ভূষণ মালীও হাঁটছিল, মদন নিশ্চয় দেখতে পায়নি। ছুটে গিয়ে ভূষণ মদনকে ধরে ফেলল। সুকুমার আর তার বন্ধুরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। মদনকে হিড়হিড় করে ভূষণ সুকুমারদের বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল, আমি আর আমার বন্ধুরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখলাম।

কথাটা মা শুনল। অফিস থেকে ফিরে বাবা শুনল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর রাত। রাত আটটা পর্যন্ত বাবা আমাদের বাড়ির সামনে বড় কাঁঠাল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়েছিল।

বাবা একসময় ঘরে ফিরতে মা বলল, 'তুমি কি একবার যাবে ও বাড়ি? নিশ্চয় ছেলেটাকে বেঁধেটেধে রেখেছে। এখন পর্যন্ত ফেরার নাম নেই।'

'রাখুক বেঁধে।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল, 'যেমন কর্ম করেছে তার ফল ভোগ করুক। কেন হারামজাদা কাদা ছিটোতে গেল!'

'আহা ছেলেমানুষ, না হয় একটা অপরাধ ক'রেছে,—আর কী তেমন অপরাধ। হয়তো ছুটে যাচ্ছিল বলে—'

আমি মার কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে প্রবল বেগে মাথা নাড়ল।

'বড়মানুষের বাড়ি গিয়ে আমার চাকরের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার—আমারও সম্মানে বাধে। ওদের কাছে ওরা বড়—কিন্তু আমিও শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। আমিও—।' বুঝলাম মদনকে এতটা রাত অবধি আটকে রাখা হয়েছে বলে ভিতরে ভিতরে বাবা খুব উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

মা আর কথা বলল না! কাজকর্ম একলা হাতেই সব সারতে লাগল। বাবা বারান্দার অন্ধকারে বসে তামাক খাচ্ছিল আর ভাবছিল। আর আমি হ্যারিকেনের সামনে বইখুলে মদনের বিছানা, দেওয়ালের হুকে ঝোলানো তার তালিমারা ময়লা হাফপ্যান্ট ও শার্টটা দেখছিলাম। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল।

সত্যিই মদন সে রাত্রে আর এল না।

সকালে চা খেতে খেতে বাবা ও মা ঠিক করল আমাকে একবার ও-বাড়ি পাঠানো হবে মদনের খোঁজ নিতে।

মা বলল, 'ময়লা প্যান্ট ছেড়ে ধোয়া প্যান্টটা পরে নে।'

বাবা বলল, 'অন্য কারো সঙ্গে কথা-টথা বলে লাভ নেই—কেবল সতীশবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবি, মদন কাল বাড়ি ফেরেনি কেন। শুধু জেনে আসবি। আর কিছু বলতে হবে না।'

'জিজ্ঞেস করলে বলবি বাবা পাঠিয়েছে।'

'না না না।' মার কথায় বাবা আবার প্রতিবাদ করে উঠল। 'বলবি মা পাঠিয়েছে। আমি কেন! আমি এ ব্যাপারে নেই। হয়তো ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে, কি গেছে। কিন্তু বাড়ির কর্তা—মানে পুরুষ মানুষ খোঁজখবর নিচ্ছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে, জটিল হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মেয়ে মানুষের মধ্যেই থাক এটা—বুঝলে না? সেজন্যই তো আমি মিন্টুকে সুকুমারের কাছে পাঠাচ্ছি।'

অল্প হেসে মা বলল, 'আচ্ছা'।

মানে, বাবা রাগ দুঃখ দুশ্চিন্তা অভিমান—মনে মনে যাই পোষণ করুক না কেন, বাইরে সব বিষয়ে নিরিবিলি মুক্ত থাকতে চায়। মদনের ব্যাপারে আর একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল, বুঝে মা আর উচ্চবাচ্য করল না।

কেবল আমি যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মা চিরুনি দিয়ে আমার চুলটা ঠিক করে দিল। বলল, 'সুকুমারের সঙ্গে কথা-টথা বলে কাজ নেই—কি বলতে কি বলে দিয়ে তুই আবার ঝগড়া-টগড়া বাধিয়ে আসবি।'

আমি বললাম, 'না বলব না।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হল না। সুকুমারদের গেট-এর সামনে সিউলি গাছের তলায় আমি থমকে দাঁড়াই, মদনকে পেয়ে গেলাম। কিন্তু মদন খুব ব্যস্ত। বালতি করে ভিতরের চৌবাচ্চা থেকে জল বয়ে আনছে। সুকুমারদের গাড়ি ধোয়ানো হচ্ছে। ভূষণ গাড়ি ধোয়াচ্ছে। ড্রাইভার হারাণ দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে। বেশ বড় বালতি। গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে বালতিটি নামিয়ে রেখে মদন হাঁপায়। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, ও ফিক করে হাসে।

'আমি এ বাড়ির কাজে লেগে গেছি।'

'কবে থেকে?' বেশ আস্তে বললাম।

'ওই কাল বিকেল থেকেই।' হলদে দাঁত ক'টা বার করে মদন তেমনি হাসতে থাকে, 'আমায় কিচ্ছু বলল না গিন্নীমা—বরং ভূষণকে গালমন্দ করেছে। ছেলে মানুষ ছুটতে গিয়ে জল ছিটিয়েছে—তা বলে—'

আমি ফিরে আসছিলাম।

'মদন বলল, 'শোন। তোর মাকে বলবি, আর আমি তোদের বাড়ির কাজ করব না। এখানে লেগে গেছি। গিন্নীমা কাল রাতে বলল ওরা গরিব মানুষ। নিজেদেরই চলে না, তো ও বাড়িতে তুই থাকবি কি।'

আমি ফিরে এলাম।

মা শুনল। বাবা শুনল।

শুনে তারা একটা কথাও বলল না।

আমি মুখ ভার করে রান্নাঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পেঁপে গাছ আরও দুটো নতুন পাতা মেলেছে। মদনের হাতের তৈরী ডুমুরের ডালের বেড়াটা দেখছিলাম, কিন্তু আমি কি তখন জানতাম, মদন গেছে—আমার পেঁপে-চারাটাও আর থাকবে না।

তিনদিন পর শেষ রাত্রে আবার জোর বর্ষা নামল। সে কী বৃষ্টি! যেন জল ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না। কতক্ষণ আর ঘরে আটকে থাকা যায়। সেই অন্ধকার থাকতে জেগে বিছানায় বসে ছিলাম। হ্যাঁ, তখন বেলা আটটা বেজে গেছে। বৃষ্টির জোরটা একটু কমেছে কি, আমি হুট করে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে সোজা রান্নাঘরের পিছনে চলে গেলাম। আমার বাগানের অবস্থা কি হয়েছে দেখতে ভীষণ মন কেমন করছিল। কেননা উঠোনে জল জমেছে। রান্নাঘরের পিছনটা ঢালু। সেখানে কত জল দাড়াল, পেঁপে গাছ মাধবী-চারা ডুবে গেল কিনা এবং যদি তা-ই হয়, জলটা সরাবার কি ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে আমি বৃষ্টি মাথায় করে ডুমুরতলায় ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাগানের চেহারা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পেঁপে চারাটা নেই, মাধবী-লতাটা জলে কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে। ডুমুরের বেড়াটা তছনছ হয়ে আছে। আমার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হল। বারান্দা থেকে মা ডাকছিল, বাবা ডাকছিল : 'ভিজিস্‌নে জ্বর হবে, জ্বর হবে, চলে আয়, চলে আয়।'

'আমার পেঁপে গাছটা নেই।' চিৎকার করে উঠলাম।

'জলে ভাসিয়ে নিল কি?' মা বলল, 'উঠানের সব জল তো নদীর স্রোত হয়ে ঘরের পিছনে ছুটছিল—'

'বেড়া ভেঙে গেছে। যেন কে ভেঙে দিয়ে গেল।' বলতে বলতে আমি বাগান ছেড়ে ঘরের পইঠায় উঠে এলাম।

'তাই বলো, বেড়াও ভাঙা পেঁপে চারাও নেই।' বাবা গম্ভীর হয়ে মুখ থেকে হুঁকো সরিয়ে আমার দিকে না, মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই হারামজাদা গরুটা নিয়ে গেছে। শেষ রাত্তিরে একটা খচখচ শব্দ শুনলাম না রান্নাঘরের পিছনে?'

'আমি শুনিনি শব্দ।' মা আমার দিকে মুখ ফিরাল, 'হবে হয়তো, যদি জলে ভাসিয়ে নিত এদিক-ওদিক কোথাও থাকত তো, এতবড় গাছটা তো অদৃশ্য হয়ে যেত না। ঐ গরুর কর্ম।'

'একেবারে গোড়াসুদ্ধ খেয়ে গেছে। যেন উপড়ে তুলে সবটা গাছ মুখে নিয়ে সরে পড়েছে।' আমি কান্নার সুরে বললাম, 'একটা শেকড় পর্যন্ত রেখে যায়নি।'

মা চুপ করে রইল। বাবা আবার মুখে হুঁকো তুলল।

'কত যত্ন করে গাছের সবটা ঘিরে মদন ডুমুরের ডাল পুঁতে বেড়া করে দিয়েছিল—যেন নিজের মনে বললাম আমি। শুনে মা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। বাবা নির্বিকার। আমার ওই বাগানের সঙ্গে যে মদনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, মা তা স্বীকার করল। মার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দে তা বুঝলাম। কিন্তু বাবা যেন কথাটাকে তেমন আমল দিচ্ছিল না।'

'যা যা এখন পড়তে যা—সামনে পরীক্ষা।'

বাবার ধমক খেয়ে গাছের শোক বুকে পুষে এক-পা এক-পা করে পড়ার ঘরে চলে এলাম।

হ্যাঁ, তারপর ছ'মাস গেছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ। শীতের দুপুর। হঠাৎ আবার কি করে যে সুকুমারের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল বলা শক্ত। আমার মনে হয় 'ডিটেকটিভ' গল্পের বইটা। আমার এক মামাতো ভাই বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসে বইটা আমাকে দিয়ে গেছে। কি করে যেন সুকুমার জানতে পেরেছিল। একদিন হুট করে গল্পের বই নিতে আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। একটু অবাক হলেও তৎক্ষণাৎ তাকে বইটা পড়তে দিলাম। তারপর আর কি। ও আমাদের বাড়িতে এল যখন আমাকেও ভদ্রতা রাখতে ওদের বাড়ি যেতে হল। এবং এটা সবাই স্বীকার করবে, দীর্ঘকাল ঝগড়াঝাঁটি চলার পর যখন ঐ বয়সের দুটি ছেলের মধ্যে ভাব হয় তখন তা দেখতে বড় বেশি গাঢ় নিবিড় হয়ে ওঠে।

যেন সুকুমার আমাকে না দেখে থাকতে পারে না, আমি তাকে না দেখে শান্তি পাই না। ওর বাড়ির ঘরে বসে দু'জন গল্প করি, ওদের প্রকাণ্ড ছাদে উঠে বেড়াই, কখনো আমরা বাগানে নেমে যাই।

হ্যাঁ, বাগানের মতো বাগান বটে।

একধারে ফুলের গাছ, একধারে ফলের গাছ।

পাঁচিলের এ-মাথা থেকে আরম্ভ করে ও-মাথা পর্যন্ত বাগানের আর শেষ নেই। কোন্‌টা কলমের চারা, কোন্‌টা বীজের গাছ, সুকুমার আমাকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখায়।

তারপর দুজনে একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়াই। দীর্ঘ কাণ্ড লম্বা ডাঁটা, সতেজ সবুজ ছড়ানো পাতা নিয়ে একটা সুন্দর পেঁপে গাছ। ফলতে আরম্ভ করেছে। ওটা এনে লাগিয়েছে মদন—আমাদের চাকর—এইটুকুন গাছ ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল। সুকুমার বলছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গাছটা দেখলাম। যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। সুকুমার আমার হাত ধরে বলল, 'চল এখন ও পাশটা ঘুরে দেখা যাক।'

বাগান দেখা শেষ করে গল্প করতে করতে দুজন যখন সুকুমারদের বাঁধানো উঠোন পার হয়ে ওর বাড়ির ঘরের দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম মদন চৌবাচ্চার ধারে বসে মাথা গুঁজে চায়ের কাপ প্লেট ধুচ্ছে। ও আমায় দেখতে পায়নি। যদি মুখ তুলে তাকাত আমি নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

বাড়ি ফিরে কথাটা মাকে বললাম না।

আমার মনে যে কষ্ট লেগে রইল, মাকে আর তার ভাগ দিয়ে কি হবে ভেবে চুপ করে রইলাম।

কেবল চাকরি না, আমাদের রান্না ঘরের পিছনের ছায়ায় ঢাকা স্যাঁতসেতে জমির চেয়ে ও-বাড়ির রোদোলো বিশাল বাগানের মাটি ওর কাছে প্রিয় হবে, তাতে অবাক হবার কি আছে। কিন্তু অবাক লাগল নিজের কাছে, মদনের ওপর আমি এতটুকু রাগ করতে পারলাম না। তারপর যখনই সুকুমারদের বাড়িতে গেছি আমি সরাসরি ছুটে গেছি ওদের বাগানে। সতেজ সবুজ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত দীর্ঘছত্র পেঁপে গাছটা আমাকে বড় বেশী টানতে লাগল। সকাল নেই বিকাল নেই সুকুমারের হাত ধরে পেঁপে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,—এদিকে সুকুমারের সঙ্গে গল্প করি—কিন্তু আমার চোখ ওদিকে—যেন গাছটাকে দেখে দেখে আর আশ মিটত না।

একদিন দুপুরবেলা গাছটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর কেমন ভয় ঢুকল। মাঝখানে গল্প থামিয়ে আমি সুকুমারকে বললাম 'চলি রে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে ও আমাকে দেখছিল। কিন্তু ওর দিকে আর না তাকিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলাম। তখনও বুকের ভয়টা ডেলা পাকিয়ে আমার গলার কাছে ঠেকে ছিল। মদন পেঁপে চারাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপেচারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে

গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, না হলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর, ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন। বাড়ি ফিরে মার পায়ের কাছে চুপ করে বসে রইলাম।

'কি হল।' মা প্রশ্ন করছিল।

আমার চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

'কাঁদছিস কেন!' ব্যস্ত হয়ে মা শুধোয়। আমি কথা বলি না। আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও-বাড়ির শাড়ি গয়না পরা প্রগল্‌ভ স্বাস্থ্য সুকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কখন তিনি সাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও সুকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম—থাকতে আরম্ভ করেছি।

আর কোনোদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি।

চড়াই-উৎরাই

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সকালের ডাকে দুখানা চিঠিই একসঙ্গে পেলাম।

একসঙ্গে এলেও দুখানার মধ্যে কোন রকম সাদৃশ্য ছিল না, একখানা এনভেলাপ, আরেকখানা সাধারণ সরকারী এনভেলাপ নয়, কাঁঠালীচাঁপা রঙের বড় লেফাপা, বাঁ দিকে কোণাকুণিভাবে লেখা 'শুভবিবাহ'। সেইখানাই আগে খুলে দেখলুম, নিজের ও-পাঠ শেষ হয়েছে অনেকদিন, সেদিন নিমন্ত্রণের রঙীন চিঠি আমিও স্বজনবন্ধুদের পাঠিয়েছিলাম, প্রথম দু' এক বছর তার এক আধখানা নিজের ঘরেও ছিল। এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। খোঁজেই বা কে। তবু এখনো যখন প্রজাপতি আঁকা হলদে কি গোলাপী রঙের চিঠি মাঝে মাঝে পাই, রঙ যেন কেবল চিঠির গায়েই লেগে থাকে না ; মনের মধ্যেও তার ছোপ লাগতে চায়।

মনে মনে হাসলুম। কার আবার কপাল পুড়ল। লেফাপা খুলে বের করলাম গোলাপী রঙের চিঠি, দু'চার লাইন পড়তেই বুঝতে পারলাম, সব মনে পড়ে গেল, হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার পরেশ মজুমদারের ছেলে অসিতের বিয়ে, এ বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার কোন প্রত্যাশা ছিল না, কলেজে অসিতের সঙ্গে পড়েছিলাম বছর কয়েক, সেই সূত্রে তখনকার দিনে অল্পস্বল্প ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল, তারপর বহুকাল ছাড়াছাড়ি, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু সেদিন বাড়িওয়ালার এক টাইটেল স্যুটের মোকর্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ফের দেখা হয়ে গেল, চিনবার কথা নয়, তবু অসিত চিনে ফেলল।

'আরে কল্যাণ যে, এস এস।'

কাঁধে হাত দিয়ে বার লাইব্রেরীতে তার সীটে আমাকে টেনে নিয়ে গেল অসিত, সামনের চেয়ারে বসতে দিয়ে বলল, 'তারপর খবর-টবর কি?'

ঘর ভরা প্রবীণ নবীন ব্যারিষ্টার দল। ইউরোপীয় বেশ বাস, কারো মুখে পাইপ ; কারো সিগারেট, অসিতও বছর তিনেক আগে বিলাত ঘুরে এসেছে। দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ সাহেবী পোষাকে চমৎকার মানিয়েছে তাকে, আধ ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবীতে যেন একটু মক্কেল মক্কেলই মনে হল নিজেকে। অসিতের ঠিক বন্ধুশ্রেণীভুক্ত নিজেকে ভাবতে পারলাম না।

কিন্তু কথাবার্তায় ব্যবহারে অসিত ঠিক আগের আমলটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। সিগারেট অফার করল, চা আনাল, তারপর নিজের পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল, 'আঃ ভালো হয়ে ছড়িয়ে-টড়িয়ে বসো। অমন কুঁচকে রইলে কেন, কতকাল পরে দেখা হোল বল দেখি, আছ কোথায় করছ কি?'

বললুম 'বিশেষ কিছু না। তার আগে তোমার কথাই শুনি।'

অসিত হাসল, 'আমারই বা এমন কি বিশেষত্ব। একেবারে ব্রীফলেস নই। বাপের দোহাইতে ব্রীফ কিছু কিছু আসে, বাস, ওই পর্যন্ত, এবার তোমার খবর কি বল।'

'খবর আর কি, এ অফিস থেকে ও অফিসে কেরানীগিরি করে বেড়াচ্ছি। দু-এক বছর অন্তর অন্তর বদলাচ্ছি অফিস।'

অসিত বলল, 'এহ বাহ্য, কাব্য সাহিত্যের খবর-টবর বল শুনি। চর্চাটা এখনো রয়েছে তো।'

বললুম, 'হ্যাঁ ভূতটা এখনো নামেনি ঘাড় থেকে।'

অসিত হাসল, 'সবাইর কাঁধ থেকেই যদি ও ভূত নামে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে নাকি, ভালো কথা মনে পড়ল, একটা কাজ ক'রে দাও দেখি আমার।'

'বল!'

অসিত বলল, 'বন্ধুদের তরফ থেকে বন্ধুর বিয়েতে একটা উপহার-টুপহার গোছের কিছু লিখে দাও দেখি, পদ্য নয়, পদ্য বড় সেকেলে হয়ে গেছে, একেলে মানুষের ভাষা গদ্য, গদ্যেই লেখ, কিন্তু বেশ নতুন রকমের হওয়া চাই।'

বললুম, 'ওসব উপহার-টুপহারের চলন তোমাদের মধ্যেও আছে নাকি?'

'আমাদের মধ্যে মানে?' অসিত হেসে উঠল, 'তুমি বুঝি আর আমাদের মধ্যে নও? না কি বিলেত ঘুরে এসেছি বলে একেবারে কেষ্টবিষ্টু হয়ে গেছি ভেবেছ? না বাবার একখানা বাড়ি আর দু'খানা গাড়ি আছে বলে বুর্জোয়া নাম দিয়ে বেদলে ঠেলছে আমাদের?' অসিত আবার একটু হাসল, 'ভুল করছ, আসল বুর্জোয়া ক্রোড়পতি ক্যাপিটালিস্টরা। আমরা কি, হাতীর কাছে, পিঁপড়ে, তোমরা আমরা বলো না। সব আমরা। সব সমান, সবাই সেই ব্যাকুল চিত্ত মধ্যবিত্ত পিত্তপড়া পেট সেই' অসিত সশব্দে হাসল, 'এ ধরনের কবিতা আজকালও লেখ নাকি? সেই যে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলে? মনে আছে?'

মনে ছিল না, মনে পড়ল। লাইনটা অসিতের মনে আছে দেখে ভালোও লাগল খুব।

বেয়ারা ডেকে ক্লার্ককে খবর দিল অসিত, তারপর তার কাছ থেকে সাদা কাগজ একখানা চেয়ে নিয়ে আমার সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নাও লেখ।'

বললুম, 'এখনি?'

অসিত হেসে বলল, 'তবে কি একমাস বাদে? তোমাদের চালু কলম, ক' মিনিট আর লাগবে লিখতে। পাড়ার ক্লাবের বন্ধুরা ধরে পড়েছে। ভাগ্যক্রমে তোমাকে যখন পেয়ে গেলাম, তুমিই লিখে দাও, না হলে ওরা নিজেরা যা বিদ্যা ফলাবে তা আর কান পেতে শোনা যাবে না, নাম ধাম পরে বলছি, আগে ভিতরকার কথাটুকু চট ক'রে লিখে দাও দেখি।'

চট ক'রে কোন জিনিষ লেখার অভ্যাস নেই, তবু যা হোক দু'চার ছত্র কোন রকমে লিখে দিলাম।

পাইপে আস্তে আস্তে টান দিতে দিতে অসিত বলল, 'বাঃ বেশ হয়েছে। এবার আন্দাজ করো দেখি এ ব্যাপারে আমার রোলটা কি।'

কথার ধরনে আন্দাজ করাটা শক্ত হোল না, বললুম, 'বিয়ে করছ বুঝি?'

অসিত বলল, 'আঃ কোথায় একটু কাব্য-টাব্য ক'রে বলবে, তা নয় একেবারে সরাসরি জেরা করছ, এসো কিন্তু, না এলে ভারি দুঃখিত হব। যথা সময়ে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করব, ত্রুটি মার্জনা কোরো।'

বড় লেফাফার মধ্যে দামী কাগজে সেই বড়লোক বন্ধুর বিয়ের ছাপান চিঠি জবানী অবশ্য বন্ধুর নয় তার বাবার। কিন্তু এক কোনায় অসিত নিজেও এক লাইন লিখে দিয়েছে, অবশ্য এসো। লৌকিকতার পরিবর্তে লেখকের নিজস্ব বইয়ের সেট প্রার্থনীয়।'

ভারি ভালো লাগল, বড়লোক বলে অসিত পুরোন সহপাঠীকে ভোলেনি। চাল-চলনে কথা-বার্তায় সেই আগের দিনের ঘনিষ্ঠতাটুকু এখনো বজায় রেখেছে। বিয়ে গেছে তিন দিন আগে, আজ ওদের সদানন্দ রোডের বাড়ীতে প্রীতিভোজ। সময় বেঁধে দিয়েছে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা।

এবার পোষ্টকার্ডখানার দিকে তাকালাম। সম্বোধনটুকু দেখেই বুঝতে পারলাম এ চিঠির মালিক আমি নই, আমার স্ত্রী। তবু চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। লেখেছে মল্লিকা। আমার পিসতুতো ভাইয়ের শালী। বিয়ের পর আরও একটু সম্পর্ক বেড়েছে। ইন্দিরার খুড়তুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী বিয়ে করেছে মল্লিকাকে। সেই সম্পর্কের জের টেনে মল্লিকা লিখেছে, ভাই ইন্দুদি, কত কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। মনেই হয় না এক শহরে আছি। সেদিন হাজরা রোডের মোড় থেকে দেখলাম আপনাদের। আপনারা ট্রামে যাচ্ছিলেন। খুব কথা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে, তাই বাইরের দিকে তাকালেনই না। খুব ইচ্ছা করে নিজেই গিয়ে একবার দেখা সাক্ষাৎ

ক'রে আসি। কিন্তু কি ক'রে যাব ভাই সময় পেয়ে উঠি না। ছেলেপুলে, সংসারের ঝামেলা, তা ছাড়া উনিও এক মুহূর্ত সময় পান না। প্রেসের চাকরি। ছুটির দিনেও ওভার-টাইমের জন্য বেরুতে হয়। নিজের শরীরও ভালো না। আবার সেই চোখের উপসর্গ বেড়েছে। ভালো কথা, মেডিকেল কলেজে আপনার একজন মামা আছেন না চোখের ডাক্তার? তিনি কি এখনো ঐ কলেজেই আছেন? কিভাবে তাঁকে ধরা যায়। দয়া ক'রে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন একবার? কল্যাণবাবু কেমন আছেন? তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন। আপনিও নেবেন। ইতি—মল্লিকা। —পুনশ্চ আমাদের মনোহরপুকুর রোডের বাসার নম্বর মনে আছে তো? চোদ্দ নম্বর। আপনি বলেন কিনা, চেনা বাড়ীতে চিঠি লেখা অসুবিধা। নম্বর ঠিক থাকে না।

সাধারণ গতানুগতিক চিঠি। ইন্দিরাকে ডেকে হাতে দিলাম, তার সেখানা নিয়েও ইন্দিরা হাত বাড়াল বিয়ের চিঠিখানার দিকে। বলল, 'ওখানা বুঝি দেখতে পারি না?'

বললুম, 'পার, কিন্তু পেরে লাভ নেই। নিমন্ত্রণটা সবান্ধবে, সস্ত্রীক নয়।'

ইন্দিরা বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। সবাই তো আর তোমার মত ভোজনানন্দ স্বামী নয়, যে নেমন্তন্নের চিঠি দেখলেই জিভে জল আসবে?'

চিঠিটা আগাগোড়া একবার পড়ল ইন্দিরা, তারপর বলল, 'বাঃ কনের নামটি তো ভারি সুন্দর—শ্রীমতী রুচিরা। কিন্তু এও দেখছি কালীঘাট। ইচ্ছা করলে ফেরার পথে মল্লিকাদির সঙ্গে তো তুমি দেখা করেও আসতে পার। সদানন্দ রোড থেকে মনোহরপুকুর তো আর বেশি দূর নয়।'

বললুম, 'বরং কাছেই। আজই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে। তেমন কিছু জরুরী খবর-টবর তো আর নেই। যাওয়া যাবে আর একদিন সুবিধা মত। কিন্তু অসিতের বিয়েতে কি দেওয়া যায় বল দেখি।'

ইন্দিরা বস্তুবাদিনী, বলল, 'বড়লোকের বিয়েতে মানানসই কিছু কি আর দিতে পারবো। ফুল আর কবিতার বই দাও সেই ভালো। লেখক মানুষ কোন দোষ থাকবে না। তা ছাড়া তোমার বন্ধুর নির্দেশ তো দেওয়াই আছে।'

অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে যেসব উপহারের জিনিস বাছাই করে ইন্দিরা, তার মধ্যে বই কি ফুলের নামগন্ধও থাকে না। একবার ভাবলুম, ইন্দিরা নিজে নিমন্ত্রিত হয়নি বলেই বোধহয় আজ সস্তায় সারতে চাইছে। মনটা খানিকক্ষণ খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে স্ত্রী পরামর্শই অবশ্য নিখুঁত বলে মনে হোল। মাসের শেষ। বই আর ফুলই ভালো।

সকাল সকাল অফিস থেকে বেরুলাম। খান তিনেক বই আছে নিজের। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। কমপ্লিমেন্টারি কপি যতগুলি প্রাপ্য তার চাইতে

আট দশ কপি বেশিই চেয়ে নিয়ে বিলিয়েছি। আরো চাইতে সংকোচ হোল। খান দুই বই নগদ দামে কিনেই নিলাম অন্য দোকান থেকে। সেই সঙ্গে কিনলাম একখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী আর ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তারপর উঠে বসলাম বাসে।

যদিও বহুকাল যাতায়াত নেই, তবু বাড়ি চিনতে দেরী হোল না। দীপালী উৎসবের মতই আলোয় জ্বলছে অসিতদের সদানন্দ রোডের তেতলা বাড়ি। বহু দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মোটরের সার। সদানন্দ রোডের এ মাথা থেকে ও মাথা গাড়িতে প্রায় ভরে গেছে। একখানা মোটর থেকে জনকয়েক সুদর্শন যুবক আর দুটি চারুদর্শনা মেয়ে নেমে এলেন। বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন বেরিয়ে উঠে বসলেন আর একখানায়। গাড়িতে উঠবার সময় একটি সপ্তদশীর গাঢ় রক্তবর্ণ দুটি দুল দুলে উঠল, সমস্ত আলো যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেই দুল দুটির মধ্যে।

'আরে তুমি যে, কখন এলে। যথাস্থানেই দাঁড়িয়েছ দেখছি।' অসিত পিছন থেকে এসে কাঁধে চাপড় দিল, মুখে মুচকি হাসি। সরু পেড়ে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি, আর সিল্কের পাঞ্জাবীতে চমৎকার মানিয়েছে অসিতকে। বাড়ীর ভিতর থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন, অসিত বলল, 'ইনি আমার বাবা, চিনতে পাচ্ছ? আর আমার বন্ধু কল্যাণ। কলেজে পড়তুম একসঙ্গে। লেখেটেখে আজকাল। অনেকদিন আগে একবার এসেছিল। আপনার বোধ হয় মনে নেই।'

অসিতের বাবা মৃদু হাসলেন, 'নিজের ইনটিমেট ক্লাস ফ্রেণ্ডদের নাম আর মুখই আজকাল এক সঙ্গে মনে পড়ে না আর, তো তোমার সহপাঠী—'

অসিতও হাসল, 'কিন্তু বহুকালের পুরোন ক্লায়েন্টদের নাম তো আপনার কোনদিন ভুল হয় না বাবা, চোহারাও বেশ মনে থাকে!'

পরেশবাবু কোন জবাব দিলেন না, মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আরো একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। পরেশবাবুর এ ব্যস্ততা দেখে বোঝা গেল আগন্তুক বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি। কিন্তু অবাক লাগল পরেশবাবুর বেশবাসের ধরণ দেখে। পরণে খাটো ধুতি, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে সাধারণ চটি। কিছুমাত্র বিদেশীয়ানা নেই। স্বাধীন হয়ে বেশবাসে আচারে আচরণে আমরা তাহলে সত্যিই স্বদেশী হোলাম এতদিনে। ভারি খুশি হোল মন। বিলাতফেরৎদের সঙ্গে তাহলে আমাদের সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান এতদিনে ঘুচল।

অসিত সঙ্গে ক'রে আমাকে তাদের বৈঠকখানা গোছের একটা ঘরে নিয়ে বসতে দিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো ভাই, আসছি ওপর থেকে, আরো বন্ধুরা আছেন ওখানে। একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

ঘরখানা জনবিরল। ঘরের ভিতর দিয়ে লোকজন দলে দলে যাতায়াত করছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ মনে পড়ল বইগুলিতে নাম লিখে আনা হয়নি। এই ফাঁকে লিখে ফেলা যাক।

লিখতে শুরু করছি এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'এই যে, আপনি বসে বসে কি করছেন এখানে? চলুন, চলুন, ওদিককার প্যাণ্ডেলে চলুন। সবাই গেছেন ওখানে।'

চেয়ে দেখি অসিতদের সেই ক্লার্কটি। প্রায় পরেশবাবুরই মত বয়স। কিন্তু বেশবাসটা মোটেই পরেশবাবুর মত নয়। পরণে মিহি ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে পালিশ করা শু, সোনার বোতাম চিক চিক করছে বুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন'।

বিব্রত হয়ে বললুম, 'যাব? কিন্তু এগুলি?'

'ওগুলি কি। ও বই?' ভদ্রলোক হাসলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। এগুলির না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

ইতিমধ্যে একদল বন্ধুর সঙ্গে অসিত নেমে এলো দোতলা থেকে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর একটু বসো, এঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এক্ষুণি আসছি।'

বেশি দেরী করল না অসিত। মিনিট কয়েক বাদে আরো পনের বিশ জন বন্ধুকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এসো এবার।'

পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। দোতলার বড় একখানা হল ঘরে ফুলশয্যার আসর বসেছে। ঘর তো নয়, গোটা একটা নার্সারী। দক্ষিণের দেয়ালটি চাল-চিত্রের মত সাজানো হয়েছে বিচিত্র ফুলে। তার নিচে চৌদোলায় সালংকারা সুন্দরী বধূ। স্মিতমুখে স্বামীর বন্ধুদের উপহার গ্রহণ করছেন, নমস্কার বিনিময় হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বাঁদিকে আরো কয়েকটি সুশ্রী তরুণী। বোধ হয় অসিতের বোনেরা, ভাগ্নী, ভাইঝিরা। একটি মেয়ে বউয়ের হাত থেকে উপহারগুলি নিয়ে একপাশে জড়ো ক'রে রাখছেন আর একজন দাতা আর দানের নাম লিস্ট করছেন, খাতায়। ডানদিক কিউ করে অসিতের বন্ধুশ্রেণী। আমিও দাঁড়িয়ে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে একে একে অসিত বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। সুশীতল সেন, ব্যারিস্টার, সমীরণ মুখোপাধ্যায়, এ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, সুদর্শন দাশগুপ্ত, জজ; আরো বহু এ্যাডভোকেট, ব্যারিষ্টার, মুনসেফ, উকিল, প্রফেসারদের পরে আমারও পালা এল।

অসিত বলল, 'কল্যাণ সেন। আমার লেখক বন্ধু।'

বইগুলি হাত থেকে নিতে নিতে অসিতের স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'লেখক'।

অন্য কয়েকটী মেয়েও বিস্ময়ে, কৌতূহলে চাইলেন এদিকে।

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

রুচিরা লজ্জিত হাস্যে বললেন, 'বিশ্বাস না হবার কি আছে।'

অসিত হেসে আমার দিকে ফিরে তাকাল, যাক, এ যাত্রা উৎরে গেলে। ঠকে ঠকে আজকালকার পাঠক-পাঠিকারা অনেক সেয়ানা হয়ে গেছে। বইয়ের নায়কের রূপ গুণের সঙ্গে তারা লেখককে মিলিয়ে দেখে না।'

অসিতের আর এক বন্ধু মন্তব্য করলেন, 'তাই বলে নিজেদের সঙ্গেও কি মেলাবার জো আছে? মেলাতে হয় রাঁধুনী, চাকর, কুলী-মজুরদের সঙ্গে। লেখকেরা আরো সেয়ানা হয়েছেন আজকাল।' তিনি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বন্ধুদের আর একটি ছোট দল এসে দরজায় দাঁড়াল। পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা বেড়িয়ে এলাম।

অসিত বাইরে এসে বলল, 'তারপর? চয়েস কেমন হয়েছে?'

বললুম, 'চয়েস? তবে যে শুনলুম লাভ ম্যারেজ?'

অসিত হেসে বলল, 'নাঃ কেবল লিখতেই শিখেছ। তাতে বুঝি আর চয়েসের বালাই নেই?'

ভোজের আয়োজন হয়েছে বাড়ির লাগা, একটি খোলা জায়গায়। সামিয়ানা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ওপরটা। ফ্যান আর ইলেকট্রিক বালবের নীচে অগুনতি চেয়ার। জজ ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, এ্যাডভোকেট, মিঃ মজুমদারের ধনী মারোয়াড়ী মক্কেলদের ভিড়ে প্যাণ্ডেল ভরে গিয়েছে, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভারও দেখলাম গ্রহণ করেছেন একজন মারোয়াড়ীই। তিনি ভাঙা বাংলায় সবাইকে আপ্যায়ন জানাচ্ছেন। সিগারেটের কৌটো তুলে ধরছেন প্রত্যেকের কাছে। উর্দি পরা বেয়ারারা ট্রেতে ক'রে ভোজ্য, পানীয় বিতরণ ক'রে যাচ্ছে। ভোজ্য স্পেশাল প্রিপারেশনের আইসক্রীম, পানীয় এক কাপ কফি।

দৈবাৎ আমার দুই পাশে বসেছিলেন জন-দুই ম্যাজিস্ট্রেট আর জজ। অসিতের বাবা তাঁর কোন এক কুটুম্বের সঙ্গে তাঁদের যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তাতেই জানতে পারলুম তাঁদের পদস্থতার কথা। কিন্তু ট্রেতে ক'রে বেয়ারা যখন ভোজ্য পানীয় এগিয়ে নিয়ে এল, তিনজনের দু'জনই স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লেন। অসিতের বাবা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'মাফ করতে হবে মিষ্টার মজুমদার, বড্ড পেটের গোলমালে ভুগছি।'

তৃতীয়জন অনেক অনুরোধে এক কাপ কফি তুলে নিলেন। বেয়ারা বুঝি ভেবেছিল এঁদের সঙ্গে যখন বসেছি, আমারও পেটের গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, অসিতের বাবা দেখতে পেলেন,

বেয়ারাকে ডেকে ধমক দিলেন, 'আঃ ; এঁকে দিচ্ছ না কেন? এঁকে দাও, এঁকে দাও', ধমক খেয়ে বেয়ারা ফিরে এসে ট্রে নিয়ে দাঁড়াল।

অসিতের বাবা বললেন, 'নিন, নিন। সংকোচ কিসের অত।'

নিলাম কিন্তু কেমন যেন একটু খিঁচ লাগল। একটু যেন বিরক্তির আভাস আছে মিঃ মজুমদারের গলায়।

শেষ করলাম আইসক্রীম। শেষ করলুম কফি। জজ ম্যাজিস্ট্রেট উঠে গেলেন। পাশে এসে বসলেন আর একজন আইন-ব্যবসায়ী। নেতৃত্ব কেবল বারেই নয়, রাজনীতিতেও। সভা-সমিতিতে বিশেষ যাই না বলে এতদিন সামনাসামনি দেখিনি, কিন্তু কলেজে বহুবার ছবি দেখেছি।

মিঃ মজুমদার শশব্যস্তে এগিয়ে এসে বললেন, 'এলেন।'

শ্রীধরবাবু হাসলেন, 'আসব না ভেবে নেমন্তন্ন করেছিলে বুঝি?'

মিঃ মজুমদার হঠাৎ ভেবে পেলেন না কি জবাব দেবেন। এই সময় আর একটি বেয়ারা ট্রেতে ক'রে এগিয়ে নিয়ে এল ভোজ্য-পানীয়।

শ্রীধরবাবু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

মিঃ মজুমদার বললেন, 'দয়া ক'রে একাট কিছু মুখে আপনাকে দিতেই হবে।'

শ্রীধরবাবু হাসলেন। 'পাগল না ক্ষ্যাপা, আমি কোথাও কিছু মুখে দিই যে এখন দেব? দিতে হয় একটা সিগারেট দাও।'

বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল। এবারো আমার দিকে চোখ পড়ল মিষ্টার মজুমদারের। তারপর বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আঃ তাই বলে ওঁকে দিচ্ছ না কেন? ওঁকে দাও।'

আমি এবার সজোরে ঘাড় নাড়লুম, 'আমি একবার খেয়েছি।'

মিষ্টার মজুমদার বললেন, 'ওঃ তা নিয়েছেন-নিয়েছেন, একবার নিলে যে আর একবার নেওয়া যাবে না তার কি মানে আছে। আপনাদের বয়সে'—মিষ্টার মজুমদার একটু হাসলেন।

এবার আমি উঠে দাঁড়ালুম। এই সময়ে অসিত এসে উপস্থিত হোল প্যাণ্ডেলে। হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিতে গেল শ্রীধরবাবুর—তিনি তার হাত ধরে বাধা দিলেন। হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন একটু।

বললুম, 'অসিত, আমি চলি।'

অসিত বলল, 'ওঃ আমি ভাই আবার আটকে পড়েছিলাম। বোঝাই তো আজ আর কেউ ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু চলবে মানে? কিছু খেলে টেলে না।'

বললুম, 'না না, অনেক খেয়েছি। এবার—'

প্যাণ্ডেলের দোর অবধি অসিত আমার পিছনে পিছনে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে, একবার দেখল। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। অসিত আমার কাঁধে হাত দিয়ে সহানুভূতির স্বরে বলল, 'অনেক যে কি খেয়েছ তা তো জানি। পেটই ভরল না তোমার কী যে সব সাহেবীপনা এদের। দিব্যি লুচিমণ্ডার ব্যবস্থা করবে—তা না পার্টি! এ সব কি আমাদের পোষায়। এ সবে কি আমাদের পেট ভরে? ভারি দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে।' মনে পড়ল কলেজে থাকতে আমাদের আর একজন বন্ধুর বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল অসিতকে। ছাদে কুশাসন পেতে আমরা সব ভুরিভোজনে বসে গিয়েছিলাম ; অসিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, কিন্তু নিজে একটি সন্দেশের বেশি কিছুতেই নেয়নি, বন্ধু প্রফুল্লকে বলেছিল, 'না ভাই, অভ্যাস নেই।'

সেই ভোজসভার দৃশ্য হয়তো অসিতেরও মনে পড়ে থাকবে। আমার জন্য তার দুঃখটা অকৃত্রিম বলেই মনে হোল, তবু ঠিক তৃপ্তি পেলাম না। পেটের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চিন চিন করছিল তা ঠিক। কিন্তু অসিতের কথার পর যেন আর এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

কফিটা বোধ হয় বেশি কড়া হয়ে থাকবে।

বললুম, 'আচ্ছা এবার চলি অসিত'।

'আঃ অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাঁড়াও। দেখি যানবাহনের কোন—'

অসিতের সেই ক্লার্কটি এসে উপস্থিত হোল, 'অসিতবাবু'।

'আবার কি।'

'বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের দাস সাহেবের বাড়ির মেয়েরা পেট্রোল নেই বলে নিজেদের গাড়িতে আসতে পারেন নি। তাঁরা ট্রামে যেতে চাইছেন।

'কারা, শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাগল নাকি! বলুন, আমি নিজে তাঁদের লিফ্‌ট দিয়ে আসছি।'

অসিত আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল, 'দুই সতীন নয়, দুই বোন। তবে প্রায়ই সতীন হব হব করছিল। আর এক জায়গায় বিয়ে ক'রে বেঁচেছি, বাঁচিয়েছিও। তবু লিফ্‌ট না দেওয়াটা ভারি অশিষ্টতা হবে, কি বলো? কিন্তু তুমি করবে কি?'

অবাক হয়ে বললুম, 'আমি তো বাসে যাব।'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ বাসে যাবে না আরো কিছু। বাস ট্রামে আজকাল মানুষ উঠতে পারে? তুমি এক কাজ করো।' হঠাৎ পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বের করল অসিত, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা রেখে দিয়ে বলল, উঁহু, এক টাকায় হবে না বোধ হয়। রিক্সাওয়ালা ব্যাটারা আজকাল ট্যাক্সির ভাড়া নেয়। দু'টাকাই রাখ। মোড় থেকে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যেও। জ্যোৎস্না রাত আছে। টুং টুং করে ছুটবে। ট্যাক্সির চেয়ে অনেক বেশি রোমান্টিক লাগবে দেখ।'

মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে রইলাম, তারপর বললাম, 'ওসবের কিছু দরকার নেই অসিত। আমি বাসে বেশ যেতে পারব।'

অসিত বিরক্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ ঝুলে ঝুলে যেতে যেতে একটা এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়ে বস আর কি। নাও রাখ।'

বলে দু'টাকার নোটখানা আমার ডান দিকের ঝুল পকেটের ভিতরে টুপ ক'রে ফেলে দিয়ে বলল, 'Be worldly my friend, be practical.'

অসিত আর দাঁড়াল না। একটু দূরে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বোধ হয় শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীই হবেন। অসিত হাসিমুখে তাদের দিকে এগিয়ে গেল, আমি এগোলাম গেটের দিকে।

একবার ভাবলাম টাকা দুটো কোনো ভিখিরীর হাতে দিয়ে দিই, কিন্তু আশ্চর্য এত বড় বিয়ে বাড়ির ধারে কাছে একটি ভিখারীকেও চোখে পড়ল না। কি হোল পাড়াটার? বিলাতফেরতের বাড়ি বলে কলকাতার এ অংশটা কি রাতারাতি লণ্ডন হয়ে গেল।

ফুটপাথ ধরে একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলাম। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। অসিতের বিয়ের চিঠিতে কি রঙীনই না হয়েছিল সকালটা। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কিছুমাত্র যেন অবশিষ্ট রইল না। হলদে রঙের চিঠি। সে চিঠি যে এখনো পকেটে রয়েছে, কিন্তু তার রঙটুকু গেল কোথায়। হঠাৎ আর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ল। মল্লিকার লেখা সেই সাধারণ পোস্টকার্ডখানার কথা। নিতান্ত সাদাসিধে আটপৌরে চিঠি। আমাকে নয়, আমার স্ত্রীকে লেখা। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের কথা নেই, বরং অসুখ বিসুখের কথাই আছে। চিঠিটা আমার পকেটে নেই, কিন্তু তার প্রতিটি লাইন যেন আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। দু'একটি লাইন গুঞ্জরণ করতে লাগল কানে। 'মনেই হয় না এক শহরে আছি। ট্রামে যাচ্ছিলেন খুব কথা বলছিলেন নিজেরা। বাইরের দিকে তাকালেনই না। —ইচ্ছা হয় নিজেই একবার দেখা ক'রে আসি।' —এসব কথা আমাকে লেখেনি মল্লিকা। লিখেছে আমার স্ত্রী ইন্দিরাকে। কি ক'রে সরাসরি লিখবে আমাকে? মল্লিকা নিজেও তো মেয়ে। সে কি আর জানে না এসব বিষয়ে মেয়েদের চোখ কত তীক্ষ্ণ, কত তীব্র তাদের ঘ্রাণশক্তি?

কিন্তু এখনো অত সতর্কভাবে অত হিসেব ক'রে চলে কেন মল্লিকা? তখনকার কথা কি তার এখনও মনে আছে? আশ্চর্য, আমি কিন্তু একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

এও সেই কলেজী আমলের কাহিনী। পিসতুতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে থেকে বি-এ পড়তুম আর পড়াতুম বউদির ছোট ছোট তিনটি ভাই বোনকে। মল্লিকাও বউদির বোন। তবে তখন সে আর ছোট নয়, বেশ বড়। আমার কাছে বসে তার আর পড়া চলে না। কিন্তু তাই বলে ঠাট্টা তামাশার সম্পর্কে দূর থেকে হোলির দিনে আবীর ছিটাতে তো আর বাধে না। অবশ্য খুব বেশি দূর থেকে নয়, অনেকখানি কাছে এসেই এক মুঠো আবীর আমার চোখেমুখে সেদিন মাখিয়ে দিয়েছিল মল্লিকা। আত্মরক্ষার জন্য আমি তার আবীরশুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, 'আর একটু হলেই চশমা ভাঙত।'

মল্লিকা বলেছিল, 'বেশ হোত। চশমাটার জন্যই তো রঙটা চোখে লাগল না।'

'চোখ নষ্ট করার মতলব ছিল বুঝি?'

'ছিলই তো। হাত ছাড়ুন এবার।'

'মনের অভিসন্ধি জেনেও ছেড়ে দেব? যদি আর না ছাড়ি!'

এবার আবীর ছাড়াও লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছিল মল্লিকার মুখ। মৃদুস্বরে বলেছিল, 'ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেলবে।'

তারপর অনেকদিন দেখেছি ভাঁড়ার ঘর থেকে রান্নাঘরে যাতায়াতের পথে মল্লিকা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। আঙুলে হলুদের ছোপ। ছাত্রেরা কাছে না থাকলে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমিও যে জানালার ধারে দু'একদিন এগিয়ে না গেছি তা নয়, শিকও ধরেছি কিন্তু ভাঙিনি।

তারপর তাঁইমশাই মরে যাওয়ার পর আমি অন্য জায়গায় টুইশান নিলাম। মল্লিকাদের জানালাও সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। জীবনে এমন কত জানালা খোলে, কত জানালা নিঃশব্দে বন্ধ হয়, কে তার হিসাব রাখে, কে তার হিসাব রাখতে পারে।

মল্লিকার হিসাবও হারিয়ে ফেলেছিলাম। বছর চার পাঁচ বাদে বিয়ের পর আবার ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হোল। সম্পর্কটা আবিষ্কার করল আমার স্ত্রী। পুরোন সম্পর্ক নয়, নতুন সম্পর্ক। ইন্দিরার এক খুড়তুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে সস্ত্রীক আমিও গেছি, যতীশও গেছে। সেখানেই আলাপ পরিচয় হোল। যতীশ ইন্দিরার জেঠতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী। তারপর দু'একবার আমরাও গেছি, মল্লিকারাও এসেছে, কিন্তু সেই আবীরের প্রসঙ্গ আর কোনোদিন ওঠেনি। চশমার পাওয়ার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। কাপড় চোপড়ের দাম বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। আজকাল হোলীর দিনে আবীর আর খেলি না। ঘরের মধ্যে দোর জানালা সব বন্ধ ক'রে বসে থাকি।

স্মৃতির সেই রুদ্ধদ্বার হঠাৎ আজ এমন ক'রে খুলে গেল কেন ভেবে পেলাম না। কিন্তু একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলাম মনোহরপুকুরের দিকে। দেখে আসি কে কেমন আছে। চোখের অসুখে শেষ পর্যন্ত মল্লিকাকেও ধরেছে তাহলে। তখনকার দিনে ভারি নভেল নাটক পড়ত মল্লিকা, আর অবসর পেলেই সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। সে অভ্যাস বোধ হয় মল্লিকা এখনো ছাড়তে পারে নি। আর তার ফল ফলতে শুরু হয়েছে।

পুরোন একতলা বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। সবে তো সন্ধ্যা হয়েছে। সাতটা বেজে কয়েক মিনিট! তবু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বার দুই কড়া নাড়লুম। আরো দু'ঘর ভাড়াটে আছে বাড়িতে। হঠাৎ ঢুকে পড়া ঠিক নয়। একটু বাদেই ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে এল এগিয়ে। আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মা দেখ এসে কে এসেছে।'

মল্লিকার ছেলেমেয়েদের চেনা শক্ত হোল না। মায়ের মুখেরই আদল পেয়েছে ওরা। ঠিক সেই রকম ছোট্ট কপাল, জোড়া ভ্রূ, টানাটানা নাক চোখ। তাছাড়া আগেও তো দু'চারবার ওদের দেখেছি মল্লিকার সঙ্গে। কিন্তু ওদের এই উল্লাসে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করলাম। 'কে এসেছে' খবরটা ওরা মাকে ডেকে দিতে গেল কেন—বাবাকে ডেকেও তো দিতে পারত।

'বাঃ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কাকাবাবু, আসুন, ভিতরে আসুন।' ছেলেটিই বড়। বছর সাত আট হবে বয়স। এসে হাত ধরল। তার দেখাদেখি মেয়েটি এসে ধরল আর একটা হাত। বছর পাঁচেক হবে বয়স। ফুটফুটে ফর্সা রঙ অবিকল মল্লিকার মত।

সদর দরজা থেকে খানিকটা প্যাসেজের মত গেছে ভিতরের দিকে। দুপাশে চুন বালি ঝরা দেয়াল। মাঝখানে ছোটমত একটু উঠান। উঠানের উত্তরে মল্লিকাদের ঘর। দাওয়ায় রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। শিলনোড়ায় বাটনা বাটছিল মল্লিকা। আমি ঢুকতেই তাড়াতাড়ি আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে বলল, 'আসুন, কি ভাগ্যি। আজই যে আসবেন ভাবতেই পারিনি। চিঠি পেয়েছিলেন বুঝি?'

বললুম, 'পেয়েছিলাম মানে? আমি তো আর পাইনি।'

মল্লিকার আঙুলের দিকে চোখ গেল আমার। হাতে সেই লঙ্কা হলুদের ছোপ। নখের দিকটা একটু ক্ষয়ে গেছে, একটু শীর্ণও হয়েছে যেন আঙুলগুলি, তা সত্ত্বেও ভারি সুন্দর লাগল।

ঘটির জলে হাত ধুতে ধুতে মল্লিকা বলল, 'তারপর একা যে! ইন্দুদি আসেন নি?'

বললুম, 'না, কেন, একা বুঝি আসা যায় না।'

মল্লিকা বলল, 'যাবে না কেন। কিন্তু আসা হয় কই। এপথ তো আজকাল ভুলেই গেছেন।'

বললুম, 'তোমরাই বুঝি খুব মনে রেখেছ। ভাল কথা, যতীশবাবু কোথায়। তাঁকেও তো দেখছিনে।'

মল্লিকা বলল, 'কি ক'রে দেখবেন এখনও তো প্রেসে। রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি আজকাল। বলে ক'য়ে একটু আগেই বেরোন। না হ'লে তো আর ট্রামবাস পান না।'

মনে পড়ল, দু'তিন ধরনের চাকরি বদলাবার পর কিছুকাল ধরে কম্পোজিটারী করছে যতীশ। ইতিমধ্যে গুটিকয়েক খবরের কাগজ অফিস বদলেছে।

'আসুন ঘরে আসুন। বন্ধু নেই বলে কি ঘরের ভিতরও ঢুকতে নেই নাকি?'

দুখানা তক্তপোষ ঘরের বারো আনি জুড়ে গেছে। বিছানা, বালিশ, জড়ো হয়ে রয়েছে চৌকির ওপর। একপাশে অয়েলক্লথে দু'তিন বছরের আর একটি মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কোলের কাছে পুতুল।

উঁচু ক'রে তক্তপোষ পাতা। তার নীচে আর এক সংসার। বাক্স-তোরঙ্গ হাঁড়ি-কুড়ি। তক্তপোষের তলা থেকেই ছোট একখানা দড়ির খাটিয়া বের করল মল্লিকা। তাকের ওপর থেকে একখানা আসন নামিয়ে এনে পেতে দিল খাটিয়ায়। বলল, 'বসুন।'

বললাম, 'নিজের হাতে বোনা বুঝি?'

মল্লিকা একটু হাসল, 'সব দিকেই লক্ষ্য আছে দেখি। তারপর কেমন আছেন বলুন। এদিকে কোথায় এসেছিলেন।'

বললুম, 'কেন, এখানে বুঝি আর আসতে পারি না।'

মল্লিকা বলল, 'কই আর পারেন। পারলে তো দেখতামই। নিশ্চয়ই কোন কাজকর্ম উপলক্ষ্যে এদিকে এসেছিলেন। সুবিধামত একটু ভদ্রতা রক্ষা ক'রে গেলেন।'

বললুম, 'ঠিক কাজকর্ম নয়, এসেছিলাম এক বড়লোক বন্ধুর বিয়ের প্রীতিভোজে। খেয়েদেয়ে এত আইঢাই করছে পেট যে, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতে এলাম তোমাদের এখানে।'

'তা তো বটেই। জল ছাড়া আমরা আর কিই বা খাওয়াতে পারি। কি কি খেলেন বিয়ে বাড়িতে?'

যা যা খেয়েছিলাম, বললাম।

মল্লিকা বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড। অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরিই তো এসেছেন এদিকে। খুব ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।'

বললুম, 'আরে নানা। বললুম বলেই নাকি।'

মল্লিকা বলল, 'থাক থাক আর লজ্জার দরকার নেই। আপনি যে খুব লাজুক ভদ্রলোক তা দুনিয়ায় আর জানতে বাকি নেই কারো।'

'লাজুক ভদ্রলোক! কোন ইঙ্গিত আছে নাকি কথাটুকুর মধ্যে?'

ছেলেকে ডেকে দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে আঁচল থেকে পয়সা খুলে দিল মল্লিকা। কি যেন আনতে পাঠাল মোড়ের দোকান থেকে।

বললুম, 'হচ্ছে কি?'

'কিছুই হচ্ছে না, আপনি চুপ করুন দেখি। বরং একটু এদিকে এসে বসুন এগিয়ে।'

তাকের ওপর থেকে কাঁচের ময়দার বৈয়ম আর ঘিয়ের টিন নামিয়ে আনল মল্লিকা। কাঁধ উঁচু একটি কাঁসার থালায় ময়দা মাখতে বসল। ময়দা ডলার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার চুড়ি আর শাঁখার ঠুন ঠুন শব্দ হতে লাগল।

বললুম, 'তারপর আছ কেমন।'

মল্লিকা বলল, 'বেশ আছি।'

'চোখের নাকি অসুখ।'

মল্লিকা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'চোখের অসুখ আবার একটা অসুখ নাকি। ওতো আপনারও আছে।'

বললুম, 'আমার আছে বলেই বুঝি তোমারও থাকতে হবে?'

মল্লিকা এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'ইন্দুদি কেমন আছেন আজকাল?'

সংক্ষেপে বললুম, 'ভালোই'।

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম দেয়ালের দিকে। বুঝতে পারলাম পুরোন প্রসঙ্গ একটুও আর তুলতে দিতে চায় না মল্লিকা। যেতে চায় না কোনরকম ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে। দেওয়ালভরা নতুন পুরোন নানারকমের ক্যালেণ্ডার। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের ফটো। ফাঁকে ফাঁকে মল্লিকার হাতে বোনা কার্পেট, কাঁচে বাঁধানো সূচিশিল্প। একটি শিল্পকাজ বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল, এপাশে ওপাশে নাম না জানা গুটিকয়েক ফুল। মাঝখানে অলঙ্কৃত অক্ষরে দুটি পংক্তি—

'সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন
কাঙালিনী পেলে রাণী এহেন রতন।'

মনে মনে হাসলুম। একথা কি কোন বাঙালী হিন্দুর মেয়েকে কখনো ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে হয়? না কি মনের দেয়াল থেকে বার বার মুছে যেতে চায় বলেই তাকে দেয়ালে এমন অক্ষয় ক'রে রাখার চেষ্টা।

থালায় ক'রে অনেকগুলি লুচি, তরকারি মল্লিকা সামনে এনে রাখল।

বললুম, 'এত কি হবে?'

মল্লিকা বলল, 'এত কই। খানকয়েক মাত্র তো লুচি। রাত্রে বাসায় ফিরে ভালো ভালো জিনিস খেতে পারবেন না, এই তো ভাবনা? বলবেন, বন্ধুর বাড়ি থেকে পেট ভরে পোলাও মাংস খেয়ে এসেছেন সেইজন্যেই খেতে পারছেন না।'

মল্লিকার ছেলেমেয়ে দুটি, ননী আর ময়না, কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে তুলে দিলাম খানকয়েক লুচি। চায়ের প্লেটে ক'রে দুটি মিষ্টি দিয়েছিল মল্লিকা, সে দুটিও ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলুম।

মল্লিকা বলল, 'বাঃ সবই বিলিয়ে দিলেন যে।'

বললুম ; 'সব বিলিয়ে দিতে আর পারলাম কই। ওরা খেলেই আমার হবে।'

খুব খুশি-খুশি, ভারি উৎফুল্ল দেখাল ননী আর ময়নার মুখ। পান্তুয়ার রস আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেয়ে পড়তে লাগল ময়নার। জল-খাবারের পর চা ক'রে আনল মল্লিকা। নিজেও এক কাপ নিল।

বললুম, 'অনেকদিন পর চা খাচ্ছি মুখোমুখি বসে।'

মল্লিকা বলল, 'আহাহা, বাড়িতে বুঝি একজন আর একজনের দিকে পিছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে চা খান?'

চায়ের পর আবার রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মল্লিকা। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে তুলে দিল ডালের কড়া।

বললুম, 'এবার উঠি।'

মল্লিকা বলল, 'আসবেন মাঝে মাঝে। পথ যেন একেবারে ভুলেই গেছেন। বউবাজার আর কালীঘাট যেন গড়ের মাঠের এপার ওপার নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পার।'

ভারি ভালো লাগল কথাটুকু। এতক্ষণ পরে তাহলে সত্যিই অভিমানের সিন্ধু উথলে উঠেছে মল্লিকার!

জবাব না দিয়ে এগুতে লাগলাম সরু প্যাসেজটুকুর ভিতর দিয়ে। দোর পর্যন্ত মল্লিকা এগিয়ে দিল, ফিরে গেল না। দাঁড়িয়েই রইল একখানা কবাটের আড়ালে মুখ বাড়িয়ে।

কিন্তু দু'এক পা এগুতেই দেখি ননী আর ময়না দুদিক থেকে ফের এসে আমার দুখানা হাত চেপে ধরেছে, 'কাকাবাবু, বাঃ দিব্যি পালিয়ে যাচ্ছেন। পয়সা দিলেন না।'

'ওঃ পয়সা।'

ভারি লজ্জিত বোধ করলুম। তাইতো কেবল বড়লোক বন্ধুর ওখানেই লৌকিকতা করেছি—মল্লিকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিনে নেওয়াই হয়নি একেবারে শুধু হাতে গিয়ে উঠেছি ওদের ওখানে।

বললুম, 'পয়সাই নেবে। না আম-টাম কিছু কিনে দেব?'

ননী নিজেই বলল, 'না-না পয়সাই চাই। আপনি ভারি ফাঁকি দিচ্ছিলেন।' বলে ননী নিজেই আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। এক পকেটে খুচরো আনা দুয়েক পয়সা ছিল। ময়না তা তুলে নিল। ননীর হাতে উঠল সেই দু'টাকার নোটখানা। এক মুহূর্ত একটু স্তম্ভিত হয়ে রইল ননী, তারপর হঠাৎ বাড়ির দিকে ছুট দিল।

আমিও মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইলুম, তারপর ননীকে ডেকে বললুম, 'ছুটছ কেন! পড়ে টড়ে যাবে, আস্তে আস্তে যাও।'

ননী মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেড়ে নেবেন না তো?'

'না-না, কেড়ে নেব না, ভয় নেই।'

কেমন যেন লাগতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটতে শুরু করতে পারলুম না। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালাম।

পরমুহূর্তে ফের ছুটে এল ননী, 'কাকাবাবু টাকা তো আপনি আমাকেই দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো দিলাম।'

'তাহলে মা কেড়ে নিলে কেন। আসুন ধমকে দিয়ে যান মাকে।'

হাত ধরে টানতে টানতে ফের দোরের কাছে আমাকে নিয়ে গেল ননী। মল্লিকা তখন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। দু'টাকার নোটখানা মুঠির মধ্যে।

হাসতে গেলুম, কিন্তু হাসি যেন ঠিক এলো না, বললুম, 'ব্যাপার কি।'

মল্লিকা বলল, 'আচ্ছা কাণ্ড আপনার। ওদের হাতে অত টাকা দিতে গেলেন কেন?'

বললুম, 'তাতে কি হয়েছে।'

মল্লিকা বলল, 'না-না-না, এসব ভালো নয়। এসব কি, এসব দেবেন কেন।'

ননী এবার বলল, 'আচ্ছা কাকাবাবু! এ-টাকা আমাকে দেননি আপনি?'

আমি ঘাড় নাড়লুম।

'তবে মা কেন কেড়ে নিচ্ছে?'

মল্লিকা একটু হাসল, 'কথা শুনুন ছেলের। কেড়ে নিয়ে যেন পাড়ার পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবে মা। এ যেন তোমাদেরই পেটে যাবে না? রাত পোহালে এক মুড়ি মুড়কিতেই কতগুলি পয়সার দরকার—সে হিসাব আছে?'

বলতে বলতে আঁচলে দু'টাকার নোটখানা বেঁধে রাখল মল্লিকা।

মনে হোল ননীর চোখ দুটি ছলছল করছে। কিন্তু ছেলের দিকে মোটেই তাকাল না মল্লিকা, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লিখেটিখে খুব বুঝি হচ্ছে আজকাল?'

কিসের এক আনন্দে চকচক করছে মল্লিকার চোখ। ঠোঁটের কোণে সেই আগেকার দিনের হাসি।

বলতে গেলুম, 'না না'—

মল্লিকা বাধা দিয়ে বলল, 'আহা, বললে বুঝি সব আমি কেড়ে রাখব, না? ভয় নেই, তা আমি রাখতে পারব না, তা আপনি দিতেও পারবেন না। কিন্তু দু-এক নাইট সিনেমা দেখাতে তো পারেন? মনে আছে সেই কতকাল আগে একবার একসঙ্গে—আসবেন একদিন? ওঁর তো আর সময় হয় না।'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'আসব।'

তারপর প্রায় ননীর মত ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম গলি থেকে।

রেকর্ড

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বৌবাজার স্ট্রীট আর শেয়ালদার মোড়ের কয়েকটি ছোট ছোট গলি দিয়ে, কিংবা স্কট লেনের পাশ কাটিয়ে একটি বিচিত্র বাজারে ঢোকা যায়। ইংরেজিতে তার ভদ্র নাম 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেট'—চলতি বাংলায় 'চোরা বাজার'। এক সময় বোধ হয় চোরাই জিনিসের বিক্রি-পাটা চলত এখানে—আজ সে পাট না থাকলেও অখ্যাতিটা আঁকড়ে বসেই আছে।

বৈঠকখানা মার্কেটের গাছপালার দোকানগুলি পার হলে এই বাজারের সীমান্ত ; এ অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। নতুন পুরোনো প্রচুর সস্তার জুতো, শোলা হ্যাট, ইলেকট্রিক হীটার, তাপ্পি মারা স্টোভ, আর লাল হয়ে যাওয়া দশ বারো আনা সেরের চিংড়ি মাছ। এই অংশে দাঁড়ালেই নাকে আসবে স্পিরিট আর বার্ণিশের গন্ধ—তারপর আপনি একেবারে ফার্ণিচারের জগতে গিয়ে পৌঁছাবেন।

নতুন পুরোনো ফার্ণিচারে দোকানগুলো ঠাসা। ল্যাজারাস কোম্পানির আদি বার্মা টীক রং ফিরিয়ে অপেক্ষা করে আছে, আবার চকচকে নতুন জিনিস এক নম্বর সি-পি ভেবে কিনে এনে ছ'মাস পরে আবিষ্কার করবেন কাঠটা বিশুদ্ধ জারুল। সস্তায় হয়তো খাঁটি মেহগিনির জিনিস পাবেন আবার প্রচুর পয়সা দিয়ে আলমারিটা এনে দেখলেন, ফাটা কাঠের ওপর বেমালুম বার্ণিশ লাগিয়ে আপনার মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে।

অর্থাৎ, রাস্তার লটারী। এক আনা দিয়ে কাঁটা ঘোরালেন পেলেন তিনটি ছোট ছোট বিস্কুট ; কিংবা কপালের জোর থাকল তো চন্দন সাবানই জুটে গেল একখানা!

তবু আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের এখানে লটারীর টিকিটই কিনতে হয়। বৌবাজার কিংবা রিপন স্ট্রীটের দিকে পা বাড়াতে আমাদের সাহসে কুলোয় না।

আমি গিয়েছিলুম ছোট একটা বুক কেসের সন্ধানে। মনের মত কিছু পেলুম না। ফিরে আসছি, এমন সময় একটা দোকানের দিকে নজর পড়ল। ফার্ণিচারের দোকান নয়। 'বাবু কলকাতা'র শেষ অভিজ্ঞান কতগুলি গৃহসজ্জা, চীনে মাটির বড় 'পট', গিল্টকরা ফ্রেমে বিলিতি ছবি, দু'একটা শ্বেত পাথর কিংবা ইমিটেশন স্টোনের ছোট বড় মূর্তি, ব্রোঞ্জের নগ্নিকা, পুরোনো ফ্যাশানের আরো নানা টুকিটাকি। একটা চোঙাওলা গ্রামোফোনে হিন্দী গানের রেকর্ড বাজছিল, সেইটে কানে যেতে আমি

দাঁড়িয়ে গেলুম। হিন্দী নামের আকর্ষণে নয়। দেখলুম, স্তূপাকার পরোনো রেকর্ড। 'যেখানে দেখিবে ছাই'—এই মহাজন বাক্যে এখানে আমি লাভবান হয়েছি আগে। অর্থাৎ পুরোনো রেকর্ডের ভেতর থেকে পেয়েছি অপ্রাপ্য রবীন্দ্র কণ্ঠ, পেয়েছি রাধিকা গোস্বামীর গান, দিলীপকুমারের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা' তাদের কোনো-কোনোটি কোনমতে শ্রাব্য, আবার দু'একটা প্রায় নতুনের মতো। দাম আশাতীত সস্তা, বলাই বাহুল্য। বললুম রেকর্ড দেখাও তো।

একজন বের করে দিলে। অধিকাংশই সস্তা, সিনেমার গান—কিংবা বাজার চলতি 'পপুলার ডিসক'—পূজোর অ্যাম্প্লিফায়ারে বাজাতে বাজাতে যারা অকাল জরা লাভ করেছে। তবু এদের মধ্যেই একখানা রেকর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অচেনা লেবেল, অচেনা ভাষা। ওপরের লেখাগুলোও রোমান হরফ বলে মনে হল না। দেখলুম বেশি পুরোনোও নয়।

হিন্দী রেকর্ডটা থেমে গিয়েছিল। বললুম, এটা বাজাও তো। চোঙাওলা গ্রামোফোন থেকে প্রথমে একরাশ অদ্ভুত বাজনা ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাজনা এর আগে কখনো শুনিনি। একটা ড্রাম বাজছে—গীটারও আছে বোধ হয়, কিন্তু আরো কি কি যে আছে আমার বোধগম্য হল না। নানা ঢঙের বিদেশী ছবি দেখেছি—রেকর্ড শুনেছি অনেক, কিন্তু এ জিনিস কখনো কানে আসেনি এর আগে।

তারপর গান। নারীপুরুষের চার পাঁচটি কণ্ঠ আছে মনে হল। যেমন অদ্ভুত বাজনা—তেমনি অদ্ভুত সুর। কেন জানিনা—কোথায় রক্তের মধ্যে দোলা লেগে গেল। জানি এ সুর একেবারে অচেনা, তবু মনে হতে লাগল এ যেন আমি কবে কোথায় শুনেছিলুম। উল্‌টো পিঠেও একই জিনিস—একটা গানকেই গাওয়া হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় পেলে এ রেকর্ড?

জবাব এল, চৌরঙ্গী অঞ্চলে ওদের যে এজেন্ট আছে সে এনে দিয়েছে।

—এ কোন ভাষা?

বিহারী মুসলমান দোকানদার হেসে বলল, ক্যা মালুম?

বারোয়ানা পয়সা দিয়ে রেকর্ডখানা আমি সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। দর করলে হয়তো আরো সস্তায় হত, কিন্তু কেমন যেন মনে হল দরাদরি করে খেলো করবার মতো গান এ নয়।

বাড়ী ফিরে মেসিনে দিয়েছি, আমার স্ত্রী করুণা উঠে এলো পড়ার টেবিল থেকে। নতুন অধ্যাপনায় ঢুকেছে—কলেজের ছাত্রীদের চাইতে পড়ার তাগিদ তার নিজেরই বেশী। ভুরু কুঁচকে বললে, এ আবার কী?

বললুম, 'দেখতেই পাচ্ছ, রেকর্ড বাজাচ্ছি।'

—কী বিটকেল বাজনারে বাপু! এ কাদের গান?

—জানিনা।

—জানোনা তো আনলে কেন?

—চুপ করো একটু, শুনতে দাও।

মিনিট খানিক ধৈর্য ধরে রইল করুণা। তারপর মুখের উপর টেনে আনল রাজ্যের বিরক্তি।

—পাগল করে দিলে যে! কোত্থেকে রাজ্যের ছাইপাঁশ জোটাও তুমিই জানো। পড়তে দেবার মতলব না থাকে তো বলো, সোজা ছাতে গিয়ে উঠি।

—লক্ষ্মীটি—আর একটুখানি। তিন মিনিটে তোমার জ্ঞানার্জনে কাঁটা পড়বে না।

গান থামলে করুণার দিকে তাকালুম। দেখি হাতে একটা লালনীল পেন্সিল নিয়ে এসেছিল, তার গোড়াটা চিবোচ্ছে আন্‌মনার মতো।

—খুব খারাপ লাগল করুণা?

করুণা একটু চুপ করে রইল। বললে, না—খারাপ লাগল না। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল। পড়াটা নষ্ট করে দিলে আমার।

—কেন?

—ভারী আশ্চর্য লাগল সুরটা। মনে হল কবে যেন কোথায় শুনেছি।

বললুম, ঠিক তাই। আমারও অমনি মনে হয়েছিল।

করুণা আস্তে আস্তে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। মেশিনটা তুলে রেখে দেখি ও পড়ছে না, একটা ব্লটিং প্যাডের ওপর নীল পেন্সিলের আঁচড় টানছে।

আমিও কতগুলো খাতা টেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের সংখ্যা বাড়াতে বসে গেলুম। কিন্তু একটা খাতাতেও মন দিতে পারছি না। দুকান ভরে ওই বিচিত্র বাজনা আর গানের সুর বেজে চলেছে। কোথায় শুনেছি—কবে শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

করুণা যেন আমারই ভাবনার সূত্র টেনে বললো, এ কী কাণ্ড করলে বলো তো?

—কী হল আবার?

—ওই রেকর্ডটা ভারী অস্বস্তি লাগছে। যেন খুব চেনা—যেন—করুণা গুন্ গুন্ করে দু'তিনটে সুর ভাঁজল, তারপর বিরক্ত হয়ে বললে, নাঃ—কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, পাগলামি ধরিয়ে দিলে যা হোক। দিলে পড়াটা শেষ করে।

মোট কথা, ওই রেকর্ডখানা আমাদের দু'জনের সন্ধ্যাকেই আচ্ছন্ন করে রাখল। এ একটা বিরক্তিকর মানসিক অবস্থা। খুব চেনা মানুষের নাম মনে করতে না পারলে, চাবির গোছা এইমাত্র কোথাও রেখে তারপর আর খুঁজে না পেলে যেমন একটা ছটফটানি জেগে ওঠে ঠিক সেই রকম।

রাতে খেতে বসে করুণা বললে, মনে পড়েছে।

আমি চোখ তুলে তাকালুম।

—ছেলেবেলায় তখন আসামে ছিলুম, তখন খাসিয়াদের নাচের সঙ্গে যেন ওই রকম গান—

—খাসিয়াদের গান?

করুণা একটু বিভ্রান্ত হল যেন। তারপর মাথা নেড়ে বললে, না—না ঠিক খাসিয়াদের নাচও নয়। ঠিক কী যেন—কী যেন—একটু চুপ করে থেকে বললে, বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের ডাক শুনেছ কখনো? পাহাড় ভেঙে নেমে আসে, বড় বড় গাছগুলিকে স্রোতের টানে কুটোর মতো ভাসিয়ে নেয়, দূরের পাহাড়ে বুনো হাতি গর্জে গর্জে ওঠে, তখন নাগাদের ঢাকের আওয়াজ—

বলতে বলতে হতাশভাবে চুপ করে গেল করুণা ঃ কী জানি।

কিন্তু ওই ঢাকের কথায় আর একটা স্মৃতি জেগে উঠল আমার মনে। মানভূম। দুধারে কুসুম গাছের সারি আর ঘন বাঁশের বন—তারই ভেতর দিয়ে নির্জন পথ বেয়ে চলেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে—ঝালদার পাহাড় দূরে ভুতুড়ে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। পাশের একটা প্রকাণ্ড দীঘিতে পানডুবকীর কলধ্বনি, ঝিঁঝির ডাক।

হঠাৎ পান-ডুবকী আর ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে গুরু গুরু করে উঠল নাগরার আওয়াজ। এদিক থেকে ওদিক, এ দিগন্ত থেকে ও দিগন্ত। কী একটা পরব ওদের—গ্রামে শুরু হল ছৌ নাচের পালা।

সেই অস্পষ্ট অন্ধকার—কালো হয়ে আসা কুসুমগাছ আর বাঁশবন, ঝালদার পাহাড়ের ভুতুড়ে ছবি আর ওই নাগরার আওয়াজে হৃৎপিণ্ড আমার চমকে চমকে উঠেছিল। মনে পড়েছিল, পুলিশের বুলেটের সঙ্গে লড়বার আগের দিন রাত্রে বিয়াল্লিশের আগস্টে, বালুরঘাটের অন্ধকার সাঁওতালি গ্রামগুলো থেকে অমনি ভাবেই নাগরা-টিকারা রোল আমি শুনেছিলুম।

বর্ষার ব্রহ্মপুত্র, নাগাদের ঢাক, নাগরা-টিকারার আওয়াজ, ছৌ-নাচের বাজনা,—এদের সঙ্গে কোথায় এই রেকর্ডটার মিল আছে? মিলছে না—অথচ কোথায় যেন মিলছে। কিছুতেই মনে আনতে পারছি না—অথচ ঠিক মনে আছে! কী যে খারাপ লাগতে লাগল!

একটা অচেনা অজানা পুরোনো রেকর্ড কিনে আচ্ছা জ্বালা হল তো!

এর মধ্যে একদিন করুণার এক সহপাঠিনী এসে হাজির।

শহরের ওপরতলার বাসিন্দা—নিতান্তই একদা করুণার সঙ্গে গভীর সখীত্ব ছিল বলে আমাদের এই হরিজন পাড়ায় পা দিয়েছেন। মহিলাটি বিদুষী গুণবতী। ওয়েস্টার্ণ মিউজিক শেখবার জন্যে ইউরোপে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে গানের ওপর ডক্টরেট নিয়ে ফিরে এসেছেন। বরমাল্য দিয়েছেন এক মারাঠী এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে।

করুণা দারুন খুশি হয়ে বললে, আইভি এসেছিস, খুব ভালো হয়েছে। আমাদের এই পাজল্‌টার একটার সলিউশন খুঁজে দে।

রেকর্ডখানা দেখে কপাল কোঁচকালেন আইভি।

—কোন শ্লাভ ভাষা মনে হচ্ছে। বাজা তো!

বাজানো হল। আইভিও বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। শঁপ্যা ভাগনার-বাখ-বীটোফেনের সঙ্গে পরিচয় আছে—তার ওপরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা অকারণেই শোনালেন আমাদের। কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

শেষে ব্যাগ খুলে একটা টফি খেলেন। তার সেলোফোনের মোড়কটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন, কোনো কমিউনিটি সং বলে মনে হচ্ছে।

করুণা বললে, সে তো বোঝাই যায়। অনেকে মিলেই গাইছে যখন।

টফির মোড়কটাকে একটা আংটির মতো জড়ালেন আইভি। বললেন নাউ আই রিমেম্‌বার। সুইৎসারল্যাণ্ডের ম্যারেজ ফেস্টিভ্যালে এমনি গান আমি যেন শুনেছিলাম।

ম্যারেজ ফেস্টিভ্যাল! করুণা আমার দিকে তাকালো একবার। চোখে চোখ মিলল। উত্তরটা কারোই মনঃপূত হয়নি।

করুণা বলতে যাচ্ছিল ঃ ঠিক বিয়ের সুরের মতো মনে হচ্ছে কি? তা ছাড়া সুইস্‌রা তো শ্লাভ্‌ বলে—

আইভি আর সময় দিলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ চলি ভাই। নিউ এম্পায়ারে একটা শো আছে তার রিহার্সাল করতে হবে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ এসেছি—ন্যান্সি ইজ্‌ ফিলিং ভেরি লোন্‌লি! এ পুওর লিট্‌ল থিং শী ইজ্‌।

ন্যান্সি তাঁর দুহিতা নয়—কুকুর।

ওঁর মোটরটা চলে যেতে করুণা বললে, চালিয়াৎ!

আমি হাসলুম—জবাব দিলুম না। করুণা গজগজ করতে লাগল ঃ ইউরোপে গাছের তলায় ডক্টরেটের ডিপ্লোমা বিক্রী হয় শুনেছি। পাঁচ শিলিং কি সাত ফ্রাঙ্ক দিলে—

করুণা ডক্টরেট নয়, অতএব এ স্বাভাবিক ঈর্ষা। আসল কথা, শ্রীযুক্ত আইভিও আমাদের নিরাশ করলেন। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম।

সেদিন মাঝ রাতে আমার ঘুম ভাঙল।

জল খেতে উঠেছি—কানে এল বাঘের ডাক। রাত দেড়টার ঘুমন্ত কলকাতার উপর দিয়ে তরঙ্গে তরঙ্গে একটা গভীর ধ্বনি বয়ে যেতে লাগল। আর্ত অথচ ভয়ঙ্কর, ক্লান্ত অথচ ক্রুদ্ধ। মুখের কাছে জলের গ্লাসটা তুলে আমি নামিয়ে ফেললুম।

বাঘ ডাকছে।

আমাদের বাড়ী থেকে একটা সরলরেখা টানলে দুটো বড় রাস্তার ওপারে সোজা মার্কাস স্কোয়ার। একটা সার্কাসের দল দিন কয়েক হল তাঁবু ফেলেছে সেখানে। সেখান থেকেই আসছে বাঘের ডাক।

কলকাতার এই অনিদ্র আলো-জ্বলা রাত্রে বাঘটা হয়তো সুন্দরবনের স্বপ্ন দেখছে। তাই চম্‌কে জেগে উঠেছে ও-ভাবে।

কিন্তু কেন জানিনা—আমার ওই বিদেশী রেকর্ডটাকে মনে পড়ল। মিল আছে—ওর সঙ্গেও মিল আছে। অথচ কিছুতেই ধরতে পারছি না—কিছুতেই না।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালুম। সামনের কয়েকটা পাম গাছ—তাদের মাথার ওপরে রাত্রির তারা—কয়েক টুকরো মেঘ, সব যেন বাঘের ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বারবার।

শেষ পর্যন্ত সমাধান করলেন এক ভূ-পর্যটক।

রেকর্ডটা শুনে চমকে উঠলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলেন?

—চোরা বাজারে।

—আশ্চর্য।

—কেন?

—এ কলকাতায় এল কী করে তাই ভাবছি। এ রেকর্ড গোপনে তৈরী হয়েছিল—গোপনে বিক্রী আর বিলি হয়েছিল সামান্য সংখ্যায়। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি শিল্পীই নাৎসীদের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে।

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকালো আমার। জ্বলজ্বল করে উঠল করুণার চোখ।

—খুলে বলুন।

—ইউরোপের একটা ছোট দেশের নাম করলেন পর্যটক। নাৎসী অধিকারের সময় এই রেকর্ডটি ছিল সেখানকার মুক্তিযোদ্ধাদের গান। হিটলারের গোয়েন্দারা দাবি করেছিল, এর প্রত্যেকটি কপি, এর অরিজিনাল—এর প্রত্যেকটি শিল্পীকে তারা লিকুইডেট করেছে। অথচ এই রেকর্ড পাওয়া গেল কলকাতার বাজারে।

পর্যটক থামলেন।

রাস্তা দিয়ে গর্জিত একটি ছাত্র-শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। আমরা তিনজনেই কান পেতে শুনলুম কিছুক্ষণ। কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল ঘরে।

পর্যটক আবার বললেন, একটা অত্যন্ত দামী জিনিস পেয়েছেন আপনি। জানি না, যুদ্ধের পর ওরা এই রেকর্ডটাকে আবার চালু করতে পেরেছে কিনা। যদি না পেরে থাকে—

ছাত্র-শোভাযাত্রার দূর-ধ্বনিটা হঠাৎ বন্যার মতো প্রবল বেগে ভেঙে পড়ল দুম দুম করে আওয়াজ উঠল কয়েকটা। তারপর পথ দিয়ে চিৎকার করতে করতে কে বলে গেল ঃ লাঠি চলছে—টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে—

আবার স্তব্ধতা নামল ঘরে।

দূরে শুনছি প্রাণের বন্যা ক্রোধের ঝোড়ো গর্জন। না—এখন আর সুরটাকে চিনতে বাকী নেই। ব্রহ্মপুত্রের বর্ষা মাদল, নাগা পাহাড়ের ঢাক, ছৌ-নাচের নাগরা—বালুরঘাটের রাত্রি কাঁপানো টিকারার আওয়াজ—মার্কাস স্কোয়ার থেকে বাঘের ডাক, আর—আজকের এই ঘা খাওয়া মিছিল, সব একসঙ্গে মিলে ওই সুরটাকে সৃষ্টি করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে এ সুর এক। জানতুম, আমরাও এ সুরকে জানতুম। ঘুমন্ত রক্তের মধ্যে তলিয়ে ছিল বলেই এতদিন চিনতে পারিনি।

করুণা আমার দিকে তাকালো। দু'চোখে অসহ্য ঘৃণা জ্বলছে ওর। আস্তে আস্তে বললে, এ রেকর্ডকে কেউ ভেঙে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। কেউ পারবে না।

কানাকড়ি

সন্তোষকুমার ঘোষ

দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্মথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল সাবিত্রী।

ভেতর থেকে সাবধানগলা সাড়া এলো ; কে?

আমি।

দরজা খুলে গেল। সাবিত্রী বলল, এত দেরি হ'ল তোমার। আমি তখন থেকে ভয়ে মরি। চুপচাপ তক্তপোষে পা তুলে বসে আছি। জিনিসপত্তর কিছু গোছগাছ হয়নি কিন্তু।

গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে মন্মথ বললে, কী করি, দু'দুটো টিউসনি ছিল যে। একটু পাখা করবে?

খালি-গা, হাঁটু অবধি কাপড় তুলে মন্মথ পাঁচ মিনিট হাওয়া খেল কিন্তু সাবিত্রী তখন কিছু বলল না। বলল অনেক পরে, একেবারে শুতে এসে।

আজ দুপুরের কথাটা। বিকেলের দিকে গলির ঠিক মুখটাতে ট্যাক্সির হর্ণ বেজেছিল। মিনিটখানেক পরে একজোড়া মশমশ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায়। তারপর দরজায় টোকা। কাছে পিঠে কেউ নেই, নতুন বাসা, চেনা নেই, জানা নেই, ভয়ে কাঠশরীর সাবিত্রী, ছিটকিনি তো ছিলই, তার ওপর খিল তুলে দিয়েছিল। ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, ফিসফিস সুরে একজন বললে, ওদিকে নয়, ইদিকে। চোখের মাথা খেয়েছ?

মশমশ জুতো বললে, তাই নাকি মাইরি ভুল হয়ে যায়। তুমি তৈরি?

রেডি।

তা হলে স্টেডি—গো।

মশমশ জুতো মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, পিছনে পিছনে খুটখুট। বোধ হয় হাই-হীল। একটু পরে গলির মুখ থেকে ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ এলো।

মন্মথ শুনলো সব, বলল নতুন জায়গা, তাই সব তাতেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চেনাজানা হোক, তখন আর এত ভয় পাবেনা।

প্রথম থেকেই সাবিত্রীর পছন্দ হয় নি। না বাসা, না গলি, আলাদা বাসার জন্যে মন্মথকে পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু সে কি এমনি। বাপের বাড়ি বেহালায়, সেখানে

তবু মাটির ছোঁয়া ছিল। নারকেল গাছের ছাতাধরা ছোট্ট একটু ছাত ছিল। কিন্তু আহিরীটোলার এই গলিতে আছে শুধু পীচ আর পাথর।

অবাড়ন্তশরীর মেয়েদের বয়সের মতো, এ-বাড়িতে বেলা যেন বাড়ে না। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর একেবারে শেষ রাতে গলির গ্যাস-আলো ক্লান্ত চোখ বোজে, সেই সঙ্গে মানুষও। কিন্তু ক'মিনিট। একটু পরেই সদর রাস্তায় সাড়া জাগে, গঙ্গাযাত্রীদের নিয়ে প্রথম ঢঙ ঢঙ ট্রাম বেরুলো। চৌবাচ্চায় ঝিরঝির শব্দ, জলের কলটা ষাট নম্বর আলেকজাণ্ডার সুতোর একগাছি দাঁতে চেপে আছে।

তারপর থেকে সব বাঁধা টাইমে। বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিংড়ি আর পুঁইশাকে থলে ভর্তি করে ফিরছেন ঃ আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, নাছুঁই পানি স্নান ঃ সাড়ে আট। নমো নমো খাওয়া। নটা। রেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে এক খিলি পান, রাস্তার দড়ি থেকে ধরানো আয়েসী একটা কাঁচি—সারাদিনের বরাদ্দ ছুটির মধ্যে একটি—সাড়ে নটা, দৌড়—দৌড়—দৌড়।

তারপর থেকেই গলিটা যেন ঝিমোতে শুরু করে। কোন সাড়া নেই, ক্বচিৎ একটা কাকের কা-কা, ক্বচিৎ সারাদুপুর রোদে টোটো-হয়রান ফিরিওয়ালা এ-গলিতে খদ্দের না হোক, ছায়া খোঁজে।

সাড়া জাগে শুধু একবার, সেই শেষবেলায়, গলির মোড়ে ট্যাক্সির হর্ণে। পাশের ঘরের দরজায় তিনটে টোকার ঈশারা, মশমশ জুতোর পিছে পিছে মিলিয়ে যায় হাই-হীল।

আলাপ হতে হতে ছদিন কাটলো।

জানালায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ পরছিল, ছায়া দেখে ফিরে তাকাল। বলল, আসুন। আপনি তো ও-ঘরে থাকেন?

চৌকাটের ওপর ইতস্তত দু'টি পা। সাবিত্রী দু'টি উঁচু গোড়ালি পলকে দেখে নিল।

জুতো পায়ে ঢুকবেনা ভাই। বেরুচ্ছি। দু'দিন থেকেই দেখছি আপনারা নতুন এসেছেন। তা ফুরসুৎই পাইনা যে এসে পরিচয় করব। দরজা সব সময়ে তো বন্ধই দেখি। আজ খোলা দেখে এলুম।

আসুন, আসুন না ভেতরে। সাবিত্রী আবার বলল। জুতো খোলার দরকার নেই, উনি তো দু'বেলাই ঢুকছেন।

তক্তপোষে বসে মেয়েটি বলল, বাঃ দিব্যি তো গুছিয়ে নিয়েছেন। দু'জনের সংসার।

দু'জনের না। সাবিত্রী কুণ্ঠিত হেসে বলল, তিনজন।

ওমা তাই তো। খুকিকে তো দেখতেই পাইনি। কেমন চুপচাপ ঘুমুচ্ছে। কার মতো হয়েছে,—বাপের মতো?

কী জানি। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বলল আপনারা ক'জন দিদি।

হেসে লুটিয়ে পড়ার ভঙ্গি করে মেয়েটি বলল, দিদি আবার কী? মল্লিকা। আমাকে মল্লিকাদি বলে ডাকবেন। বয়সে তো আমি বড়ই হবো আপনার চেয়ে মনে হচ্ছে।

মল্লিকাদি, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, আপনারা ক'জন—তিনজন না চার?

একজন ভাই। মল্লিকা বলল, এক এবং অদ্বিতীয়। দু'জন হতে পারলাম কই যে তিনজন হবো।

ওমা, আপনার বিয়ে হয়নি? করেননি কেন।

করিনি কি আর সাধ করে। হ'ল না। মল্লিকা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, কিন্তু আমি আর বেশীক্ষণ বসব না ভাই। বেরুতে হবে। শ্যামের বাঁশি বাজলো বলে।

শ্যামের বাঁশি? একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে সাবিত্রী বলল, ও, ট্যাক্সির কথা বলছেন। আপনি বুঝি খুব ট্যাক্সি চড়েন?

তা চড়ি, মল্লিকা বলল, আপনি চড়েন না।

আমি? বলতে গিয়ে চোখ দুটো যেন নিবে গেল সাবিত্রীর। আমি? আপনিও যেমন মল্লিকাদি। গরীবের ঘরের মেয়ে, পড়েছি গরীবের হাতে—আমি ট্যাক্সি চড়েছি দু'বার। একবার বিয়ের সময়, আরেকবার এই এবারে, মিনু হতে হাসপাতাল যেতে। সাবিত্রী ইঙ্গিতে ওর মেয়েকে দেখিয়ে দিলে।

নিজের কথাটা বলেই সাবিত্রী কৌতূহল সামলাতে পারল না, বলল, আপনাকে নিতে রোজ রোজ কে আসেন, মল্লিকাদি। ওই যে মশমশ জুতো, কোট, প্যান্ট—

ওমা, তাও দেখেছ। মল্লিকা অল্প হেসে বলল, ও হ'ল আমার এক মামাতো ভাই। আমার হার্টের ব্যামো কিনা, তাই রোজ হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারা হলে সাবিত্রী নিজেই গেল মল্লিকার ঘরে। মল্লিকা বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল, এসো ভাই। কাজকর্ম চুকলো।

ঢুকবে কি, সাবিত্রীর পা সরছিল না। ছোট্ট, কিন্তু এমন সাজানো গুছানো ঘর আর কখনো চোখে পড়েনি। ঝকঝকে পালিশ খাটের ওপর ধবধবে বিছানা, ফুলতোলা বালিশের ওয়াড়। ড্রেসিং আয়না, টি-পয়, গ্রামোফোন একটা। আলমারিতে কাচের, চীনা মাটির খেলনা কতরকম।

এগুলো? সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল।

এগুলো পুতুল। মল্লিকা বলল, আমি খেলি যে। আমার কি পুতুল খেলার বয়স গিয়েছে ভাই।

খাটের একপাশে সাবিত্রী বসল সন্তর্পণে। নোংরা কাপড়, কী জানি। মল্লিকার হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, কী পড়ছেন।

পৃষ্ঠা মুড়ে রেখে মল্লিকা বলল, গল্পের বই। কাল সিনেমায় যে বইটা দেখতে গেছলুম, সেটাই লিখেছে। ভারি চমৎকার। তোমাকে কী বলব ভাই, কাল দু'জায়গায় আমার চোখে জল এসেছিল।

কাল সিনেমায় গিয়েছিলেন বুঝি?

যেতে হয়েছিল, সাধ করে কি আর গিয়েছি। আমার সারা বিকেল মাথা ধরে আছে, তবু ছাড়ল না।

কে ছাড়লনা দিদি?

আবার দিদি। বলবে মল্লিকাদি। ছাড়ল না আমার জ্যাঠতুতো ভাই।

আপনার জ্যাঠতুতো ভাই, মল্লিকাদি। আপনার ছোট?

আঙ্গুলে বয়সের হিসেব করে মল্লিকা বলল, অনেক ছোট। প্রায় দু'বছর হবে। কেন তুমি দেখনি? সেই যে, রোজ গাড়ি নিয়ে বিকেলে আসে? ও আবার সিনেমার কাজ করে কিনা। ডিরেক্টর।

সাবিত্রী তখন কিছু বলল না, বলল অনেক পরে মন্মথকে, গরম ভাতের থালায় হাওয়া দিতে দিতে।

না জেনে শুনে আমাকে কী একটা বাসায় এনে তুলেছ, শুনি?

খাওয়া বন্ধ করে মন্মথ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। ফিস ফিস করে সাবিত্রী বলল, তোমাকে সেদিন বলিনি? ও-পাশের ঘরে থাকে একটা নষ্টচরিত্তের মেয়েমানুষ। আমি এখানে থাকব কী করে বলো তো। তুমি তো বেরিয়ে যাও সারাদিনের মতো! একটু থেমে বলল, সেদিন বলেছিল মামাতো দাদা, আজ বলেছে জ্যাঠতুতো ভাই। মামাতো ভায়েরা রাতারাতি জ্যাঠতুতো ভাই হলে আসল সম্পর্কটা কী হয়, মুখ্যু হলেও সেটুকু বুঝতে পারি।

মন্মথ ফের মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। বলল, তুমি বেশি মেশামেশি কোরোনা। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে ঘেঁষতে পাবে না।

ওর চরিত্রতেজের ওপর স্বামীর অটুট শ্রদ্ধা আছে জেনে সাবিত্রীর বুক ভরে গেল।

দুপুরে মন্মথ অফিসে বেরুচ্ছে, সাবিত্রী বলল, আজ কিন্তু বাসার খোঁজ আনা চাই।

মন্মথ বলল, আচ্ছা।

ফিরতে ফিরতে মন্মথর রাত আটটা বেজে গেল। দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, পেলে খোঁজ।

কিসের?

বাসার।

জামা খুলে মন্মথ হুকে টাঙিয়ে রাখল, জবাব দিল না।

ভাত বেড়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, কাল যদি নতুন বাসার খোঁজ না কর, তবে আমি মাথা খুঁড়ে কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখলুম।

বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, বাসার খোঁজ পাওয়া কি অত সহজ নাকি।

তাই বলে খুঁজবে না তুমি।

ডালের বাটিতে সুড়ুৎ চুমুক দিয়ে মন্মথ বলল, খুঁজব, খুঁজব। অত ব্যস্ত হলে কি চলে।

হাতাটা ঠং করে মেঝেয় ফেলে দিয়ে সাবিত্রী তিক্ত গলায় বলল, আমাকে একটা বেশ্যাবাড়িতে এনে তোলার সময় মনে ছিল না?

মন্মথর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বলল, তোমাকে বেশ্যাবাড়ি এনে তুলেছি আমি?

সাবিত্রীর চোখ দু'টো তখনও জ্বলছে। রুদ্ধস্বরে বলল, বেশ্যা ছাড়া কী। দিনরাত রঙ মাখে, সঙ সাজে, ও কী-জাতের মেয়েমানুষ আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যদি বন্দোবস্ত না করো, আমিই করব। কালই বেহালায় চলে যাবো।

ভাতের থালায় জল ঢেলে দিয়ে মন্মথ বলল, তাই যাও। তবু যদি সেখানে কী সুখ আমার জানতে বাকি থাকত। বাপ নেই, মা ছেলেবৌয়ের কাছে চোর হয়ে আছে। ভাইয়ের ছেলের কাঁথাবদলানো থেকে ভাজের কাপড় কাচা অবধি সব কাজ করতে হয়নি সেখানে? দু'বেলা হেঁসেল ঠেলা, আর ঠেস দেওয়া কথা শোনা। দু'খানা শোবার ঘর পর্যন্ত নেই। শনিবার শনিবার আমি যেতাম, শুতে দিত চিলে কুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিয়ে বিনিয়ে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চলো। তোমার সঙ্গে না হয় গাছতলাতে থাকব, সেও সুখ? ও-কথাগুলো কি থিয়েটারে শিখে এসে মুখস্থ বলেছিলে।

একটা মাদুর নিয়ে সাবিত্রী আলাদা শুতে যাচ্ছিল। মন্মথ বলল, খাবেনা তুমি?

উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে সাবিত্রী চাপা কান্নাভাঙা গলায় বলল, আজ আমাকে বাপের বাড়ির খোঁটা দিলে তুমি। আমি জলটুকুও ছোঁব না।

ছোঁবেনা?

না।

থাকো তবে। একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের রকে শুতে গেল।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, সারা গা ব্যথাব্যথা। ঘরে এসে আয়নায় দেখল চোখ দুটি লাল। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে স্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। এক পেয়ালা চা এনে মন্মথর সমুখে রেখে চলে যাচ্ছিল, মন্মথ ডাকল, শোন।

ভিজে চুল, খোলা, তখনো সিঁদুর পরেনি, সাবিত্রীর কপাল প্রাক্‌সকাল আকাশের মতো স্নিগ্ধ, নিষ্প্রভশুভ্র। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারারাতকাঁদা চোখ দুটিতে করুণ ক্লান্তি। মন্মথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারল না। সাবিত্রী মাটির দিকে অপলক চেয়ে আছে। মন্মথ অনেকক্ষণ পরে ডাকল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকালো। পাতা দুটি কেঁপে উঠল একবার, একটু ভিজল, ঠোঁট দুটি থরথর হ'ল। উঠে গিয়ে মন্মথ সামনে দাঁড়াল সাবিত্রীর, একখানা হাত কাঁধের ওপর রাখল। সরে যেতে চাইল সাবিত্রী, হাতখানা সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু সরতে গিয়েও সরতে পারল না, আরো বেশি করে ধরা পড়ল, ঢলনামা মুখ ডুবিয়ে দিল মন্মথর বুকে।

পরক্ষণেই হাসিকান্না মুখখানা তুলে বলল, একি তোমার গা এত গরম।

মন্মথ সামান্য হাসল।

সাবিত্রী বলল, কাল আবার রাগ করে বাইরে শোয়া হয়েছিল। আজ অফিসে যেতে পাবেনা তুমি।

মন্মথ বলল, ও কিছুনা। অফিসে যেতেই হবে। তুমি বাসাবাসা করে পাগল হয়ে আছ, তাই তোমাকে বলিনি। আমাদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। এ-সময়ে সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। গরহাজির হলে গোলমাল হতে পারে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সরে গেল সাবিত্রী। সশঙ্ক স্বরে বলল, তোমারও চাকরি যাবে নাকি।

যেতে তো পারেই। আমদানী রপ্তানীর ওপর আমাদের অফিস, মাল আসছে না নিয়মিত বিদেশ থেকে। পাকিস্তানেও চালান যাচ্ছে না।

একটু চুপ করে থেকে মন্মথ আবার বলল, দু'দিন একটু চুপ করে থাকো। চাকরির ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এর মধ্যে আর নতুন বাসার হাঙ্গামা

করে কাজ নেই। একটু নিচু গাঢ়গলায় মন্মথ বলল, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেরা সন্দেহ করে যেন ছোট না করি। আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনের কাছে দু'জনের দাম থাকলেই হল।

বাজারের থলি হাতে মন্মথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী ডাকল, এই শোন।

মন্মথ ফিরে তাকাল। সাবিত্রী বলল, গেঞ্জিটা ছেড়ে দিয়ে যাও, ওটা পরে আর বাইরে যায় না। লোকে বলবে কী।

সিঁদুরে চোখের জলে বুকের কাছটাতে মাখামাখি। মন্মথ একটু হেসে গেঞ্জিটা খুলে দিল।

একটু পরেই মল্লিকা এসে দাঁড়াল দরজায়। মিটি মিটি হেসে বলল, কাল রাত্তিরে বুঝি কত্তাগিন্নীতে ঝগড়া হয়েছিল?

সাবিত্রী লজ্জিত গলায় বলল, কই, নাতো।

ইস, আবার লুকোনো হচ্ছে।

আপনি কি করে জানলেন।

হাত গুনতে জানি যে। ঘরে খড়ি পেতেছিলাম। না ভাই, খড়ি নয়, আড়ি। কাল আড়ি পেতেছিলাম তোমাদের দরজায়। সাবিত্রী তবু বিশ্বাস করছে না দেখে মল্লিকা বলল, কাল তোমার কর্তাকে রকে ঘুমোতে দেখলাম কিনা তাই। শেষ শো'তে থিয়েটার দেখেছি কাল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দেখছ না চোখদু'টো ফোলাফোলা, ভালো ঘুম হয়নি কিনা তাই। একটু থেমে মল্লিকা বলল, কাল তোমরাও তো ঘুমোওনি। চোর এলে কিন্তু মুশকিলে পড়ত ভাই। বলে মল্লিকা হাসল।

কিন্তু সাবিত্রী হাসল না। সেই লজ্জাটুকু ঢাকতে মল্লিকাকে একটু বেশি করে হাসতে হল।

এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ানো যায় না। এক বাসায় থাকতে গেলে দু'চারবার মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয়। বিশেষ, মল্লিকা যেদিন একবাটি মাংস নিয়ে রান্নাঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, সেদিন আর সাবিত্রী না বলতে পারলো না। একটুখানি চেখে বলল, চমৎকার হয়েছে মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, বুনো পাখি। শশাঙ্করা বাইরে গিয়েছিল, শিকার করে এনেছে। ভারি চমৎকার স্বাদ না?

শশাঙ্কই যে মল্লিকার সেই জ্যাঠতুতো কিম্বা মামাতো ভাই, সাবিত্রী জানত। চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কী রাঁধলে ভাই? কী মাছ, দেখি।

সেদিন বাজার থেকে মাছ আসেনি, কিন্তু মাথা কাটা গেলেও সাবিত্রী সে-কথা স্বীকার করতে পারবে না। বলল, দেরিতে বাজার এসেছে, এ-বেলা বেশি কিছু হয়নি মল্লিকাদি। অল্প চারটি খেয়েই অফিসে গেছেন। ও-বেলার জন্যে রেখে দিয়েছি বাঁধাকপি আর মাছের মুড়ো।

চলে যেতে যেতে মল্লিকা বলল, ও-বেলা আমার এক বাটি চাই কিন্তু।

মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ। তখন থেকে কেবলি প্রার্থনা করেছে, হে ঠাকুর, আজ যেন উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরেন, কিন্তু মন্মথ ফিরল সাতটা বাজিয়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্মথ জামা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাবিত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুলো না। তোমাকে এখুনি বাজারে যেতে হবে।

বিস্মিত বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, কেন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো সাবিত্রী। সন্তর্পণ গলায় বলল, একটা বাঁধা কপি আনবে, আর একটা মাছের মুড়ো।

মন্মথ বিদ্রূপ করে বলল, হঠাৎ এত সখ যে। এত খাবার সাধ—পোয়াতি হলে নাকি আবার?

সাবিত্রী বলল, চুপ চুপ, আস্তে। সাধ নয় গো মান। আমার মান বাঁচাতে পারো একমাত্র তুমি। তারপর সাবিত্রী ফিসফিস করে সব কথা বলল। শুনে কঠিন হয়ে গেল মন্মথর মুখ। কী ফ্যাসাদ বাধিয়ে আছ বলো তো। মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই, শেষ রেশনটা বাদ দেবো কিনা ভাবছি,—তার ওপর এসব কী পাগলামি। তোমাকে বারবার বলিনি, আমরা দু'জনকে নিয়ে দু'জন, কারুর কাছে ছোট হবো না, তাই বলে ছোট কাজও করব না কখনোও, কেন কেন তুমি পাল্লা দিতে চাও অন্যের সঙ্গে?

মন্মথর হাত দু'খানা চেপে ধরল সাবিত্রী। ধরা গলায় বলল আর করব না। কিন্তু আজকের মতো আমাকে বাঁচাতেই হবে। না-হয় কোন হোটেল থেকে একবাটি কিনে নিয়ে এসো। কম খরচে হবে।

হাত ছাড়িয়ে মন্মথ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, পাগলামি ক'রনা। আমি এখন যাই, হোটেলে হোটেলে খোঁজ নিইগে কোথায় বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মুড়ো রাঁধা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত, মন্মথ কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারের একটা বাটিতে বাঁধাকফির ঘণ্ট জোগাড় করে আনলও। অনেক রাতে, শুতে এসে সাবিত্রী বলল, হোটেলের রান্না, মল্লিকাদি কিছু টের পায়নি কিন্তু! খুব সুখ্যাতি করছিল।

সেদিন দুপুর থেকেই মল্লিকার ঘর সাজানোর ঘটা দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। যেখানে যত ঝুল ছিল, সব সাফ করেছে মল্লিকা, বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধুয়েছে। খাটটা ছিল ঘরের মাঝখানে, সেটাকে টেনে এনেছে এক কোণে। ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেছে আয়নার কাঁচ। ফুলদানীতে টাটকা তাজা ফুল, জাজিমের ওপর ধবধবে চাদর।

কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে গায়ে মুখে মাথায় সাবান মেখেছে মল্লিকা, বারান্দায় সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। সাবিত্রী সারাক্ষণ উঁকি দিয়ে দেখছে মল্লিকার কাজ। বলল, আজ যে এত ঘটা মল্লিকাদি?

মল্লিকা মুচকি হাসল। বলল জানো না? আজ যে আমাকে দেখতে আসবে ভাই। তা কেউ তো নেই, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি।

সাবিত্রী বলল, ঠাট্টা!

কেন আমাকে বুঝি দেখতে আসতে পারেনা? আমার বিয়ের বয়স কি একেবারেই গিয়েছে ভাই! দেখতো কেমন টান টান চামড়া, ধবধবে রঙ, মল্লিকা সামনে হাত দু'খানা প্রসারিত করে ধরল।

অপ্রতিভ সাবিত্রী বলল, তা কেন, তা কেন। সত্যি করে বলুন না, মল্লিকাদি কে আসবে আজ।

আমার ক'জন বন্ধু। নেমন্তন্ন করেছি আজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপর কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা আয়নার সমুখে বসে বসে প্রসাধন করল। সাবান দেওয়া চুল ফাঁপিয়ে দিল খোঁপাবাঁধার এক নিপুণ কৌশলে। একটু রঙ, একটু পাউডার ক্রীম মিশিয়ে তৈরী করল অপরূপ ত্বকপ্রলেপ ; ভ্রূরেখাকে দীর্ঘায়ত করল তুলিকায়। হারমোনিয়ামের নিখুঁৎ সাজানো রীডের মতো দাঁতের পাঁতি বার করে যখন হাসল, সাবিত্রী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, আপনার বন্ধুরা এসে পড়বেন। আমি এখন যাই মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, আহা, ব'সনা।

এখনও ঘর সাজানো একটু বাকি ছিল, এটাওটা এখানে সেখানে সরাতে লাগল ; টুলের ওপর বসে মেয়েকে দুধ দিতে দিতে সাবিত্রী দেখতে থাকল নির্নিমেষে।

ঠিক সেই সময়ে বারান্দায় মশমশ জুতোর শব্দ শোনা গেল, আজ এক সঙ্গে অনেক জোড়া। পালাবে কি, দরজা তো মোটে একটা। মাথার কাপড় সামলাতে গিয়ে কাপড় আলগা হয়ে পড়ল, পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল গোড়ালির ওপরেও খানিকটা জায়গায় উপযুক্ত প্রচ্ছদ নেই।

খুকিকে একরকম জোর করেই দুধ ছাড়াল সাবিত্রী, মেঝেয় শুইয়ে দিল, ব্লাউজের বোতামগুলি পট পট করে বন্ধ করল কোনক্রমে। খুকিকে কোলে নিয়ে দৌড়তে যাবে, চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্ক, একেবারে মুখোমুখি।

না-জানি আজ একটা গোটা আতরের শিশিই ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর রুমালে শশাঙ্ক উজাড় করে এসেছে, গন্ধে সাবিত্রীর গা-বমিবমি অনুভূতি এলো। চৌকাঠ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হ'ল ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বুঝি। অসম্বৃত গিলে আস্তিন আদ্দির জামাটা বুঝি সেঁটেই রইল আঁচলে, হীরে ঠিকরানো আঙ্গুলের শর বিঁধে রইল পিঠে, ঠিক যেখানটায় ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে।

তা ছাড়া ঘরে এসেও সাবিত্রী ভুলতে পারল না শশাঙ্কর চাউনি। কী আতুর, আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে ছিল লোকটা। পাতের পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি। সাবিত্রী সারা শরীর ভরে শিহরণ অনুভব করল।

শনিবার, মন্মথ সেদিন একটু তাড়াতাড়ি ফিরল। ঘরে পা দিয়েই একরকম চেঁচিয়ে উঠল, কী হচ্ছে কী হচ্ছে ও-ঘরে।

সাবিত্রী বলল, একটু আস্তে কথা বলতে পারোনা? গান। মল্লিকাদি গান গাইছে। ও-ঘরে আজ কত লোক এসেছে জান।

ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে গেল মন্মথর মুখ। জানালা দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, ছি-ছি-ছি। ওরা বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করলে দেখছি।

খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে সাবিত্রী বলল, ঘুঙুরও বাজছেনা?

মন্মথ তখন ভেন্টিলেটর দুটো বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে। বলল, ওসব শুনে কাজ নেই।

এক একবার গান থামে, সাবিত্রী বলে, এই বুঝি ওদের আসর ভাঙলো। কিন্তু ভাঙেনা। একটা শেষ হতেই এক পশলা হাততালির তারিফ শোনা যায়, পরক্ষণেই হারমোনিয়ামটায় নতুন সুর ককিয়ে ওঠে।

মন্মথ বলল, কী কেলেঙ্কারি। এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এতদিনে পরিষ্কার বোঝা গেল। ছি-ছি পেটে খাবার জন্য কত ছোট কাজই না করে মানুষ। বলতে বলতে মন্মথর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ; আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস করে শরীর শুকিয়ে মরলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচু করিনি। কালই বাড়িওয়ালাকে বলব আমি। একটা বিহিত করতে হবে।

সাবিত্রী ভেবেছিল মল্লিকা পরদিন মুখ দেখাতে পারবেনা ওর কাছে। আশ্চর্য, পরদিন কলতলায় মল্লিকাই সেধে কথা বলল।

এমন বেহায়া মেয়ে, বলল, কাল কেমন গান শুনলে ভাই।

সাবিত্রী কোন জবাব দিল না।

মল্লিকা বলল, উঃ, কী ধকল গেছে কাল। থামতেই চায় না। একটা শেষ হতে আরেকটার ফরমাস করে।

সাবিত্রী বাঁকা গলায় বলল, কাল যারা দেখতে এসেছিল, তাদের আপনাকে পছন্দ হয়েছে মল্লিকাদি?

কুলকুচির জল সশব্দে দূরে ছিটিয়ে সশব্দে হেসে উঠল মল্লিকা। ওমা, তুমি এখনো ঠাট্টার কথাটা মনে রেখেছ? আমাকে দেখতে তো আসেনি। শীগগিরই আমরা একটা গীতিনাট্য অভিনয় করব কিনা, কাল আমার ঘরে তার মহলা হ'ল। আসছে পূর্ণিমায় শো। নাট্যপীঠ থিয়েটারও ভাড়া নেওয়া হয়েছে, জান?

সাবিত্রী নীরবে কাপড় কাচতে লাগল। মল্লিকা হঠাৎ কাছে ঘেঁসে এলো। সাবিত্রীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থাকো ভাই। কাল শশাঙ্ক তোমাকে একেবারে স্পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে। কী বলব, ওর মাথা ঘুরে গেছে একেবারে। ওরা এবারে যে ফিলিমটা তুলছে, তাতে নাকি ছোট্ট একটি মায়ের পার্ট আছে। খুকিকে তুমি দুধ দিচ্ছিলে না—ঠিক অমনি একটা পোজ ওদের চাই।

সাহস পেয়ে আরো কত কী বলত মল্লিকা ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সাবিত্রী দুমদাম পা ফেলে উঠে গেল। মুখ ফিরিয়ে বলে গেল, তুমি মরো মল্লিকাদি।

রবিবার বাড়িওয়ালার কাছে যাই-যাই করেও মন্মথ আলসেমি করে সারাদিন বাসায় কাটিয়ে দিল। সোমবার অফিসফেরৎ যাবার কথা ছিল, সেদিন বেলা তিনটের সময়ই সটান চলে এলো বাড়ি। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঘরে গিয়ে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল।

মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়েছিল সাবিত্রী, ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল একি, এত শীগগির ফিরলে আজ? তাহলে আজ সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

কঠিন চোখে তাকাল মন্মথ। বলল, হ্যাঁ। সেইটেই বাকি আছে। সিনেমা দেখারই সময় আমাদের।

ভয় পেয়ে আরো কাছে ঘেঁষে এলো সাবিত্রী। মন্মথর কপালে উদ্বিগ্ন করতল রাখল ; ভিজে হাত গরম ঠেকল, কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেল না, তখন গাল কাৎ করে রাখল মন্মথর কপালে। বলল, জ্বর হয়নি তো।

পাশ ফিরে সরে গেল মন্মথ। বিষণ্ণ ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলল, জবাব আমার কপালে লেখা নেই, সাবিত্রী, জামার বুক পকেটে আছে। উঠে গিয়ে দেখ।

অফিসের ছাপমারা লেফাফা দেখে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। খাম না খুলেই বলল, এ কী ছাঁটাই?

মন্মথ এ-প্রশ্নের জবাব দিল কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে।

মল্লিকা উঁকি দিয়ে বলল, ওমা খুকিকে এখুনি ভাত দিয়েছ ভাই? বয়স কত ওর—দাঁত উঠেছে?

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলল, উঠেছে দিদি, ওপরনীচ মিলিয়ে ছ'টা। ভীষণ পেটের অসুখ যে ওর, তাই ভাবছি আজ দুধ দিয়ে কাজ নেই।

মল্লিকা মুখ টিপে হাসল : কলকাতার দুধ তো সিকিটাই জলমেশানো, পাথরভর্তি চালের চেয়ে সেটা পেটের পক্ষে ভালই হত সাবিত্রী।

মুখ টেপার রকম দেখে সাবিত্রীর সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, বেশ্যা, হারামজাদি।

সন্ধ্যার পর নিজেই একটা দরখাস্তর মুসাবিদা করছিল মন্মথ, আপনমনে হাসছিল। সাবিত্রী পাশে এসে বসল। মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, হাসছ যে। আজ কোথাও কোনো আশা পেয়েছ?

মন্মথ বলল, না। আজ আলফ্রেড এণ্ড জ্যাকসন কোম্পানীর বড়বাবুকে কেমন জব্দ করেছি সেই কথাই ভাবছি।

সাবিত্রী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে দেখে মন্মথ গল্পটা বলল : আরে না-কামানো গাল আর খালি পা দেখে ব্যাটা তো কথাই বলতে চায় না। বলে বেয়ারার কাজ নেই বাপু, অন্যত্র দেখ। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললুম, বেয়ারার কাজ চাইনে স্যার, ক্লারিকাল। আমি সাত বছর সিমসন জোসেফের বাড়ি ক্লার্কের কাজ করেছি। আমার চেহারা আগাগোড়া দেখে নিয়ে—চোখ তো নয় শালার, যেন বুরুশ—বড়বাবু বললে, তুমি! বললুম, ভদ্রলোক স্যার, দস্তুরমত আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। জ্যাঠামশায় মারা গেছেন স্যার, তাই ......। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল ব্যাটার। বললে, অশৌচ কেটে যাক, একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। দেখি ছোট সাহেবকে বলে কিছু করতে পারি কিনা। মন্মথ হো-হো করে হাসতে লাগল।

নিয়ে যাও তবে দরখাস্ত? সাবিত্রী বলল।

আরে সেখানেই তো মুশকিল। দরখাস্ত তো কালই নিয়ে যেতে পারি। না হয় দু'আনা খরচ করে দাড়ি কামিয়ে বললাম, শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল স্যার। কিন্তু পা দু'খানা মুড়ি কি দিয়ে।

অনামিকা থেকে নিঃশব্দে বিয়ের আংটিটা খুলে সাবিত্রী মন্মথর হাতে দিল। মন্মথ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, কালই একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।

সাবিত্রী চায়না, না ঘেঁষতে, না মিশতে, তবু কি কম্‌লি মল্লিকা ছাড়ে। মন্মথ বেরিয়েছে টের পেয়েছে কি এ-ঘরে এসে বসবে। বিব্রত, বেআব্রু করবে সাবিত্রীকে একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি প্রশ্নে।

গায়ে যে বড়ো একটাও জামা রাখনি সাবিত্রী?

কুণ্ঠিত সাবিত্রী আরো জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করে বলে, বড় গরম যে মল্লিকাদি?

গরম? হাসালে ভাই তুমি আমাকে। চারদিন থেকে সমানে বিষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া, আমরা রাত্তিরে চাদর গায়ে দিচ্ছি, তবু তোমার গরম গেল না। অবাক করলে ভাই। এ-গরম তোমার বয়সের।

মল্লিকার গলাটা টিপে ধরলে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে বুঝি রাগ যেত সাবিত্রীর। কিন্তু উপায় নেই। মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবে না কিছু। গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে রাখতে হবে এই দুঃখ ; এই অনটন, যা অনশনের সোদর। কিন্তু পুঁজেরক্তে ছেঁড়া কাপড়খানাও যে মাখামাখি হয়ে গেল, সাবিত্রী লুকোবে কি?

মল্লিকা বলল, আজ দুপুরে একটু বেরুবো। ঘরখানার ওপর একটু নজর রেখো। সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম।

কোথায় যাবে, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেনি, মল্লিকা নিজেই বলল।

রেসে যাবো ভাই। শশাঙ্করা খুব ধরেছে। সারাদিনের ধকল, শরীরে কি এত সয়! দম নিয়ে ফের বলল, তা শশাঙ্ক বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। জিতিয়ে দেবে কিন্তু তোমাকে ঠিক। পাঁচ টাকায় পাঁচশো। সেই যে ম্যাজিক আছে না, ধুলোমুঠো সোনা হয়ে যায়? এ তাই।

পাঁচ টাকায় পাঁচশো, মল্লিকাদি?

ওই কথার কথা। তা তেমন তেমন ঘোড়া মিললে হয় বৈকি। আর তিন টোটের খেল মেলাতে পারলে তো কথাই নেই,—রাতারাতি বড় মানুষ।

সাবিত্রীর চোখ দু'টো জ্বলছিল। মল্লিকা বলল, অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে।

সাবিত্রী শুকনো গলায় বলল, এমনি।

কিন্তু মল্লিকা বেরিয়ে যেতেই সাবিত্রী চালের হাঁড়িতে হাত দিল। বেরুল টিনের একটা কৌটা, সেই কৌটার মধ্যে ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। গিঁট খুলতে ছড়িয়ে পড়ল

পয়সা, সব শুদ্ধ সওয়া পাঁচ আনা। মন্মথর চাকরী হলে কালীঘাটে পূজো দেবে বলে কবে যেন সাবিত্রী আলাদা করে রেখেছিল।

মল্লিকার তখনো সাজগোছ সারা হয়নি, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মল্লিকা তখন কণ্ঠায়, ঘাড়ে, কনুই অবধি পাউডার মাখছে। ফিরে তাকিয়ে বলল, কী ভাই।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। তারপর সঙ্কোচ জয় করে নীচু গলায় বলল, কম পয়াসায় রেস খেলা যায় না, মল্লিকাদি?

মল্লিকার চোখে মুখে কৌতুক ছড়িয়ে পড়ল বলল, কত কম পয়সা, ভাই!

এই ধরো স'পাঁচ আনা?

স'পাঁচ আনা কেন, পাঁচ আনাতেই চলবে। আমার চেনা বুকি আছে কত ; তুমি খেলবে?

কুণ্ঠিত, কাঁপা হাতে সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুঁজে দিল। মল্লিকা বলল, ঘোড়া?

সাবিত্রী বলল, ওসব আমি বুঝিনে, তোমার যা ভাল মনে হয়, ক'র মল্লিকাদি।

সেই পাঁচ আনা সুদে-আসলে ফিরে এলো কিন্তু। মল্লিকা বলল, তোমার ভাগ্য ভাল সাবিত্রী আমরা এলোমেলো খেলে ফতুর, কিন্তু তোমার নামে যেটা ধরলুম, সেটাই বাজি নিলে। তবে পেমেন্ট ভাল হয়নি, নামী ঘোড়া কিনা। পাঁচ আনায় পেয়েছে আট আনা।

আমার এই ভালো মল্লিকাদি, সাবিত্রী আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে।

চায়ের সঙ্গে ফুলুরি বেগুনী দেখে মন্মথ অবাক হ'ল। পয়সা পেলে কোথায় তুমি?

যেন কতই রহস্য, সাবিত্রী এমন ভঙ্গিতে হাসল।

চাকরির দরখাস্ত লিখে লিখে আর জবাব না পেয়ে পেয়ে মেজাজ আজকাল সর্বদাই তিরিক্ষি মন্মথর, স্ত্রীর কাছেও জবাব না পেয়ে চটে গেল, রোজগার করেছ নাকি?

তবু হাসল সাবিত্রী—যদি বলি তাই।

ঠাট্টাকটু গলায় মন্মথ বলল, আশ্চর্য হবো না, জলজ্যান্ত আদর্শ যখন পাশেই রয়েছে।

কথার ধরনে সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর, তবু মন্মথকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

অন্ধকার হয়ে গেল মন্মথর মুখ। গম্ভীর স্বরে বলল, এও তো এক হিসাবে তোমার রোজগারই। ছি-ছি। তোমাকে বলিনি সাবিত্রী, ও-সবে কাজ নেই। না খেয়ে থাকবো সেও স্বীকার, তবু তোমার উপার্জন খেতে চাইনে।

কার্তিক মাসের গোড়াতে সাবিত্রী বাপের বাড়ি গেল। ইচ্ছে ছিলনা, শুধু মন্মথের পেড়াপীড়িতে। সাবিত্রী বারবার বলেছে, আমার কিছু ক্ষতি হবে না দেখো। তা ছাড়া, আমাদের এখন এই দুঃসময় চলছে। কার কাছে তোমাকে রেখে যাবো।

মন্মথ বলেছে, সে-ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে। এ-অবস্থায় এত খাটুনি সহ্য হবে না, তার উপর পেট ভরে দুবেলা খেতেও পাওনা। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদ বাধাবে? আর, কদিনের জন্যেই বা। তোমার হিসেব মতো তো আর সাড়ে পাঁচ মাস?

কিন্তু ঠিক পঁচিশ দিনের মাথায় সাবিত্রী ফিরে এলো, ফ্যাকাশে সাদা কাঠি। কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঠেছে, পেট চুপসে ছুঁয়েছে পিট।

মল্লিকা বলে, ছেলে কোলে করে আসবে ভেবেছিলাম, তা এ কী চেহারা নিয়ে এলে, ভাই?

সাবিত্রী বলল, ও-শত্তুর না এসেছে ভালই হয়েছে মল্লিকাদি। এলে খাওয়াতাম কী।

কী হয়েছিল রে।

কিচ্ছুনা। শরীরটা এখান থেকেই খারাপ নিয়ে গিয়েছিলাম তো। রোজই ঘুষঘুষে জ্বর হত। ওখানে গিয়ে কলতলায় মাথা ঘুরল একদিন,—ব্যস।

শরীরটা দু'দিন একটু সেরে এলেই পারতে।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ দিনকতক ঘোরাঘুরি করছে। ব্যবসা করছে বলে। বাপের বাড়ি যাবার আগেই সাবিত্রী শুনে গিয়েছিল, এক বন্ধুর প্রেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে মন্মথ, কাজ দিলে কমিশন। লক্ষ্মীর কৌটো কুড়িয়ে কাচিয়ে বেরিয়েছিল পাঁচ টাকা, খুদ বিক্রী করে আরো দেড়। একটা ট্রামের মান্থলি কিনেছিল মন্মথ।

একদিন দুপুরে মন্মথ খেয়ে দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ছে দেখে সাবিত্রী বলল, কী গো, আজ কাজে যাবেনা?

মন্মথ হাই তুলে বলল, দূর, দূর। শুধু ঘোরাঘুরি, শরীরটাই মাটি।

কাজ দিতে পারনি তেমার বন্ধুর প্রেসে?

দিয়েছি তো। মন্মথ খাটের নিচে রাখা লেটার হেডের স্তূপ দেখিয়ে দিল, ওগুলো দেখতে পাওনি? চক্রবর্তী এণ্ড দত্ত,—অর্ডার সাপ্লায়ার্স।

কোন কোম্পানী?

কোম্পানী আমি নিজেই। দত্ত নামটা দিয়েছিলাম মনগড়া। শুধু একটা নাম কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনায় বলে। ওগুলো কাল সের দরে বেচে দিও।

আরেকটা কাজের কথা অনেক দূর এগিয়েও হল না। কোন একটা ফার্মের ট্রেড রিপ্রেসেন্টেটিভ। কলকাতার বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে। একশো টাকা মাইনে, রাহা খরচা, উপরন্তু বিক্রির ওপর দু' পারসেণ্ট কমিশন। সে-অফিসের মাঝারি একজন কেরাণীকে পান খেতে কিছু হাতে গুঁজেও দিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে গেল মন্মথ। ফিরে আসতে সাবিত্রী বলল, হল?

না। মন্মথ বলল, জোচ্চোর শালা জোচ্চোর—পাঁচশো টাকা জমা রাখতে চায়। আরে তোদের মাল নিয়ে কি সরে পড়তাম আমি? এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস না?

মন্মথ বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সাবিত্রীই জামিনের টাকা চেয়েছে। যেন সাবিত্রীই ওকে, বিশ্বাস করতে পারেনি।

অন্য লোক নিয়েছে ওরা?

আরে সেই কথাই তো বলছি। যাকে নিয়েছে সে আবার আমার চেনা, প্রভাস গাঙ্গুলী। সেদিন বিয়ে করেছে কিনা, নগদ নিয়েছে ছ'হাজার, বলামাত্তর পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল।

কোন কারণ নেই, তবু সাবিত্রী মাথা নীচু করল। ওর বাবা শুদ্ধমাত্র শাঁখা সিঁদুরে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন, সেই আপশোসই মন্মথ করছে না তো এতদিন পরে, কোলে একটা আসবার পরে, এমন কি আরও একটা নষ্ট হয়ে যাবার পরে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কী দিয়ে। আর মল্লিকা এমন সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে যে লুকোবার উপায় নেই।

মল্লিকা বললে, এত শীগগির আজ খেতে বসেছ ভাই?

পাতে শুধু কলমী শাক সেদ্ধ, আর কয়েকদানা মাত্র ভাত। অন্যদিন হলে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দিত থালায়। কিম্বা বলত, আজ তোমার ভগ্নিপতির তাড়াতাড়ি কাজ ছিল দিদি, বাজারটাও করে দিয়ে যেতে পারেনি ; তা, আমারও শরীর ভাল নেই, দু'টো দাঁতে কাটছি শুধু।

নিজের ঘরে গিয়ে ছোট একটা বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ফিরে এল মল্লিকা, একটু চেখে দেখবে ভাই, নুন দিয়েছি কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

অত্যন্ত সহজ হল, অন্যদিন হলে অপমান বোধ করত, মল্লিকাকে ফিরিয়ে দিত, কিন্তু আজ কী হ'ল সাবিত্রীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কত ভুল না করে মানুষ, কত অকারণে একে অপরকে ঠেলে রাখতে চায় দূরে। পাশের ঘরের এই মেয়েটিকে কেন বরাবর অপছন্দ করে এসেছে সবিত্রী? ওর কাছে আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বলে? অকস্মাৎ সাবিত্রীর মনে হ'ল সেও তো মল্লিকার কাছে কম কথা লুকোয়নি। মল্লিকা গোপন করতে চেয়েছে ওর কলঙ্কের কুলো, সাবিত্রী ওর অভাবের ফুটো কলসী। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রথম অনুভব করল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

বুক ঠেলে খানিকটা লবণাক্ত কান্না ছাপিয়ে পড়ল সাবিত্রীর চোখে।

সেদিন সাবিত্রী একটা অসমসাহসিক কাজ করল।

তেমন কিছু রোদ নেই তবু চোখ দু'টো গরম, কান ঝাঁঝা করছে। অনভ্যস্ত পায়ে বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। ধারকরা স্যাণ্ডালটার স্ট্রাপ যেন চামড়া কষে ধরেছে।

একা পথ চলার অভ্যাস নেই, ভয় ছিল ঠিক চিনতে পারবে কিনা। মল্লিকা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিল,—বিশেষ অসুবিধা হল না।

ঘড়িতে দেখল তখনো সিনেমা শুরু হতে মিনিট পনেরো দেরি। ধপ করে একটা কৌচে বসে পড়ল সাবিত্রী। মল্লিকার দেওয়া গন্ধ রুমালে মুখের ঘাম মুছল।

কিছুই লুকোয়নি আজ মল্লিকার কাছে। মন্মথর চাকরি না থাকার কথা ; অভাবের কথা ; উপোষ দেওয়ার কথা। সব অহংকার, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বলেছে, তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দাও। নিজের জন্য ভাবিনা। কিন্তু চোখের ওপর মেয়েটা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, সহ্য হয় না।

কী-কাজ করবে তুমি?

তাই-তো, কী কাজ। না-জানি ভাল লেখাপড়া, না সেলাই। টীচার হতে পারবে না, নার্স না দর্জি না। কথাবার্তায় তুখোড় নয় যে টেলিফোনে কাজ নেবে। অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী বলেছে, আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলেছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমায়, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের? শশাঙ্কবাবুকে একবারটি বলে দেখ না মল্লিকাদি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মল্লিকা। দাঁত দিয়ে সূতো কাটতে কাটতে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি বললেও হবে ; কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি রাজি হবে ভাই।

রাজি? হাসতে গিয়েও চোখ দুটো আবার ভারি হয়ে এল সাবিত্রীর। ভিখিরীর আবার বাছবিচার। আমার কিছুতেই ভয় নেই মল্লিকাদি। তুমি বল।

মল্লিকা বলল। সাবিত্রী এত যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। মল্লিকা জোর দিয়ে বলল, অন্যায় কিছু করতে বলছিনা তো, শুধু পাশে গিয়ে বসবে। আমার নামে টিকিট তো কেনাই আছে। আমি জোর দিয়ে বলছি সাবিত্রী, আমি বললে যা হত, এতে তার চেয়ে দশগুণ ফল হবে। নিজের কাজে নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হয় ভাই।

কী সম্মোহন ছিল মল্লিকার অকম্প স্বরে, অপলক চোখে, সাবিত্রীর অন্তস্তল অবধি কেঁপে উঠল। কূয়োর গভীর তলদেশে নির্জীব একটা কণ্ঠ যেন ভেসে উঠল ঃ বেশ আমি রাজি, মল্লিকাদি। টিকিটখানা দাও।

তারপর চলে এসেছে এই ছায়ালোক বায়োস্কোপে। মন্মথ বেরিয়ে গেছে তার অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করেনি।

আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক পাশে এসে বসল। গদি-আসনে সারা শরীর কেঁপে উঠল সাবিত্রীর, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিস্মিত শশাঙ্কই প্রথম কথা বলল, আপনি?

মল্লিকাদির শরীর খারাপ। আসতে পারলেন না। টিকিটটা নষ্ট হবে, তাই আমাকে—

অন্ধকার ঘরে পর্দার ওপরে ততক্ষণ ছবির নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। কী কথা বলছে ওরা, প্রেক্ষাগৃহে কখনো তুমুল হাসি, কখনো স্তব্ধতা। সেদিকে তো চোখ নেই সাবিত্রীর, সেদিকে কান নেই। গলা শুকনো, দেহ আড়ষ্ট চোখে জ্বালা। এই বুঝি নিরালোকতার সুযোগে এগিয়ে এলো একখানি রোমশ হাতের ছোবল। এই বুঝি ওর কোমর জড়িয়ে ধরল একটি দুঃসাহসী লালসা। যতবার শশাঙ্ক নড়েচড়ে বসল, ততবার ভয়ে অন্যদিকে সরে গেল সাবিত্রী ; কতবার যে পাশের হাতলে অন্যমনস্ক হাত রাখল, কতবার যে তুলে নিল, হিসেব নেই। একবার খসখস করে উঠল, মনে হ'ল শশাঙ্কর বাঁহাত কী যেন খুঁজছে এদিকে। প্রাণপণ প্রয়াসে শরীরটাকে শক্ত করল সাবিত্রী, মনটাকে প্রস্তুত করল, এমন সময় ফস করে আলো জ্বলে উঠল। আড়চোখে চেয়ে সাবিত্রী দেখল শশাঙ্ক একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বাঁ ধারের পকেটে এতক্ষণ দেশলাইয়ের বাক্স খুঁজছিল।

বুকের ভেতর থেকে রুমাল বার করে সাবিত্রী সন্তর্পণে কপালের ঘাম মুছল।

বিরতির আলো জ্বলতে উঠে গেল শশাঙ্ক, একটু পরে দু'টো আইসক্রীম নিয়ে ফিরে এল। একটা সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলল, কেমন লাগছে।

ঘাড় কাৎ করে সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কী বলল, নিজেই শুনতে পেলনা।

বুঝতে পারছেন? প্রোগ্রাম কিনে দেবো একটা?

সাবিত্রী বলল, না।

কী অসুখ হয়েছে মল্লিকার।

থতমত খেয়ে সাবিত্রী বলল, বেশি কিছু না। এই—এই মাথাধরা আর কী।

আবার আলো নিবল। আবার সেই ছাইছাই ফিকে অন্ধকার, পর্দায় মুখর ছবির অবিরাম গতি, সেই দমবন্ধ ভয়, ঘামঘাম অস্বস্তি। কিছু বুঝলনা সাবিত্রী, বুঝতে চাইল না, পালা করে হাতলে হাত রাখল, তুলে নিল, সরে বসল, সরে এলও, বারবার একটা অগ্রসর পুরুষ হাতের স্পর্শ কল্পনা করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধ্বক ধ্বক শব্দ শুনল।

শেষ বারের মতো আলো জ্বলতে সব লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মতো সাবিত্রী অনুসরণ করল শশাঙ্ককে, বাইরে আসতে পাঁচমিনিটের বেশি লাগল।

শশাঙ্ক বলল, কিছু খাবেন?

না-বলতে গিয়েও সাবিত্রী কিছু বলতে পারল না, ওর কথা বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। পর্দা ঠেলে একটা ছোট কামরায় বসল দু'জনে। শশাঙ্ক বলল, কী আনতে বলব।

অস্বচ্ছন্দ শুকনো গলায় সাবিত্রী কোনমতে বলল, এক গ্লাস জল।

শুধু জল? তা কি হয়। শশাঙ্ক কিছু খাবারও ফরমাশ করল।

যতক্ষণ সিনেমার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সাবিত্রী লক্ষ্য করেছে, ভয় করেছে শশাঙ্কের হাত দু'খানাকে ; এবারে খাবারের টেবিলের তলা দিয়ে ওর পা দু'খানার দিকে নজর পড়ল। মিহিগিলে কোঁচাটা শুঁড়ের মত লম্বা হয়ে একজোড়া চকচকে কালো নিউ-কাটের গন্ধ শুঁকছে। সেই মশ্‌মশ্‌ জুতো। সাবিত্রী কাঁপল, পা দু'খানার নিম্নতম প্রান্ত অবধি শাড়িতে ঢেকেও স্বস্তি হলনা, টেনে নিল চেয়ারের নিচে। তবু যেন চোখ বুঁজে অনুভব করল আরেক জোড়া পা নিঃশব্দে, গুটিগুটি এগিয়ে এসেছে : নতুন স্যাণ্ডালের ফিতেয় পায়ের পাতার যেখানটা কেটে গিয়ে জ্বালা করছে, তার ওপর সাবিত্রী যেন বারবার কঠিন একজোড়া নিউ-কাটের চাপ অনুভব করল।

শশাঙ্ক বলল, আপনার বুঝি সিনেমা দেখার বিশেষ অভ্যাস নেই?

এতক্ষণে সাবিত্রী সম্বিৎ ফিরে পেল। হঠাৎ মনে পড়ল, আসল কাজই বাকি রয়ে গেছে। যে জন্যে এত আয়োজন করে আসা, সেই কথাটাই বলা হয়নি শশাঙ্ককে।

বলল, না। আপনারা—আপনি তো খুব দেখেন, না।

আমি? আমাকে তো দেখতেই হয়। আমি সিনেমায় কাজ করি জানেন না?

ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। চায়ের পেয়ালায় শশাঙ্ক চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু পরেই বিল নিয়ে এসে দাঁড়াবে বয়। যা বলার আছে সাবিত্রীর, এই বেলা। তবু কি সোজাসুজি বলতে পারল। প্রথমে জিজ্ঞাসা করল স্টুডিও সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর। কেমন করে তোলা হয় ছবি, কথা গাঁথা হয় কি-করে। তারপর শুনতে চাইল, কী-কী ছবি উঠছে এখন।

শশাঙ্ক বলল, একখানা মোটে। তাও কাজ এগোচ্ছেনা। বাজার খারাপ। বারবার মার খেয়ে এ-ব্যবসা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সবাই।

নিজে থেকে শশাঙ্ক প্রস্তাব করবে, সে আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! বিল চুকিয়ে দিতে শশাঙ্ক পাঁচটাকার একখানা নোট দিয়েছে, খুচরো পয়সা এখুনি ফেরৎ নিয়ে আসবে বয়। আর সময় নেই।

মরীয়া হয়ে সাবিত্রী বলল, মল্লিকাদি বলছিলেন, আপনাদের ছবিতে নাকি—নাকি একটা পা-পার্ট খালি আছে। লোক খুঁজছেন আপনারা।

স্মিতচোখ দু'টির ওপরে শশাঙ্কর ভ্রূজোড়া সন্নিহিত হয়ে এল ঃ মল্লিকা বলেছে আপনাকে? কবে?

কিছুদিন আগে। জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর। মাথা নীচু করে বলে যেতে লাগল আমাদের বড় অভাব শশাঙ্কবাবু। তাই ভাবছিলাম, আমি যদি ... আমাকে যদি—

সিগারেট বার করে দেশলাইয়ের বাক্সে সজোরে বারবার ঠুকল শশাঙ্ক। বলল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী। মল্লিকাকে যখন বলেছিলাম তখন স্বাভাবিকভাবে মায়ের পার্ট করতে পারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম আমরা। তা কাজচালানো গোছের একজনকে দিয়েই সেরেছি। সে-বই তো তোলা হয়ে গেছে, এখন মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে।

সাবিত্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু শেষ বাজি ধরার মতো সুরে বলল, আপনাদের নতুন ছবিতে কোন পার্ট খালি নেই?

আছে। কিন্তু মায়ের পার্ট তো নেই। একটা হিরোয়িন খুঁজছি আমরা। কিন্তু,—সাবিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলল, কিন্তু, ক্ষমা করবেন সাবিত্রী দেবী, সে পার্ট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।

শশাঙ্কর চোখে নিজের চেহারার ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল সাবিত্রী। লজ্জার জোয়ারে সমস্ত রক্ত এসে জড়ো হল মুখে, পরমুহূর্তের ভাঁটায় আবার সব শুকিয়ে কাগজ-সাদা হয়ে গেল। চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালোরেখার পরিখার আড়ালে বসে-যাওয়া দু'টি নিষ্প্রভ চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠাস্থি, শিরাবেরুনো লিকলিকে হাত, সমতল বুকের কবরে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ ; এ-চেহারা হিরোয়িনের সাজে না, এ-কথা শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে খেয়াল হ'ল, এই আশ্চর্য।

শশাঙ্ক বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এবার কিছু করতে পারলাম না। তবে আপনার কথা আমার মনে থাকবে। পরের ছবিতে যদি সুবিধে হয়, খবর দেবো।

একটা গাড়িও করে দিতে চেয়েছিলেন শশাঙ্ক, সাবিত্রী নেয়নি। দ্রুত পায়ে ফিরে আসতে আসতে দোকানের ঘড়িতে সময় দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, খুকী হয়ত উঠে খুব কান্নাকাটি করছে। মন্মথ নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে অনেকক্ষণ, সাবিত্রীকে না দেখে মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। আজ আর রক্ষা নেই। মনশ্চক্ষে সাবিত্রী দেখতে পেল, দাঁতে ঠোঁট চেপে মন্মথ ঘরময় পায়চারি করছে, দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। সাবিত্রীকে দেখে কী করবে মন্মথ? মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে? বার করে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে? ওর হুকুম না নিয়ে বাড়ির বাহিরে পা বাড়ানোর অপরাধের জন্যে চেঁচামেচি, কেলেঙ্কারি করবে?

ঝোঁকের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল যখন, তখন এ সব সম্ভাবনার কথা একবারো মনে হয় নি! সর্বনাশ হতে হলে মেয়েমানুষের কত মতিচ্ছন্নই না হয়।

দরজা খোলাই ছিল। খুকিকে বুকের উপর শুইয়ে মন্মথ ছড়া শুনিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সাবিত্রী কাপড় ছাড়ল, তখনো বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে।

সিনেমা ভাঙল?

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ হাসি মুখে বলল, আরে, জানি জানি। এসে দেখি তোমার মল্লিকাদি খুকিকে লেবেঞ্চুস বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা করছে। ওর কাছেই শুনলাম।

পরম প্রশান্ত মন্মথর মুখ, কী নিরুত্তাপ কণ্ঠ। পায়ের নখ দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল সাবিত্রী। এর চেয়ে মন্মথ সোজাসুজি ধমক দিল না কেন, এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের চেয়ে আঙুল দিয়ে গলা টিপে ধরলেও ভাল ছিল।

মন্মথ বলল, ভাল, ভাল। জুজু-বুড়ি না থেকে নিজের পথ নিজে দেখছ, খুব ভালো। নীচু সুরে বলল, তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল?

কী বলবে?

এই ধরো কাজের কথা। কতরকম জানাশোনা ওদের, তোমাকে একটা কাজ তো জুটিয়ে দিতে পারত? তা তুমিও কিছু বললে না?

না।

হঠাৎ সোজা হয়ে মন্মথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন গলায় বলল, তবে গিয়েছিলে কেন। নিজের দরকারের কথা ভাল করে না বললে লোকে বুঝবে কেন?

অত ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলার আমার অভ্যাস নেই।

মন্মথর বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। —অভ্যাস নেই! নেকি! কচি খুকি। নাক টিপলে দুধ গলে, না? কিসে নিজের ভালো হয়, তাও বোঝ না?

শান্তস্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কিসে?

সে কথার জবাব না দিয়ে মন্মথ বলল, শশাঙ্ক তোমাকে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে যেতে চাইল না?

চেয়েছিল আমি রাজি হইনি।

চে-য়ে-ছি-ল। রা-জি হ-ই-নি। সাবিত্রীর কথাটারই প্রতিধ্বনি করে মন্মথ মুখ ভেংচে উঠল ; রাজি হওনি কেন?

হলেই কি মান থাকত তোমার।

মান ধুয়ে জল খাও, পেট ভরবে। তীব্রস্বরে মন্মথ বলল, কী ক্ষতি হত তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ি করে পৌঁছে দিত?

পলক পড়ছে না, মণি দুটো জ্বলছে মন্মথর। সেই অগ্নিদৃষ্টির সঙ্গে চোখ মেলাতে গিয়ে সাবিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মন্মথ ঠাট্টা করছে না, সত্যিই বুঝি সে চেয়েছিল সাবিত্রী শশাঙ্কের সঙ্গে এক মোটরে আসুক।

একটু ছোঁয়াছুঁয়ির ঘুষ দিয়ে কাজ হাঁসিল হোক।

মন্মথ বলে যেতে লাগল, ওরা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকারও করে। শুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি করে সব মাটি করলে?

ছুটে গিয়ে সাবিত্রী হাত চাপা দিল মন্মথর মুখে, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ করো। বলে আর অপেক্ষা করলনা, টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে মল্লিকার বিছানায়

উপুড় হয়ে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি ; কী হয়েছে সাবিত্রী, অমন করছ কেন।

জবাব শোনা গেল না। উপস্থিত কান্না রোধের প্রাণপণ প্রয়াসে সাবিত্রীর কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেল। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, কী হয়েছে ভাই, আমাকে খুলে বল। সিনেমায় না জানিয়ে গিয়েছিলে বলে খুব বেশি বকেছেন মন্মথবাবু?

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল, না।

তবে? কানের কাছে মুখ নামিয়ে মল্লিকা ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তবে বুঝি সিনেমার হলে শশাঙ্ক বেশি বাড়াবাড়ি কিছু করেছে?

বালিশে মুখ ডুবিয়ে সাবিত্রী তেমনি মাথা নাড়ল, তাও না।

তবে?

এ তবেরও জবাব পেলনা। ফুপিয়ে ফুপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী করে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অন্তত ওর শরীরটার মূল্য আছে, আর মন্মথর কাছে ভেতরের মানুষটার ; মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবে না, কত বড় দু'টো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।

নিষাদ

বিমল কর

"You begin by killing a cat and you end by killing a man."

ছেলেটা মরবে ; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ... কিংবা কাল ...।

নাম ওর জলকু। বছর বারো বুঝি বয়েস। এখানকার দেহাতী ছেলেদের মতনই দেখতে। গাঢ় কালো রঙ। নরম সিমেন্টে কালি মেশানো কালচে রঙের একটি ছাঁচ যেন। এখনও কাঁচা, হাত দিলেই দাগ পড়ে যাবে। এমনই নরম কাদাটে কোমল ভাব সারা গায়। মুখটা গোল, ফোলা ফোলা গাল, চিবুকের ডৌলটুকু এখনও ফোটে নি ; কারিগরের হাত পড়েনি বোধ হয়। নাকটি মোটা, বসা। পুরু মোটা মোটা ঠোঁট, জোড়া ঘন ভুরুর তলায় বড় বড় দুই চোখ। কেমন একটা উথলে ওঠা ভাব, কালো শান্ত চোখের তারা আর সাদাটে জমিটা যেন জলে-জলে ভেসে উঠেছে। জলকুর কপাল আছে কি নেই বোঝা যায় না চট করে। মাথা ভর্তি একরাশ চুলে কপাল, ঘাড় কানের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে থাকে।

ছেলেটা একেবারে জংলী। এখানে থেকে থেকে এদের মতনই হয়ে গেছে। গায়ে জামা দেয় না পায়ে জুতো নেই। আদুল গায়ে নোংরা একটা ইজের পরে সারাদিন ওই রেললাইনের কাছে।

ছেলেটা মরবে ; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ... কিংবা কাল।

এই এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে তার। আগে ছিল না।

কিছুদিন দেখতাম টিলার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে থাকত। চারপাশে তাকাত। শেষে রেললাইনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। কি যেন খোঁজবার চেষ্টা করত, দেখত।

ঠিক জানি না কেন, হয়ত টিলার ওপর কিছু খুঁজে না পেয়ে, কিংবা হয়ত খুঁজে পেয়েই টিলার ও-পাশটায় নেমে যেতে লাগল। ও-পাশেই রেললাইন। লাইনের পর আবার টিলা। এখানটায় এইরকম! দু-পাশে প্রায় বালিয়াড়ির মতন দুই টিলা, মাঝ দিয়ে পথ কেটে চলে গেছে রেললাইন। পুব এবং পশ্চিমে বেশিদূর ছড়িয়ে পড়েনি টিলার ঢল। শ'দেড়েক গজ বড় জোর। তারপর মাঠ, আর মাঠ অস্পষ্ট জঙ্গল। পুবে একটা ছোটখাটি নদীর পুল। পুলের এ-পার থেকে রেললাইনটা ধনুকের মতন বেঁকে এসে টিলার কাছাকাছি সোজা হয়ে গেছে।

জলকু টিলা থেকে নেমে রেললাইনে চলে যেতে শুরু করেছিল আজকাল। আর নতুন যে খেলা খেলতে শুরু করেছিল তা বাস্তবিকই নতুন নয়, কিন্তু দিনে দিনে কেমন এক ভয়ংকর খেলা হয়ে উঠেছিল।

ছেলেবেলায় কে না এই খেলা খেলেছে। রেললাইন থেকে পাথর কুড়িয়ে আমরাও লাইন তাক করে পাথর ছুঁড়েছি। দেখেছি, টিপটা কি রকম ; হাতের জোর কতটা, লাইনের গায়ে পাথরের চোট লেগে ফিনকি জ্বলে কি না, শব্দটা কেমন হয়।

আমাদের এ-খেলা ছিল কদাচিতের, সামান্য সময়ের, কিন্তু জলকুর কাছে খেলাটা রোজকার হয়ে উঠল। আজকাল প্রতিদিন সে এই খেলা খেলছে, প্রতিদিনই। আর এই খেলায় তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা, বৈশাখের প্রচণ্ড রোদ্দুরে, তাপে লু-য়ে—জলকু পাথর ছুঁড়ছে, রেললাইনে তাক করে করে। আর প্রায় রোজই ওকে ধরে আনতে হয় আমায়।

আমি ছাড়া জলকুকে ধরে আনার কেউ নেই। ওর বাবা পঙ্গু। ঘরে আছেন কি নেই বোঝা যায় না। এক এক সময় খেপে গিয়ে যখন চেঁচাতে শুরু করেন, গালিগালাজ ছোটান—তখন বোঝা যায় আমার পাশে ও বাড়ির কোনো ঘরে একজন পুরুষ মানুষ আছে। নয়ত জলকুদের বাড়িতে শোনার মতন গলা আর নেই। জলকুর মাকে আমি কমই দেখেছি। চেহারা মুখ কিছুই ভাল করে দেখতে পাইনি, ধারণাও করতে পারি না সেই অবয়ব। অত্যন্ত ঝাপসাভাবে যে-টুকু আকার তৈরি করতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, জলকুর মা রোগা, রুগ্ন কালো, অত্যন্ত লাজুক বা গোঁড়া গ্রাম্য। মুমূর্ষু পশুর মতন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। রান্নাঘর আর উনুন, মসলা বাটা, ঘর ঝাঁট, কুয়াতলায় বসে বাসন মাজা—সংসারের এই শ'খানেক অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে জলকুর মা-র ভোর শুরু হয় এবং স্বামীর অসাড় দুর্গন্ধ শরীরে মালিশ মাখাতে মাখাতে মাঝ রাতের বেহুঁশ ঘুমে ঢুলে পড়ে দিনটা তার ফুরিয়ে যায়।

জলকুর বাবা কি রোগে পঙ্গু হয়েছেন আমি জানি না। শুনেছি, বছর দুই ধরে ভদ্রলোকের এই অবস্থা। ডান পাশটা পড়ে গেছে একেবারে, শুকিয়ে চিমসে গেছে। অনাচারে কি? হতে পারে। অত্যাচারে কি? অসম্ভব নয়। কোনো সাংঘাতিক আঘাতের পরিমাণ যদি হয়—হবেও বা। আমি জানি না। জলকুর বাবার সঙ্গে আমার দু'একবার যা সাক্ষাৎ তাতে আমরা দু'জনেই স্বল্পভাষী হয়েছি। ভদ্রলোকের সেই দুর্লভ গুণ আছে, দুর্ভাগ্যের কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে যারা চায় না। আমার সহানুভূতি পাবার আশা উনি করেন নি, ইতিবৃত্তও শোনাননি পঙ্গুতার। শুধুমাত্র বর্তমানের অবস্থাটা দু'এক কথায় বলেছিলেন।

সমবেদনা জানাবার ভদ্রতা আমার জানা ছিল। আমি বেদনা পেয়েছিলাম নিশ্চয়। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারা, মুখ, বিছানা, ঘর, ঘরের আবহাওয়া আমায় এত বেশি

অস্বস্তি দিচ্ছিল যে, আমি যতটুকু সম্ভব কম কথা বলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—ওই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম।

কাজেই আমরা কথা বলেছি অল্প। নিছক কাজের কথা ছাড়া অন্য কথায় যাইনি। কাজের কথাও অবশ্য সামান্য—ঘরের ভাগ-বাঁটরা, ভাড়া, ভাড়ার তারিখ—এমনি খুঁটিনাটি।

জলকুদের একতলা ছোট টালি ছাওয়া বাড়ির পশ্চিমটা আমার, ভাড়া পাওয়া। পুবটা তাদের। আমার এলাকায় একটি মাঝারি, অন্যটি ছোট ঘর ; সামনে পিছনে সামান্য বারান্দা, খাপরা-ছাওয়া একফালি রান্নাঘর।

একই বাড়ির আধাআধি ভাগবাঁটরার মধ্যে দেওয়াল মাটি ছাদের সংযোগ ছাড়া বাকি যে-টুকু সংযোগ তা ছিল জলকুকে নিয়ে—এবং জলকুর পিসিকে যদি ধরা যায় তবে তাকে নিয়েও। তবে সে ত সামান্য, অতি সামান্য।

জলকুর পিসির পুরো নাম বোধ হয় তরুলতা। তরু বলেই ডাকতে শুনতাম। ঢেঙা রোগাটে গড়ন। মুখের ছাদটি লম্বা ধরনের। গায়ের রঙ মাজা কালো। সাপের মতন লম্বা বেণীটি খোঁপা থেকে খসে পিঠের ওপর দুলত। মিলের শাড়ি, সস্তা কাপড়ের জামা। তরুর বয়েস কুড়ি ছাড়িয়েছিল অনেক দিন। বিয়ে হয়নি। একটি দু'টি বসন্তের না-মেলানো দাগের সঙ্গে হতাশা এবং কাতরতা মাখানো সেই মুখ কেমন যেন রিক্ত শূন্য অবোধ দেখাত।

আমার আর তরুর মধ্যে মেলামেশা গল্পগুজব ছিল না। দেখা হলে চোখাচোখি হত, জলকুর খোঁজ করতে এসে বড় জোর শুধোত, জলকুকে দেখেছেন নাকি? বা আমি যখন রাত্রে গ্রামোফোন বাজাতাম—ওদের তরফের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও শুনত, পরের দিন দেখা হলে বলত, ওই গানটা আজ আর-একবার দেবেন? বড্ড ভাল গান। ...... কখনও কখনও আমার ডাকে আসা বাংলা মাসিক পত্রিকা দুটো চেয়ে নিয়ে যেত, গল্প পড়তে।

গল্প করতে, গান শুনতে তরু এলে আমি বোধ হয় অখুশী হতাম না।

পরে সে কথা বুঝেছি। আর যখন কথাটা স্পষ্ট করে বুঝেছি, তখন থেকে জলকু তার সর্বনেশে নতুন খেলা শুরু করল।

জলকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত উধাও। বাড়িতে নেই, সামনের আগাছাভরা বাগানটায় নেই, কুয়াতলায়, মাঠে—কোথাও না। ...তরু বাইরে এসে খুঁজছে, ডাকছে, জলকু জলকু! বাড়ির মধ্যে বসে সে-ডাক আমি স্পষ্টই শুনতে পাই। প্রথমটায় গরজ দেখাতে ইচ্ছে করে না ; ভালোও লাগে না উঠতে।

ডাক যখন বাড়তে বাড়তে ঘুরেফিরে আমার বারান্দার কাছে এসে পৌঁছয়, উঠতে হয় আমায়। আমি জানি জলকু কোথায় আছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ছককাটা। জলকুর পিসি খুঁজবে, ডাকবে, আমি প্রথমে গা করব না, পরে সরু ব্যাকুল গলার ডাক অনুনয়ের মতন আমার বারান্দায় এসে থামবে, আমি উঠব, বিরক্তিতে অপ্রসন্ন মনে, মাথার ওপর বৈশাখের খর রোদ, অসহ্য গরম, আগুনে হাওয়া, আস্তে আমি হাঁটব, বাড়ির পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে টিলার কাছে এসে দাঁড়াব, উপরে উঠব, সতর্ক পায়ে, মুখে তপ্ত বাতাসের ঝাপটা লাগবে, কটকটে রোদের ঝাঁঝে তাকাতে পারব না ভাল করে, তবু টিলার ওপর উঠলেই দেখতেই পাব, নীচেতে রেললাইনের স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে জলকু পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ছে। আদুল গা, ঢলঢলে ইজের, একরাশ চুলে মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা এবং অব্যর্থ নিশানায় জলকু রেললাইনের লোহার ধারালো হিংস্র উজ্জ্বলতাকে বার বার আঘাত করছে। ধাতব, বেসুরো একটা আওয়াজ উঠছে, ঠং ঠং ঠং।

'জলকু। এই জলকু।' কাছে গিয়ে জোরে এক ধমক দেব, জলকুর একটা হাত জোরে চেপে ধরে। ডান হাত। জলকু প্রথমে হাত ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। শেষে চোখ তুলে তাকাবে। সে জানে আমায় দেখতে পাবে। মুখে কোথাও তার বিস্ময়ের এতটুকু ছায়া পড়বে না। আমি জানি, ঘোরভাঙা দুটি গভীর অবসন্ন লালচে চোখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাব না। তপ্ত, ঘর্মাক্ত, অথচ নরম পিচ্ছিল একটা হাত আমার মুঠোয় শক্তভাবে ধরা থাকবে।

'বাড়ি চলো'। গলাটা আমার রুক্ষ বিরক্ত কঠিন, 'তোমায় রোজ বলি এ-ভাবে একা লাইনে এসে দাঁড়িয়ো না—সব সময় গাড়ি আসছে যাচ্ছে—কোনদিন কাটা পড়বে লাইনে।'

জলকু কথা বলে না। আরও ঘামে, মুখ মাথা আরও গোঁজ করে আমার হাতের টানে-টানে টিলার ওপর উঠতে থাকে।

মাথার ওপর আকাশ জ্বলছে, পাথর আর কাঁকরে-বালি ঝকঝক করছে, গরম হাওয়া ঝাপ্টা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গায়ে ছ্যাঁকা দিয়ে, দূরের পুলের কাছ থেকে রেললাইনের ধনুকের মতন বাঁকটা বিরাট এক তলোয়ারের মতন জ্বলছে, শানানো, ক্ষুরদীপ্ত আভায়।

'তুমি এ-ভাবে আর এসো না জলকু। কখনও না।' টিলার ওপরে উঠে এসে আমি বলি। হাতটা ছেড়ে দি ওর। কয়েক পা দূরেই আমাদের বাড়ির পাঁচিল।

জলকু কথা বলে না। আমি জানি জলকু আমার নিষেধ শুনবে না। ও আবার আসবে। হয়ত আজই দুপুরে, কোন ফাঁকে ছাড়া পেয়ে।

কি সর্বনেশে খেলায় পেয়েছে ওকে। ছেলেটা মরবে ; লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ...... কিংবা কাল ......।

সেদিন একটা লোক জুটেছিল। আমার এলাকার বাগানটুকু নিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত খেটেছি। বাখারির ভাঙা বেড়াটা ভেঙেই ফেললাম একেবারে। আর দরকার নেই। কিছু আগাছা জমেছিল, রোদের তাতে পুড়ে পুড়ে খড় হচ্ছিল, সে-সব পরিষ্কার করা হল। বেলফুলের কেয়ারি, জুঁই গাছের তলা, টিপ-হলুদের ছোট ঝোপের মাটি খুঁড়তে আর বারান্দার টবের ফুল-গাছ কটাকে পরিচর্যা করতে করতে বেলা অনেক হল। স্নান করতে যাব, এমন সময় জলকুর পিসির গলা, 'জলকু—জলকু।'

ডাকটা পাঁচিলের শেষ পর্যন্ত চলে গেল, ওপাশের কদম গাছের তলা দিয়ে বেড় খেয়ে পেয়ারা ঝোপ, বাতাবি লেবু, আমগাছের ছায়া ঘুরে আমার বারান্দার কাছে এসে থামল।

'পালিয়েছে'? আমি বললাম, বিরক্ত গলায়।

'ক-খন ; আসুক আজ হারামজাদা ... গায়ের ছাল তুলব। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেও নিস্তার নেই।' তরু রাগে কষ কষ করছিল।

'বেঁধে রাখাই উচিত। রোজ রোজ এ-ভাবে রেললাইনে পালিয়ে যায়। একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ—ওইটুকু ত ছেলে।'

'মরবে ; মরবে একদিন হতভাগা। মরুক, আমারও হাড় জুড়োয়।' তরু আজ অসম্ভব চটেছে। কথার ভাবে বোঝা যাচ্ছিল।

চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে আমি বললাম, 'আর কিছু না, এখান থেকে দেখাও যায় না, লোক নেই জন নেই ফাঁকা রেললাইন ... ভয় হয়।'

আমার অগুছালো কথা, তরুর তিক্তবিরক্ত ভাব, সব মিলেমিশে জলকুর একটি ভবিষ্যৎ পরিণতি যেন দুজনের চোখেই লহমার জন্য ভেসে এল। অল্প একটু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। তারপর আমি নেমে গেলাম বারান্দা দিয়ে।

বৈশাখের বুঝি শেষ সপ্তাহ চলছে। অসহ্য গরম। মাথার ওপর চোখ তোলা যায় না। গলা তামার মতন প্রতপ্ত আকাশ বেয়ে আগুন ঝরে পড়ছে। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। তেঁতুল কি কাঁঠালের ঝোপ-ঝাড়গুলো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। একটি কাক কি চড়ুইও ডাকছে না। টিলাটা যেন পুড়ছে, পাথরগুলো রোদ আর তাতকে দ্বিগুণ করে ছুঁড়ে দিচ্ছে চোখে, গায়।

আমার চোখ জ্বালা করছিল, নিঃশ্বাস অসহ্য গরম, কানের পাশ দিয়ে লু-য়ের হলকা বয়ে যাচ্ছে।

জলকু একটার পর একটা পাথর কুড়োচ্ছে রেললাইন থেকে আর ছুঁড়ছে, ছুঁড়ে মারছে রেললাইনে। ছেলেটা যেন পাগল হয়ে গেছে আজ, কিসের এক অদম্য আক্রোশে তাকে জ্ঞানহারা করেছে। আদুল গা, ছোট একটু ইজের, উদোম পা,

স্লিপারের ওপর দাঁড়িয়ে ধারালো শক্ত পাথর তুলে নিচ্ছে মুঠোয় আর পলকের মধ্যে হাতটা অসম্ভব কঠিন, হিংস্র, উন্মত্ত ভঙ্গিতে ওপরে তুলতে না তুলতেই পাশ কাটিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারছে। ইস্পাতের মসৃণ চকচকে একটা সাপ যেন অর্থহীন ছেলেখেলার আঘাত সয়ে যাচ্ছে ; গ্রাহ্য নেই।

না, আমার হঠাৎ মনে হল আজ জলকু অন্য কিছুকে তার ওই অন্ধ দানবীয় আক্রোশে ক্ষতবিক্ষত করে মারছে—কিন্তু কাকে?

কাকে?

কোন অদ্ভুত কৌতূহলে জানি না—আমি চারপাশে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। সমস্ত জায়গাটা নির্জন, ছায়াহীন। ঘা খাওয়া লোহার বেসুরো ভাঙা ভারী শব্দ শুধু। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বয়ে আনা লু-য়ের ঝড় বইছে, থেকে থেকে, অতি দ্রুত বাতাস কেটে এগিয়ে যাওয়ার সেই সোঁ সোঁ গর্জন এই আছে, এই নেই। পুলের কাছে রেললাইনের পুরো বাঁকটা চোখে পড়ে না। বাঁক যেখানে শেষ হয়ে সোজা হয়ে মিশে যাচ্ছে সেটুকু চোখে পড়ে। ধারালো ফলার মতন দেখাচ্ছে অংশটা।

অতি কষ্টে একবার মাথার ওপর চোখ তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। সমস্ত আকাশটাই যেন জ্বলন্ত সূর্য, আগুনের ঝলসানিতে গনগনে আঁচের মতন রঙ ধরেছে শূন্যে। টিলার পাথরে শরীরটা পুড়ছে, কাঁকরের স্তূপ ধকধক করে জ্বলছে, রেল-লাইনের পাথর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল, অসহ্য উজ্জ্বল। আমার গাল মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ জ্বালা করছিল ভীষণভাবে, গলার কাছে বুকের তলায় দরদর করে ঘাম ঝরছিল। আর চোখে মুখে নাকে ঠিকরে এসে লাগছিল সেই জ্বলন্ত দুঃসহ তাপ। অনুভব করতে পারছিলাম—টিলা, পাথর, লাইন, মাঠ, লোহা, স্লিপার সমস্ত জায়গাটা এক ভয়ঙ্কর দহনের ঝলসানিতে জ্বলছে—জ্বলছে। অবোধ্য আকারহীন এবং নির্মম কোনো হিংস্রতা তার বিরাট করতল আস্তে আস্তে মুঠো করে নিচ্ছে।

আচমকা মনে হল, জলকু এই সর্বগ্রাসী বীভৎস অবয়বহীন হিংস্রতাকে তার অতি পরিমিত অর্থহীন সামর্থ্য দিয়ে আঘাত করছে নিষ্ফল আক্রোশে।

আমার মাথার শিরায় রক্তের প্রবাহ হঠাৎ যেন জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ভীত এক অনুভূতি হল আমার। মুহূর্তের জন্য নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হারালাম, চোখ অন্ধকারে ঠিকরে পড়ল, অসহ্য এক ব্যথা ঘাড়ের কাছে ছুরির ফলার মত বিঁধে গেল।

'জলকু—এই জলকু।' জ্ঞান ফিরে পেয়ে জলকুর হাত চেপে ধরলাম।

টিলার ওপর দিয়ে যখন উঠে আসছি, জলকুর হাত আমার হাতে, মনে হল, নীচের ইস্পাতের দুটি উজ্জ্বল হিংস্র অজগর যেন তার অফুরন্ত ওষ্ঠে হাসির আভা খেলিয়ে ঝকঝক করছে। বিদ্রূপে।

একটা গাড়ি আসছিল। পুলের কাছ থেকে ইঞ্জিনের সিটি বাজছে, বিরতিহীন কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনি—বাতাস থেকে বাতাসে ছড়িয়ে তরঙ্গের একটি ক্ষীণ স্পন্দন আমার কানে এসে লাগছে।

আর একটু হলেই জলকু আজ লাইনে কাটা পড়ে মরত। যা বেহুঁশ বেঘোর পাগল হয়েছিল আজ।

ছেলেটাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে আমি বাঁচিয়েছি, আমি ভাবছিলাম। আজ মনের তলায় তৃপ্তি এবং মমতার স্বাদ মাখানো এক সুখ পাচ্ছিলাম।

'জলকু, আমি না এলে আজ তুমি একটা কেলেংকারি কাণ্ড করতে। আর কখনও এ-ভাবে এসো না। বুঝলে!'

জলকু তাকাল না, কথা বলল না, মাথাও নাড়ল না। ...... কেন জানি না হঠাৎ ভীষণ একটা বিরক্তি এল ছেলেটার ওপর। হাত ছেড়ে দিলাম।

ছেলেটা মরবে, লাইনে কাটা পড়েই মরবে একদিন। হয়ত আজ ... কিংবা কাল।

মাঝে জলকুর অসুখের মত হল। একদিন বিকেলে জ্বর এল। দেখতে দেখতে হু হু করে জ্বর বাড়ল। পাঁচ পর্যন্ত উঠে থামল তখনকার মতন। ছেলেটা জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান, চোখে চাইতে পারছে না। সারাটা মুখ ঝলসে যাচ্ছে। এখানে কাছাকাছি কোথাও ডাক্তার বদ্যি নেই। আমার মনে হল, তাত-জ্বর। জলপটি দিতে বললাম তরুকে সেই সঙ্গে আমার হঠাৎ প্রয়োজনের হোমিওপ্যাথি বাক্স থেকে তখনকার মতন একটা ওষুধ।

পরের দিনও জ্বর থাকল। ডাক্তার এল না বাড়িতে। জলকুর বাবা জলকুর মাকে গালাগাল দিচ্ছিল, শুনেছি। ডাক্তার না-ডাকার জন্যে নয়, অন্য কোন প্রাসঙ্গিক কারণে বোধ হয়। জলকুর মা যথারীতি উনুন আর বাসন আর কাপড়কাচা নিয়ে ব্যস্ত থাকল, তরুই যা বার দুই আমার কাছে এল ওষুধ চাইতে এটা ওটা বলতে। রাত্রে যেন জলকুর মাকে কাঁদতে শুনেছিলাম। সম্ভবত বারান্দায় এসে অন্ধকারে বেচারী একটু আড়াল দিয়ে কাঁদছিল।

জলকুর জ্বর ছাড়ল পরের দিন ভোরে। একেবারে ছেড়ে গেল। গা ঠাণ্ডা।

তরু এসে খবর দিল আমায়। নিজের ওষুধের মহিমায় নিজেই মুগ্ধ এবং অভিভূত হচ্ছিলাম। গর্ব বোধ হচ্ছিল। খুশী মনে তৃপ্ত মুখে তরুর দিকে চেয়ে থাকলাম।

তরু আঁচলের আগা দিয়ে আঙুলে পাক দিচ্ছিল আর খুলছিল। হঠাৎ বলল, 'জ্বরের ঘোরে বার বারই জলকু তার মানিককে খুঁজছে। বৌদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে, জলকু তাই বুকের কাছে জাপটে ধরে ......

অসহ্য একটা রাগ মাথার মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল। তরুকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বিশ্রী ইতর গলায় ধমকে উঠলাম, 'তবে আর কি—তোমার বৌদির কাছে যাও। ছেলের জ্বর তিনি সারিয়েছেন।'

তরু চুপ। তার মুখে চোখে গলার স্বরে কি রকম এক অপরাধী ভাব ছিল, আমি যা সহ্য করতে পারছিলাম না।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তরু চলে গেল ধীরে ধীরে।

যাক। মনের ঝাঁঝ তখনও আমার পুরো মাত্রায় রয়েছে। প্রায় স্বগতোক্তির মতন রয়েছে। প্রায় স্বগতোক্তির মত বললাম, 'বৌদি বালিশ এগিয়ে দিয়েছে—? তবে আর কি, বালিশ বুকে জড়িয়েই তোমার ছেলে ভাই-পো সারুক। বিদ্রূপটা আমার কানে মধু বর্ষণ করল।

জলকুর মানিক? সে ত? সে ত জলকুর সোহাগের একটা ছাগলছানা মরছে। পাপ ঢুকেছে। বড্ড জ্বালাতন করত। আমার বহু পরিশ্রমের ফল, টবের দু'টি ডালিয়াও একেবারে গোড়া পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিল। অকালের ফুল বহু সাধ্যসাধনা করে পেয়েছিলাম।

গিয়েছিলাম সাত্-সকালে সাইকেল ঠেলে, পাঁচ মাইলটাক পথ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। জ্যৈষ্ঠের রোদে আর ফেরা গেল না সকালে। ফিরলাম বিকেলে। তখনও মাথার ওপরে রোদ ছিল।

খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে কুয়াতলায় স্নান করতে নামলাম। ঠাণ্ডা গা-জুড়ানো জল। সমস্ত শরীর থেকে তাপ ধুয়ে যাচ্ছে, মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে শীতলতায়, ঘর্মাক্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহের অতৃপ্তি ধুয়ে মুছে স্নিগ্ধতা জড়িয়ে ধরছে। আরাম অনুভব করতে পারছি। সাবানের ফেনায় গন্ধ উঠছে খসের, মৃদু সুঘ্রাণ।

'জলকু—জলকু'। তরুর গলা কানে গেল।

আমি স্নান করছি, কুয়ায় গা-মাথা জুড়োনো ঠাণ্ডা মিষ্টি জল, সাবানের ফেনায় চমৎকার গন্ধ, সামনে ছায়া নেমেছে, হাল্কা ম্লান একটু রোদ, শালিক বসেছে কুয়াতলার পাড়ে।

'জলকু—জলকু'। ডাকটা বাড়ীর সামনে পাঁচিলে পাঁচিলে ঘুরে বেরাল। কদমগাছের তলা দিয়ে করবী ঝোপের কাছে গিয়ে থামল। ঘুরে ফিরে বাতাবি লেবুর গাছের তলায় থমকে দাঁড়ালো। আশপাশ ঘুরে কুয়াতলার কাছাকাছি কোথাও।

ছেলেটা আবার পালিয়েছে। স্নান শেষ হয়ে গেছে আমার। আমি জলকুর কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। এই সে-দিন তাতজ্বরে মরতে মরতে বেঁচেছে। এখনও ত অসুস্থ। দুর্বল রুগ্ন। এই অবস্থায় আবার পালিয়েছে! শয়তান ছেলে একটা।

ঘরে এসে কাপড়-চোপড় ছাড়লাম। কি খেয়াল হল, ধোপ ভেঙে একটা পাজামা পরলাম। প্রায় আধ-কৌটা পাউডার ছড়ালাম গায়। কে জানে কেন, অত্যন্ত আরাম লাগছিল, ভাল লাগছিল। নেটের গেঞ্জিটা গায়ে দিলাম। চুল আঁচড়াচ্ছি—আয়নায় মুখ দেখে, বারান্দার কাছে তরুর গলা শোনা গেল, ভাইপোকে ডাকছে। আসলে ভাইপোর নাম ধরে আমাকেই ডাকা, আমাকেই অনুনয় করা।

মুখ মুছে চটিটা পায়ে গলিয়ে বাইরে এলাম।

'পালিয়েছে'?

'হ্যাঁ, খানিকটা আগেও কাঁঠাল গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল। .... আমি ভাবলাম ......' তরু ব্যাকুল উদ্বিগ্ন চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, 'বিকেল শেষ হয়ে গেল ...... রোগা ছেলে ......।'

'দেখছি।' বারান্দা থেকে নামলাম। কদমগাছের তলায় আসতেই কেমন এক লালচে আভা দেখলাম পাঁচিলের মাথায় চুপ করে পড়ে আছে। যেন ফিসফিস করে আমায় কিছু বলতে এসেছে। পশ্চিমের আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকালাম। সূর্যাস্তের লগ্ন শুরু হয়েছে! আকাশটা সিঁদুরের রঙে ধুয়ে গেছে, সূর্যটা লাল, টকটকে ...... সূর্যটা ঘন লাল টকটকে ......।

হঠাৎ কিসের আকুল করা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের একটা দমকা এসে ঠিক আমার হৃৎপিণ্ডে ঝাপটা দিল। ঝাপটা নয়, ছোবল। বুক থেকে পলকে সাপের কিলবিলকরা এক অনুভূতি মাথার স্নায়ুতে উঠে এল। আমার হৃদ্‌পিণ্ডের সম্ভবত জীবনের ধ্বনিটুকু সময়মত বাজাতে ভুলে গেছে। মাথা বুক হাত পা সব অসাড়। আমি সর্বপ্রকার অনুভূতি থেকে চ্যুত হলাম কয়েক মুহূর্তের মতন।

অল্পক্ষণ। হৃদ্‌পিণ্ড এবার ভয়ঙ্কর জোরে শব্দ করতে শুরু করেছে। বরফের বিরাট একটা দেওয়ালে কে যেন আমার পিঠ ঘাড় ঠেসে ধরেছে। ঝিমঝিম করছিল মাথা! দৃষ্টিটা টিলার ওপর থেকে নড়ছে না।

জলকু মারা গেছে, লাইনে কাটা পড়ে মারা গেছে আজ, অল্পক্ষণ আগেই। কানের পরদায় ইঞ্জিনের তীব্র সিটি, মালগাড়ী চলে যাবার শব্দটুকু ভেসে এল। আমি যখন স্নান করছিলাম একটা মালগাড়ি চলে গেছে। চাকার বিশ্রী জঘন্য সেই শব্দটা এখন আবার কানের পরদায় শুনছিলাম। চাকা চলছে ... চলছে ; ইস্পাতের হিংস্রতা হাসছে। ছেলেটা মারা গেছে। কেন যেন আমার হঠাৎ আজ মনে হল। আকাশে টকটকে রক্তগোলা রঙ, সূর্যটা লাল, অসহ্য লাল আজ। ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল।

আর আমার পা বাড়াবার মত সাহস হচ্ছিল না। কাঠের মতন শক্ত হয়ে গেছে। সাড় নেই, আগ্রহ নেই, শুধুমাত্র এক ভয়ংকর আতঙ্কের পীড়ন আমায় পিছু দিকে টেনে নিচ্ছে।

বিহ্বলতার এই উগ্রতা আমি দমন করবার চেষ্টা করলাম। কার্যকারণের স্বাভাবিক যুক্তি তৈরী করবার আপ্রাণ পরিশ্রম করছিলাম। জলকু কাটা পড়েছে এ-কথা আমি কেন ভাবছি? কেন? ... সূর্য এইরকমই লাল থাকে, মেঘে এমনই ঘন রক্তাম্বর ছড়িয়ে পড়ে সূর্যাস্তবেলায়। হয়ত প্রত্যহই। আমি চোখ তুলে দেখি না বা দেখলেও তেমন করে দেখি না।

আমায় যেতে হবে। জলকুকে ধরে আনতে হবে। সে মারাত্মক খেলায় মেতে আছে। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যে পা বাড়িয়েছে। জলকুর মা রুটি সেঁকছে জলকুর জন্যে। তরু কুয়াতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গামছা হাতে—অপেক্ষা করছে। জলকু ফিরে এলে হাত মুখ ধুইয়ে দেবে।

বুঝতে পারলাম আমি হাঁটছি আস্তে আস্তে, ভীত ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে। টিলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ক্রমশই। কাঁকরের স্তূপ, ছোট ছোট আগাছার ঝোপের ওপর থেকে শেষ আলোটুকু মুছে গিয়ে ছায়া নেমেছে, মাথার ওপর দিয়ে পাখিরা ফিরে যাচ্ছে। কোথা থেকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে এতক্ষণে।

টিলায় ঠিক মতন পা দিতে পারছি না। পিছলে যাচ্ছে। আমার যেন একবিন্দু শক্তি নেই, হয় ঘুমে না হয় কতকাল অসুখে ভুগে আজ দুর্বল পায়ে পথ হাঁটতে নেমেছি।

বার বার বাধা। মন পিঠ টানছে। জলকু সামনে টানছে। কে যেন কাছে ফিসফিস করে বলছে যেয়ো না—; পরমুহূর্তে চোখের ঝাপসায় জলকুর মা যেন রুটির থালা হাতে এগিয়ে আসছে, তরু ডাকছে ......

জানি না কখন কেমন করে টিলার ওপর এসে দাঁড়িয়েছি। সূর্য সেই লহমায় কোন দূর দূরান্তে ডুব দিতে যাচ্ছে। যাবার আগে শেষ নিঃশ্বাসের মতন প্রাণের কোন অদৃশ্য শক্তি সূর্যপিণ্ড থেকে শেষতম আলোটুকু ঢেলে দিল। এই আলো অসহ্য গাঢ় আশ্চর্যরকম লাল। আমি জীবনে কখনও এই রঙ দেখিনি, কখনও নয়। এত ঘন, জীবন্ত, ভাষাময় হতে পারে রঙ, আমি জানতাম না। এখন জানলাম। দেখলাম।

দেখলাম—টিলার তলায় অসাড় রেললাইন। এক ঝলক সেই আলো। হিংস্র ধারালো ইস্পাতের ওপর মুঠো-মাপের জায়গাটুকুতে আলোটা ছিল। আমার চোখের সাড়া পেয়ে আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাল তারপর উড়ে গেল।

ছায়ার মধ্যে তালগোল পাকানো কালো জামাপরা জলকুর একটু চিহ্ন। পাথরের গায়ে গায়ে আর সব নিশ্চিহ্ন। স—ব।

কত রাত জানি না। ঘর অন্ধকার। ছোট লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়েছি কখন। অল্প টিম-টিমে আলো—তাও সইতে পারছিলাম না। যতটুকুই হোক আলো থাকলেই

মনে হচ্ছিল অন্য কিছু আছে এ-ঘরে। অপলক দু'টি চোখ মেলে আমায় দেখছে।... বাতি নিভিয়ে ঘর ভরা অন্ধকার সামনে নিয়ে বসে আছি। আমায় যেন কেউ না দেখে। নিজেকেও নিজে দেখতে চাই না।

কত রাত জানি না। চারিধারে অখণ্ড নিস্তব্ধতা। অন্ধকার। পাশের বাড়িতে একটি মুমূর্ষু গলার প্রায় শব্দহীন কান্নাটা শেষবারের মতন শুনেছি অনেকক্ষণ। এখন হয়ত মানুষটির গলা বুজে গেছে। আর শব্দ বেরুচ্ছে না। জলকুর পিসি হয়ত জলকুর বিছানা জাপটে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জলকুর বাবা—? জানি না।

আমি জেগে আছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার আমায় ভরে রেখেছে। মনে হচ্ছে এই লুকিয়ে থাকার খেলা আমি শুরু করেছি কতকাল আগে—আজ আর তার হিসাব পাওয়া অসম্ভব ; এই খেলা কতকাল খেলব তারও কোন সীমা পাচ্ছি না। এই অন্ধকারের মতই সব। আদি হারিয়ে গেছে ; অন্ত আছে বলে মনে হয় না।

এত অস্থির চঞ্চল কাতর বিহুল আগে কখনও হইনি। কেন? আজই বা আমার কি হল? জলকুর কাটা পড়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়?

বুকের মধ্যে কী যেন যন্ত্রণা আর কান্না। কেবল এক মাথা-খোঁড়ার মতন হাহাকার। কিন্তু সব জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। পাথরের মতন। একটুও গলবে না, একটুও না।

অন্ধকার কখন একটু ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে। বাইরে হয়ত মাঝরাতে চাঁদ উঠল। কোন্ তিথি আজ?

বাইরে থেকে আমার নিঃশব্দে কে যেন ডাকছে। আমি জানি কে। অনেকক্ষণ থেকেই ডাকছে। এ এক ভীষণ আকর্ষণ। প্রাণপণে বাধা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু চাঁদ উঠছে বলে, আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে এসেছে। এমন কি হয়! হয়ত।

কদমগাছের পাতা সরসর করে কাঁপছে বাতাবিলেবুর তলায় কাঠবেড়ালি ছুটছে ... জলকুর দড়ির দোলনা ছিঁড়ে গেছে কবে। তার মানিকের কাঁঠাল পাতা জমে জমে রোদে শুকিয়ে খসখসে হয়ে উঠেছে। এখন বুঝি হাওয়া ছিল একটু, শুকনো কাঁঠাল পাতা খস্ খস্ করে উড়ে গেল।

আমায় ধরে রাখতে পারল না ঘরের অন্ধকার। আমার বুক, মন পা—প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন একবার শেষ চেষ্টা করে সেই অদ্ভুত যাদুকরী তীব্রতম আকর্ষণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চাঁদ ওঠে নি—উঠবে। পা বাড়াতে গিয়ে ফুলের টবে পা আটকাল। হাত বাড়িয়ে পথ ঠাওর করতে গিয়ে মনে হল, এটা সেই ফুল ছেঁড়া ডাল চিবানো ডালিয়ার। জলকুর মানিকের একটা বিরাট অপরাধের স্মৃতি।

'দু' পা এগিয়ে বারান্দার নিচে মাঠে নামলাম। পাশের বাড়ি অসাড়। মনে হল শূন্য। হয় সবাই মরে গেছে, না হয় ছেড়ে চলে গেছে। পোড়ো বাড়ির ভ্যাপসা গন্ধ যেন নাকে এসে লাগল। শ্যাওলা জমে জমে কালো দেওয়ালের অত্যন্ত আবছা একটু আভাস।

তরু কি চলে গেছে? তরু জানত, আমি ফুল ভালবাসি, তরু জানত, আমি গান ভালবাসি, তরু জানত আমি তাকেও ভালবাসতে শুরু করেছিলাম—সবই জানত তরু। তার অজানা ছিল না কিছু। সেই যে একদিন এক ঘন মেঘলায় আঁধার হয়ে আসা দুপুরে তরু অসাড় পায়ে আমার ঘরে এসেছিল, আমি ছিলাম ... সে ছিল, ঝোড়ো ধূলোর ভয়ে জানালা বন্ধ ছিল ...... পাশাপাশি বসে ...... ঘর ভরা মেঘলার ঘনতা ...। জলকু ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তরু চমকে উঠল, আমি চমকে উঠলাম। জলকু তার মানিককে খুঁজছে ঝড় উঠেছে কিনা তাই। মানিকের সেই দ্বিতীয় অপরাধ।

চাঁদ উঠল। আমি টিলার ওপর উঠেছি। চরাচর নিস্তব্ধ বাতাস বইছে। তাল তাল এবড়ো খেবড়ো ছায়া ছড়ানো এ-দিক ও-দিক। কোথাও হাল্কা কোথাও নরম। চাঁদের অতি মিহি ঝাপসা আলো আমাকে ছায়াহীন করেছে।

জোনাকি জ্বলে না এখানে, ঝিল্লিরব হয়ত আছে ...... আমার কোন হুঁশ নেই, মতিভ্রম হয়েছে হয়ত ...... বা কোনো কুহকের ডাকে চলে এসেছি।

টিলার উপর উঠে এসে দাঁড়ালাম। নীচে রেললাইন। কত যেন নিচু। চাঁদের মিহি, জলের মত সাদা একটু আলো। রেললাইনের সাড়া নেই, পাথরের কুচিগুলো চুপ।

হঠাৎ মনে হল, আমি যেন কিছু একটা ধরে রেখেছিলাম এতক্ষণ। তার ভার ছিল হাতে। আচমকা মনে হল সে-ভার আর নেই। ফেলে দিয়েছি। ছুঁড়েই দিয়েছি। টিলার গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে ...... পড়ল। শব্দ কি শুনলাম? না, না। শব্দ নয়। তারপর চাঁদ একটু উজ্জ্বল হল, মুহূর্তের জন্যে ......। এক মুঠো করুণ বিষণ্ণ দুলে দুলে রেললাইনের একটু জমিতে কাঁপল। যেন কাঁপা জলে আলো কাঁপে। জলকুর রক্ত বুঝি ওখানেই ছিল। কিংবা ...... মানিকের রক্ত বুঝি পাশেই ছিল, শুকিয়ে গিয়েছিল কবে। কবেই।

ক্ষীণ চাঁদ প্রকাণ্ড এক ভাসন্ত মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

কখন কদমতলার কাছে আবার ফিরে এসে দাঁড়িয়েছি। জলকুদের ঘর থেকে পোড়ো বাড়ির গন্ধ ভেসে আসছে।

এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের মন ও সত্তাকে ভাঙলাম। দু'ভাগে। এক ভাগ আমি, অন্যটি জলকু। মানুষ যখন তার নাগালের কাছে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু হাতড়ে

পায় না, অথচ তার কথা থাকে, তখন বোধ হয় এইভাবে নিজেকে ভাঙে। জলকুর আদুল গা, কালো তুলতুলে চেহারাটি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আস্তে আস্তে তার মুখ স্পষ্ট হল। বড় বড় চোখ, বসা নাক, ঝুল জমে কালো হয়ে থাকার মতন চুলের গুচ্ছগুলি কপালে কানে চোখে ঝুলে ঝুলে পড়ছে।

মনে হল, জলকু পাথর ছুঁড়ছে। পরিচ্ছন্ন অথচ হৃদয়হীন এক ষড়যন্ত্র এবং অনেক সবল কঠিন নির্মমতার বিরুদ্ধে সে বোকার মতন তার ছোট পলকা হাতে শুধু পাথরই ছুঁড়ছে ব্যর্থ আক্রোশে।

কত কথা বলার ছিল, বলা হল না। বলতে পারলাম না। শুধু বললুম, 'জলকু, কে জানত গ্রামোফোনের দম দেওয়া অতটুকু হ্যাণ্ডেল ছুঁড়ে মারলে তোমার মানিক মরে যাবে।......একটুতেই কত কি যে মরে যায়। আশ্চর্য।'

জলকু হয়ত আমার কথা শুনতে পেল না। নিজের কথা নিজের কানেই ফিরে এসে লাগল। আমি শুনলাম। তারপর স্বপ্নের মতন দেখেছিলাম, সারা দুপুর বিকেল সন্ধ্যে এবং প্রায় সারারাত পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা মানিককে আমি কেমন করে লুকিয়ে ছেঁড়া এক টুকরো চটে জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি টিলার ওপর।......

ছেলেটা মরেছে। লাইনে কাটা পড়েই মরেছে। আজ ......।

কিম্‌লিস্

সমরেশ বসু

সন্ধ্যা হয় হয়, তবু হয়নি। এখনো আকাশ ভরে নামেনি তার কালো ছায়া। পশ্চিম দিকের রাবিশ ও ঘেঁস ফেলা চওড়া সড়কটার মোড়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, গঙ্গার স্বচ্ছ জলে পড়েছে পড়ন্ত বেলার আকাশের ছায়া। আকাশেরই ছায়া, কারণ সূর্য ডুবে গিয়েছে। নির্মেঘ আকাশের কোলে গাঢ় লালিমা। ওপারের কারখানাটার পেছনে এই মাত্র ডুবেছে সূর্য। আকাশের প্রতিবিম্ব জলে পড়ে গঙ্গাকে দেখাচ্ছে যেন তাতানো ইস্পাতের মতো। ঢালাই ইস্পাতের জুড়িয়ে আসার মতো গঙ্গার পূর্ব কোল জুড়ে নীলচে ঝিলিক দিচ্ছে।

শীতকাল। মাঘ মাস। জনশূন্য গঙ্গার ধার। দু'চারটে নৌকা মন্থর গতিতে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে চলেছে। জেলে নৌকো নয়, ব্যবসায়ী।

সড়কটার ডান পাশ জুড়ে একটা সুদীর্ঘ বস্তি। ছিটে বেড়ার গায়ে মাটির প্রলেপ। মাথায় খোলা ছাওয়া। দূর থেকে দেখলে বোঝা যায়, সমস্ত বস্তিটা পশ্চিমদিকে ঝুঁকে পড়েছে। যেন হেলান দিয়ে রয়েছে। বস্তিটার সামনে কতকগুলি ছেলেমেয়ে খেলা করছে ন্যাংটো হয়ে খালি গায়ে। ওদের শীত নেই।

এমন সময় সে এসে দাঁড়াল বস্তিটার সামনে। তার আপাদমস্তক দেখে মনে হয়, এ বস্তির বাসিন্দা সে কখনোই নয়। তার মাথার চুল হাল আমলের ছোকরাদের মতো মাপজোক ক'রে ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামানো পরিষ্কার মুখ। রংটা অবশ্য কালো। গায়ে সার্টের উপর উলেন সোয়েটার, সাদা জিনের ফুল প্যান্ট। পায়ে ইংলিশ বুট। এক হাতে একটা চামড়ার স্যুটকেশ ও আর এক হাতে বেডিং।

চেহারাটাও তার দেখতে শুনতে নেহাৎ মন্দ নয়। নাকটা একটু মোটা, আর ঠোঁট দুটো একটু পুরু। তার সেই ঠোঁট চাপাহাসিতে ছুঁচলো হ'য়ে উঠেছে, আর নাকটা কুঁচকে গিয়ে ফুটো দুটো দেখাচ্ছে একটু বড়।

বাইরের আলো নেই বস্তিতে। সেখানে ইতিমধ্যেই সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নেমে এসেছে। ঘরে ঘরে জ্বলছে উনুন। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে বস্তির ভেতরটা। উঠোনের উপরে কেউ কেউ কাপড় কাচছে, দু'একটি ঝি বউড়ি জল তুলে এনে চান করতে

বসেছে। তারই কাছাকাছি খাটিয়াতে বসেছে পুরুষদের বৈঠক। আর সারাদিনের পর এসময়েই যত কথা গান হাসি ঝগড়া। ছুটির পর ছাড়া সময়ই বা কোথায়!

সে ভেতরে এসে সবাইকে একবার দেখে খুব গম্ভীরভাবে ভারিক্কি হাসিতে ঘাড় নেড়ে সোজা গট্‌গট্ ক'রে এসে দাঁড়াল পুবদিকে বনোয়ারীর ঘরের কাছে।

বুড়ো বনোয়ারী আর তার বউ রামদেই তখন সবেমাত্র কারখানা থেকে এসে পা' ছড়িয়ে বসেছে ঘরের দাওয়ায়। তাদের ঘিরে বসেছে একগুচ্ছ অপোগণ্ড, তাদেরই ছেলেমেয়ে।

অদূরেই উনুনে আগুন দিয়ে হাওয়া চালাচ্ছে একটি ষোল সতের বছরের বউ। তার অযত্নের জটাধরা পিঙ্গলবর্ণের খোঁপা ভেঙ্গে পড়ছে ঘাড়ের কাছে, ধোঁয়া লেগে চোখে এসেছে জল।

এদের সঙ্গে বস্তির প্রায় সকলেই এই ফিটফাট পাটলুন পরা আগন্তুকের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। বনোয়ারী বেচারী তো কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বার-দুয়েক কপালেই হাত ঠেকিয়ে ফেলল। তার গোঁফের ফাঁকে সংশয়ের হাসি। একে অপরিচিত, তায় রীতিমত বাবু। সংশয়ের মধ্যে তার ভয়ও ধরেছিল।

রামদেইয়ের অবস্থাও তাই। বালবাচ্চাগুলির সঙ্গে বউটি একেবারে উনুনের ধোঁয়াচ্ছন্ন অন্ধকার কোণে গিয়ে ঢুকেছে। হায় রাম! এ আবার কে?

আগন্তুকের গাম্ভীর্য আর টিকল না। তার পুরু ঠোঁটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল বড় বড় উঁচু দাঁতের সারি। কোন কথা না বলে হাতের বোঝা দুটো নামিয়ে ফেলে, ঘাড়টা একটু তুলে, হাত দুটো ঝাড়তে লাগল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো কালো ছায়ার মতো বস্তির মেয়ে পুরুষ দূরে দূরে ঘিরে দাঁড়িয়ে রীতিমত একটা ব্যূহ তৈরী ক'রে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এল বস্তিতে। এমন কি বাচ্চাগুলিও চীৎকার করতে ভুলে গেল।

বনোয়ারী হাত জোড় ক'রে আর না জিজ্ঞাসা ক'রে পারল না, 'আপ'—

এবার সে হা হা হি হি নানান বিচিত্র স্বরে দরাজ গলায় হেসে উঠল। বুকে হাত দিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হেঁড়ে গলায় বলল, 'আরে হাম, হম বেচন, তুমকো লেড়কা।'

বেচন! বনোয়ারীর লেড়কা বেচন! অমনি ছায়ারা সব মূর্তি ধরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বেচনের গায়ের উপর। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস সকলের পড়ি পড়ি ক'রেও পড়তে চায় না। ইচ্ছেটা গায়ের চামড়া খুঁটিয়ে না দেখা পর্যন্ত যেন

বিশ্বাস নেই। চটকলের স্পিনার, গোরক্ষপুরের কাহারের ব্যাটা, নিজের নাম বলতে বাপের নাম বলে, সেই বুদ্ধু সুদ্ধু বেচন এটা?

এ বলে, 'হায় রাম!' ও বলে, 'হে ভগবান!' সে বলে, 'কাহা যায়?'

বেচনের মা রামদেই তো এক মুহূর্ত হাঁ করে দেখেই, বেড়ায় মুখ গুজে ডুকরে উঠল, 'এ হামার কা ভইল্‌ হো!'

উনুনের পাশে বেড়ার কোণে বউটির বুকের মধ্যে ভয়ে ধুক ধুক করছে। সেই পাঁচ বছর বয়সে তার বেহা হয়েছে। তারপর দেড় বছর আগে 'পাওনা' ক'রে বেচন আর তার শ্বশুর তাকে মুলুক থেকে নিয়ে এসেছে। বেচন তার কাছে ছিল মাত্র দেড় মাসের মতো। তার পরেই চলে গিয়েছিল। সেই বেচনের একটা মূর্তি এঁকে রেখেছিল সে। কিন্তু আজ একি সর্বনাশ হ'ল তার। এ কোন্‌দেশী আজব মরদ। এ তো তার সে মানুষটা নয়।

প্রথমে সে ফুঁপিয়ে উঠে, একেবারে শাশুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার ক'রে কান্না জুড়ে দিল।

বেচন পড়ল মুস্কিলে। খানিকটা অপ্রতিভের হাসি হেসে সে বলতে গেল, 'আরে তোমরা কাঁদচ কেন?' কিন্তু তার আগেই বনোয়ারী চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে শুয়ার কা বাচ্ছা, এ হম কেয়া দেখতা অ্যা? তু জেহ্‌লসে আতা কি নহি?'

বেচনের হাসি ততক্ষণে উবে গেছে। তবু যথেষ্ট সপ্রতিভভাবে বলল, 'হাই লাও গালি বকতা। জেহ্‌লসে আতা নাই কি ময়দান সে আতা!'

'চোপ! চোপরাহো হারামজাদা!'

চীৎকার ক'রে বনোয়ারী মারতে আসে আর কি। এখন সে রীতিমত বাঘা বাপ। বাঘা বাপের মতোই ব্যাটাকে শাসন করতে উদ্যত। বেচনের জামা কাপড় দেখিয়ে বলল, 'আরে তু তো বনোয়ারী কাহার কা লেড়কা নহি, কাঁহাসে সাহব বনকে আইলান অ্যা? লিখাপড়ি নহি জানত, আরে গোরক্ষপুরকা চুহা, চুতিয়া বনোয়ারী নাদন, ইসব তু বদন'পর ক্যায়া চড়ায়া, অ্যাঁ? কাঁহাসে চোরায়া?'

চোরায়া? চুরি? বেচন হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। একটু হাসি হাসি, একটু বোকা বোকা, করুণ চোখে তাকিয়ে, হতাসভরে সে বলল, 'হই লাও, চোরি হম কাঁহে করেগা?'

সেই জবাবের আগেই ভিড় ঠেলে অলগু এসে বলল বনোয়ারীকে, 'বনোয়ারী, তুমকো জলদি বাড়িবালা বোলাতা'।

বনোয়ারী তৎক্ষণাৎ ভিড় ঠেলে চলে গেল। বাড়িওয়ালা শুধু বাড়িওয়ালাই নয়, একটা ডিপার্টের সর্দার, দেশ গাঁয়ের ব্রাহ্মণ, একটা মুখিয়া রউয়া গোছনের আদমি। তার উপরে, সুদ কিস্তিবন্দীর কারবারী, ধার দেনা দেয়। অর্থাৎ দোষ, বিচার, জান-প্রাণ সব তার হাতে। সব ফেলে আগে-শুনতে যেতেই হয়।

বেচন আর কি করে। তার এত সাধের সাজগোচ, প্রাণে ঠাসা এত আজব অবাক কথা, সর্বোপরি নিজেকে একটা মানুষের মতো মানুষ বলে জাহির করা, সব তো বেঘাটে গেলই উপরন্তু আর একটা খলবালি মচাবার সূত্রপাত হল বস্তি জুড়ে।

তখনো সবাই তাকে ঘিরে রয়েছে, ছেলে মেয়ে যোয়ান বুড়োর দল। দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কথা বলছে নানারকম। আর ওদিকে মরা কান্না জুড়েছে মা আর বউ, ভাই আর বোন।

বেচন জেলে গিয়েছিল। দেড় বছর ধরে জেলে ছিল সে। না, চুরি বাটপাড়ি ক'রে যায়নি, কারখানায় রেশন হরতালে, যাকে বলে সে একেবারে মুখিয়া হ'য়ে উঠেছিল। কমতি খারাপ রেশন, জ্যায়দা দাম, কোম্পানির তাও বন্ধ ক'রে দেওয়ার ফিকির ছিল। আরও দশজনের সঙ্গে বেচনও এ অবিচারটা সহ্য করতে পারেনি। সে ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমত কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল। এমন কি তার এই বাপ, ঘিরে ধরা এই সব পড়শী-পড়শীনরা বেচনের কথায় একেবারে হল্লায় মাতিয়ে তুলেছিল কারখানা, ঘেরাও করেছিল ম্যানেজার সাহেবকে। সারা এলাকা জুড়ে যে হরতাল কমিটি হয়েছিল, বেচন সেই কমিটির মেম্বার হয়েছিল পর্যন্ত। একটা যা তা কথা নয়।

হ্যাঁ, নিজের প্রাণের কাছে তো আর সত্য কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই? কোত্থেকে তার প্রাণে এত তেজ ও ঘৃণা জন্মেছিল, সে কিছুতেই ঠাওরাতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু শুধু পদাধিকার নয়, কারখানার সকলের মুখে মুখে খালি বেচন, আরে এ কৌন বড়ি বাত্‌, লেবার অপসর, মানিজারের মুখেও বেচন নামটা শুনে, তার প্রতি সকলের নজর দেখে, গোপনে তার দিল এক রকমের বেহুঁস হ'য়ে পড়েছিল। আরে, আপ্‌না জানটাই তুচ্ছ হ'য়ে গেছল। এসপার নয় ওসপার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বেচনই লিকচার অবধি দিয়েছিল। বাপ অবশ্য কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিল তার সাথে। মাও তাই। বহু, মানে বউ তো এখনো বাপের ঘর থেকে গাওনা শেষ করে এখানে আসেইনি।

তাদের দাবি তো মঞ্জুর হ'ল আর সেই দিনই ম্যানেজার তাকে ডেকে পাঠাল কথা বলার জন্য। কথা বলতে গিয়ে, যাকে বলে 'বাকডোর' দিয়ে দারোগা সাহেব তাকে থানায় নিয়ে যাবার নাম করে একদম কলকাতা চালান করে দিল। বোঝ

ব্যাপারটা। সে জিজ্ঞেস করেছিল দারোগাবাবুকে, 'বাবু আপ্‌ হম কো কুথা লিয়ে যাচ্ছেন?

দারোগাবাবু তার দিকে চেয়ে, মুখে সিগারেট নিয়ে, হেসে বলেছিল, আসলি কারখানা মে, যেখানে পুরা রেশন মিলবে, আর পুরা হরতাল কমেটি হাজির আছে।'

দারোগাবাবুর প্রতি একবার অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল, সেজন্য সে বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু জেলে গিয়ে সে দেখেছিল, সত্যি একজন ছেড়ে, পুরো হরতাল কমিটি হাজির হয়ে গেছে। দেখে সে গম্ভীর হয়ে তাদের বলেছিল, তুমলোক আয়া এ হম পহ্‌লেই জানতা'।

আর সেখানে সে কি ছিল? না, রাজবন্দী। মানে? মানে 'ভেটিউন'।

কথাটা মনে হ'তেই সে আবার ঝাড়পাড়া দিয়ে উঠল তার অপ্রতিভতা ছেড়ে। সার্টের কলারটা ঠিক ক'রে নিল, বার দুয়েক প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বেশ সহবত দেখিয়ে, 'কেয়া তোমলোক সব আচ্ছা হ্যায় তো?'

কেউ হাসল, কেউ কৌতুকে ও সংশয়ে চুপ ক'রে রইলো। কেবল একজন অল্প বয়সী ছোক্‌রা ; বেচনেরই সমবয়সী দোস্ত বলল, 'হাঁ আচ্ছা-ই হ্যায়। ভাই বেচন, পুলিশ তোমাকে বহুত মার মারা?'

মার? অবিকল একটা শরীফ আদমির মত হেসে ফেলল বেচন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, হাঁ কোশিস কিয়া! আগরম্‌ বাগরম্‌ বাত পুছা হোই বাবু কাঁহা রয়তা? তেন্‌ বাবু কব আয়া? বোম্‌ কাহা বানাতা? ইসব্‌ একদম ফালতু বাত পুছা। তো কা বাতাই? বাতায়া নহি জানতা। তো হমকো ডর দেখায়া তুমকো মারকে খারাপ কর্‌ দেগা। হম কেয়া বোলা?

বলতে বলতে তার গলার স্বর এক পর্দা চড়ে উঠল। বাদবাকি সকলের চোখগুলি বড় হয়ে উঠল। আধা অন্ধকারে একদল কালো কালো ভূতের মতো ঔৎসুক্যে বিস্ময়ে জ্বল জ্বল করতে লাগল লোকগুলি। এমন কি রামদেই ও বউয়ের কান্নার স্বরটাও স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বেচন বলল, বোলা জানসে মার ডালো, যো হম্‌ নাই জান্‌তা ও কেয়সে বাতায়েগা? বোল্‌কে হম্‌ একদম চুপ হো গয়া উসকে বাদ হম্‌কো ফটো খিঁচা টিপসহি লিয়া ঔর ভেজ দিয়া জেহ্‌লমে। তার চোখে ফুটে উঠল হৃদয়ের চাপা বীরত্ব। আর সকলে তাদের বেচনেরই এই অভাবিত দুঃসাহসিক কাহিনী শুনে কয়েক মুহূর্ত থ' মেরে রইলো। ব্যাপারটা যদি কোন তেমন বাংগালি বাবুর হ'ত কিংবা বাবু সাহেবদের

কোন দিগ্‌গজ লেড়কার হ'ত তা' হ'লে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। এতো তাদের বনোয়ারীর ব্যটা বেচন কিনা!

বেচনের এবার আর এক মূর্তি। গম্ভীরভাবে একটু বা ঘাড় হেলিয়ে জিজ্ঞেস করল কারখানার হালচাল কি রকম?

সেই ছোক্‌রা দোস্ত বলল, 'আর হাল চাল। শালা রোজ খিচ্ খিচ্। একে ছাঁটাই ওকে চারসীট্। তাকে বোনিং (ওয়র্নিং) এতে রোজানা হোতা?'

হাঁ? বেচন বুক ফুলিয়ে জ্বলন্ত চোখে সকলকে একবার দেখে রীতিমত বক্তৃতার ঢং-এ বলতে আরম্ভ করল, 'হম কাল-ই কল্‌মে যায়েগা। দেখো ভাই বাহানোঁ জিসকো বোলতা মজদুর তুম্ ওহি হ্যায়। তুম্‌কো সব একাই রহেগা একসাথ লড়েগা তো কোম্পানি কা—

থামতে হ'ল। স্বয়ং সর্দার বাড়িওয়ালা হাজির তার বাপের সঙ্গে। একজন একটা খাটিয়া এগিয়ে দিল। তিনি বসলেন। গোঁফের ফাঁকে বিরক্তি ও হাসি। মোটা ভ্রু-র তলায় সংশয়ান্বিত অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি বেচনের দিকে।

সকলেই আবার চুপচাপ। যেন পঞ্চায়েৎ বসেছে। কাঠগড়ার বন্দীর মতো এতগুলি লোকের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ও বিচিত্র মানুষের মতো দাঁড়াল বেচন। তারপর স্তব্ধতা ভেঙ্গে সেই প্রথম বলে উঠল, 'নমস্তে বাবু সাহেব'।

নমস্তে! হুঁ। আর রাম রাম নয়। মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়ল সর্দার বাড়িওয়ালা কালিকাপ্রসাদ। অর্থাৎ ছোঁড়ার রোগ ধরেছে ভাল জায়গায়, এটাই বুঝল।

প্রচণ্ড শীত। তবু কেউ ঘরে যাচ্ছে না ভিড় ছেড়ে। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের দীপ্তিহীন তারাগুলি আদ্যিকালের ছানিপড়া বুড়োর চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে যেন। উঠোনের উপর নিম গাছটার পাতা নেই। এই ঘিরেধরা মানুষগুলির মধ্যে মনে হচ্ছে সেও এদের একজন।

ঘরে ঘরে একরকম কাজকর্ম বন্ধই প্রায়। তবুও পীদিম লম্ফ জ্বলেছে ঘরে ঘরে। না-বুঝ উৎসাহী অর্থাৎ বাচ্চারা আলোচনাটা নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়েছে। অন্যান্যেরা একবার দেখছে কালিকাপ্রসাদকে আর একবার বেচনকে। কালিকাপ্রসাদ বলল, 'বেচন, বেটা, তুই জেলসে আসছিস কিনা?'

বেচনের বোধ হয় কালিকাপ্রসাদের উপর মনটা একটু বিরূপ। নয় তো এতক্ষণে সে সত্যি খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে। জবাব দিল, 'জরুর। হম কেয়া ঝুট বোলতা?'

জবাবের ধরণ দেখে বনোয়ারীর হাত নিসপিস ক'রে উঠল। কালিকাপ্রসাদ কিন্তু মোলায়েম গলায় বলল, 'না, না, সে বাত নয়। তো এসব বঢ়িয়া চীজ তো'কে জেহ্‌লসে দিয়া?'

'নহি তো হম্‌ চোরি কিয়া?' ব'লে সাক্ষী মানতে গেল সবাইকে। অন্য সবাই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল তার দিক থেকে।

বনোয়ারী যথেষ্ট শান্তভাবেই ধমকে উঠল, 'চোপ, বাবুসাহেব যো পুছ্‌তা ঠিকসে জবাব দে। তু জেহল কোম্পানি কা লড়কা নহি, হমকো, হাঁ। এহি বনোয়ারীকো, হাঁ।'

সেসব দিকে বেচনের থোড়াই খেয়াল আছে। সে ততক্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তার চোখমুখে ছড়িয়ে পড়ে এক অপূর্ব দীপ্তি। তাতে মনে হচ্ছে, সে যেন ভীষণ রেগে উঠেছে। সে বোঝাতে আরম্ভ করল, সে কি ছিল। জেলে সে কিভাবে থাকতো, কি খেত। সরকার তাদের কি দিত। তারপর সে আরও জোরে গলা চড়িয়ে বলল, 'মগর কাহে? না, হম ডেটিউন লোক ফায়েট কিয়া।'

হাঁ, ফায়েট, ঔর চাল্লিশ ইয়ানে দো কুড়িরোজ সিরিফ ভুখা রাহা।

ভুখা? চল্লিশরোজ! বনোয়ারীর ধৈর্যের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে গেল। রাগে গরগরিয়ে খাড়া হয়ে উঠল তার ঘোটন পাঁশুটে গোঁফ। চেঁচিয়ে উঠল, চোপ হারামজাদ, ফির ঝুটা বাতয়েগা তো জুতি সে মুখ তোড় দে'গা।'

সে চেঁচানিতে বেচনের হাত পা শক্ত হয়ে উঠল। সাবধানের মার নেই। তবু সে হাত তুলে বোঝাতে গেল। কিন্তু তার আগেই বনোয়ারী সবাইকে সাক্ষী মেনে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ভাই শুনিয়ে বাবুসাহাব হম সাত রোজ ভুখা তখ্‌লিব সে সব ছোড়কে ভাগ আয়া বাঙ্গাল মে, আর এ চাল্লিশ রোজ ভুখা রাহা ওহি পাটলুন কা খাতির?'

জিভ দিয়ে একটা অধৈর্যের ও বিরক্তির শব্দ করে বেচন বাপের দিকে হাত নাড়িয়ে বলল, 'হাই লাও'—বাধা দিয়ে বনোয়ারীও রেগে উঠল, 'হাই লাও কেয়া রে শালা?'

বেচন এবার পালিশ করা মুখ বিকৃত করে, রীতিমত বেঁকে কোমরে হাত দিয়ে বলল 'তুম আপনা লেড়কাকো শালা বোলতে হো?'

বোধ হয় অপরিসীম বিস্ময়ের ঝোঁকেই একমুহূর্ত কথাই বেরুল না বনোয়ারীর মুখ দিয়ে। খালি গোঁফ জোড়া কাঁপতে লাগল। তারপর চতুর্গুণ জোরে সে প্রায় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কেয়া আজ নয় বোলতা হম অ্যাঁ? তু যব দুনিয়া নহি দেখা তব সে বোল্‌তা আর আজ তু হমকো সমঝানে আয়া?'

ব'লে কালিকাপ্রসাদের দিকে ফিরে বলল, 'বাবুসাহাব, ইসকো হম খুন করেগা আজ।'

কিন্তু খুনোখুনি সম্ভব হ'ল না। কেন না বনোয়ারীর ততখানি অগ্রসর হওয়ার সাহস ছিল না। সে যতখানি এগিয়েছিল, ততখানিই পেছিয়ে এল। হাঁপাতে লাগল চেঁচিয়ে।

কালিকাপ্রসাদ এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল বেচনকে, মনযোগ দিয়ে শুনছিল তার কথা। এবার সে স্থির বিশ্বাসে, গোঁফ মুচড়ে বলল, 'বেচন তু কিম্‌লিস্ বনকে আয়া, না?'

এই অভূতপূর্ব প্রশ্নে সকলেই উৎসুক চোখে তাকালো বেচনের দিকে, তার জবাবের প্রত্যাশায়। কথাটার সঠিক অর্থ সকলে জানে না আর সুখের হোক, দুখের হোক, অনেকে শোনেওনি।

প্রথমটা একটু বেকুফ হ'য়ে গেল বেচন। তার চাঁছা ছোলা মুখটা আর দশটা মুখের মধ্যে মিশে গেল যেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই পুরু ঠোঁটের ফাঁকে তার ঝকঝকে বড় বড় দাঁত বেরিয়ে পড়ল, 'ও কিম্‌লিস্, মানে জিস্‌কো বোল্‌তা কামনিস্, হ্যায় না? উ তো এক ভারী ক্রান্তিওকার কাম্‌নিস্ হোতা। হম্ অভি কেয়সে কামনিস্ হোগা? তব্ ......'

বলে সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। বোধ হয় তার জেল-জীবনের কথাগুলি একবার গুছিয়ে নিল মনের মধ্যে। তারপর বলল, 'এক বাত, টাইম যব আ' জায়গা, ক্রান্তিওকার যব হো যায়গা একদম ঠিকসে তব কাম্‌নিস্ বন যায়গা। হাঁ, কোই রোজ বন্ যায়গা।'

কথাটা সে এমনভাবে বলল, যেন খুব একটা গর্বের ব্যাপার এবং সে জন্য জীবনে অনেক কাঠখড় পোড়াবার দরকার আছে। বলা বাহুল্য, কালিকাপ্রসাদ তার কথাটা একেবারেই বিশ্বাস করল না। একতো বেচন কারখানায় হরতাল করিয়ে দিয়েছিল। তারপর দেড়সাল জেল খেটে এল, চল্লিশ দিন না খেয়ে ছিল, তার উপর ছোকরার চোহারাই বদলে গিয়েছে। এমনকি কথার ধরনও। সুতরাং ও জরুর কিম্‌লিস্ হয়ে গেছে, কিন্তু গোপন করছে। কালিকাপ্রসাদ ভাবল, ঠিক আছে, আমিও কালিকাপ্রসাদ সর্দার। ওর ভাণ্ডা আমি ঠিক ফোড় করব। তবে বস্তিটা একটু সামলে রাখতে হবে আর ম্যানেজারকে খবরটা দিয়ে দিতে হবে। বেগতিক দেখলে ভাগাতে কতক্ষণ।

সে বনোয়ারীকে ডেকে নিয়ে আড়ালে ব'লে দিল, 'খুব হুঁসিয়ার, তুহার লেড়কা বহুত্ ভারী কিম্‌লিস্ বনকে আয়া। উসকো নজর সে রাখনে হোগা, কিম্‌লিস্ পাটি উস্‌গো ছোড়ানে হোগা, সমঝা? নহি তো, বেমারি বাঢ় যায়গা উসকো!'

যা-ই হোক, বনোয়ারী মোদ্দা বুঝল তার ছেলে চুরি করেনি এবং ভগবান জানে জেলে ওকে কি তুক্ করেছিল, কিন্তু চল্লিশ দিন ও না খেয়েছিল সত্যি। অবশ্য পুরো বিশ্বাস সে কোনোদিনই করতে পারবে না। আর একটা ঘোড়া রোগ নিয়ে এসেছে হারামজাদা, অর্থাৎ কিম্‌লিস্ বনে এসেছে। কালিকাপ্রসাদ তাকে এও বুঝিয়েছে, লাল ঝাণ্ডা শিউপূজনবাবুর আছে, কাম্‌তাপ্রসাদ শেঠের আছে, নওরিনবাবুরও আছে, কিন্তু কিম্‌লিস্ এক আলাক্ চীজ। মুসলিম কিরিস্তান তো মানেই না, বোমা গুলি-গোলা হরবখ্‌ত ওদের জেবমে রয়তা।

অতএব! অতএব বনোয়ারী বুঝেছে, তার ব্যাটা এক ভয়াবহ জীব।

নগিনা মুচির ছেলে পাটলুন পরে, টেরি বাগায়, কিন্তু আসলে সেটা সিঁদেল চোর। ওকে পুলিশ উঠতে বসতে লাথায়, বছরে একমাস বাইরে থাকে। রাজিন্দরের ব্যাটাও ফুটানি করে, আসলে গুণ্ডামী ওর পেশা আর বেচন, কিম্‌লিস্! হায় রাম।

কিন্তু তবু সে আসল কথাটা চীৎকার ক'রে জানিয়ে দিল, 'যো ভি হো, হপ্তা মে হমকো দশ রুপেয়া দেনে হোগা, ফোটকমে খানা নহি মিলে গা, এ পহ্‌লেই বোল্ দেতা।'

বেচন তখন তার মা বুড়ি রামদেইকে বোঝাচ্ছে কি রকম তার জীবনটা কেটেছে। কাঁদবার কিছু নেই, সে মানুষ হ'য়ে এসেছে। কথাটা, কথার আড়ে ও চোখ ঠেরে তার বউ ঝুনিয়াকে জানান দিচ্ছে।

তবে মা কান্না ছেড়ে, রাগের অছিলায় অন্যদিকে মুখ ক'রে শুনছে কিন্তু থুতনি ঝুলে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে তার বিস্ময়ে। রেখাবহুল মুখে পাটের ফেঁসো লেগে দেখাচ্ছে যেন রং ওঠা ময়লা প্রতিমার মুখের মত। বউও শুনছে আটা মাখতে মাখতে। ভাইবোনগুলি গালে হাত দিয়ে শুনছে। খালি গা, ন্যাংটো তারা। শীত থাকলেও নেই।

শুনছে আরও কিছু যোয়ান ছেলে। বাদবাকিরা শুনছে বটে, কিন্তু যে যার ঘরের দোরে বসে। অনেকের একটা কৌতূহল আছে, ওই মন-ভোলানো চামড়ার পেটিটাতে কি আছে। হতে পারে, বনোয়ারীর কপাল ঘুরিয়ে দেবে বেচনের ওই পেটিটা।

কালিকাপ্রসাদ যে খাটিয়াতে বসেছিল, সেই খাটিয়াতে ঠ্যাং ফাঁক ক'রে পা ছড়িয়ে বসেছে বেচন। বলছে, হাঁ, জেহলকে ডাগদর, ভুখা হরতালকে টাইম মে জোর সে দুধ পিলানে আতা রাহা। তো কেয়সে পিলায়েগা? একঠো রবোর নল নাকমে পেটকা অন্দর ঘুসা দেতা, ঔর ছুক্‌ছুক্ দুধ ডাল দেতা। মগর হমলোক থোড়াই পিতা। রোজ মারপিট হোতা রহা।

এ অভিনব পন্থার কথা শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। একেবারে অবিশ্বাস করল বনোয়ারী। আবার তার রাগটা চড়তে লাগল।

কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই বেচন চট্ ক'রে পকেট থেকে ঝকঝকে পরিষ্কার একটা রুমাল বার করে নাক ঝেড়ে সকলের সামনে মেলে ধরল। সবাই কৌতূহলী হ'য়ে উঁকি দিয়ে দেখেই চমকে উঠল। এ যে রক্ত!

বেচন কিন্তু পুরু ঠোঁট উল্টে হেসে বলল, 'ঘাও হো গয়া, শুকায়া নাই অব্‌তক।'

এবার বনোয়ারীও সকলের সঙ্গে চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে রইল। দেখতে লাগলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ছেলেকে। না, খুশি সে কিছুতেই হ'তে পারছে না। এক তো মরদ হ'য়ে বেচন গোঁফ জলাঞ্জলি দিয়েছে, যেন অওরতে পালিশ করা মুখ। চৈতন অর্থাৎ টিকি, সেটাও জেহল কোম্পানিকে বিকিয়ে এসেছে আর কথাও বলছে ঠেট হিন্দীতে।

যাই হোক, সারা বস্তির দারুণ কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের মধ্যেই সারাদিনের খাটুনির পর শীতের রাত নেমে এল তার গাঢ় ঘুম নিয়ে। চোখের পাতা আপনি বুজে এল সকলের। এক ইঞ্চিও ফাঁক না দিয়ে ঘুমন্ত মানুষে ঠাসাঠাসি দাওয়া ও ঘর। বেচন জামা কাপড় ছেড়ে, রোজকার জেল জীবনের মতোই পায়জামা প'রে মুখ হাত পা ধুয়ে খেতে বসল। খেতে দিল তার মা আর বউ।

তারপর রাত্রে শুতে গিয়ে আবার এক কাণ্ড।

ঘরের বাইরেই উনুনের ধারে একটা খাটিয়া পড়েছে বেচনের শোয়ার জন্য। বাইরের থেকে আড়াল করার জন্য একটা চট চালার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঝুনিয়াকে বেচনের সঙ্গে রাত্রে শুতে দেওয়ার ব্যাপারে বনোয়ারীর ঘোরতর আপত্তি ছিল ; কিন্তু রামদেই ; অর্থাৎ মা সেটা হতে দিল না, কারণ মরদ ঘরে থাকলে অওরতের একলি শোয়া খারাপ। কেন? না, বরহমদেও কিংবা অন্য কোন অশরীরী-জিন-প্রেতের হাওয়া লাগতে পারে। মরদ থাকলে তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না।

সুতরাং বনোয়ারীর দরজা বন্ধ হ'ল আর ঝুনিয়া বেচারী এক কোণে মুখ ঢেকে পল গুণতে লাগল। ভয়ে সে আজ কিছু মুখে তুলতে পারেনি।

প্রথম কথা, গাহনা ক'রে যেদিন তাকে বেচন নিয়ে এল, যাকে সে তার কিশোরী প্রাণ ও মন সঁপে দিয়েছিল, সেই খোঁচা খোঁচা চুল, হলদে রং-এর ছোপানো ধুতি আর কামিজ পরা গাইয়ে বকবকে সে লোকটা এটা নয়। এর অন্য নাম ধাম হ'লেও সে বিস্মিত হ'ত না। অর্থাৎ এর কিছুই সে চেনে না। এমন কি এর গা ও জামাকাপড় থেকে যে গন্ধটা বেরুচ্ছে, সেটাই শুধু অপরিচিত নয়, তার মনে জেগে উঠেছে এক অচেনার দূরত্ব, ভয় ও কিছুটা বা সমীহ। তারপর খাটিয়ার বিছানাটা এত নরম,

ঝকঝকে ও বিচিত্র গন্ধযুক্ত যে, তার জীবনে ওরকম বিছানায় শোয়া দূরের কথা, কাছেও ঘেসেনি। সেজন্য তার শরীরও সিঁটিয়ে রয়েছে।

তা' ছাড়া সে শুনেছে একটা দুর্বোধ্য অদ্ভুত বিশেষণ,—লোকটা কিম্‌লিস্‌।

ঝুনিয়ার মনে হচ্ছে, একটা দোসরা মরদ তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে।

কিন্তু বেচনের সে সব খেয়াল থাকলে তো! মানুষের মুক্তির একটা দারুণ আনন্দ আছে। বেচন সেই মুক্তির নেশায় পাগল। সে দিব্যি গুন্‌গুন্‌ করছে বিচিত্র সব গানের কলি। কখনো, হৃদয়ের চাপা আবেগে সুর বেসুর হ'য়ে কেঁপে যাচ্ছে। তারপর সে ঝুনিয়াকে বোঝাতে আরম্ভ করল, সে কি হয়েছে। সে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'এ জান চলা যায়, তব্‌ভি মালিক কা জুলুম খতম করনে হোগা। কেয়সে? না, লড়নে হোগা। ইসলিয়ে লিখাপড়ি করনে হোগা জরুর। হমকো জেহলমে ইউ, পি, রহনেবালা এক ভারী বাবু বহুত কিছ শিখায়া। হম্‌ অভি কিতাব পড়নে সাকতা। তুমকো ভি শিখায়েগা।'

বলে সে বড়-বড় চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকাল হাত মুখ গুঁজে বসে থাকা ঝুনিয়ার দিকে। আবার বলল, 'দুনিয়ামে বহুত অওরৎ মরদকো সাথ কাম করতা, তুমকো ভি হমকো সাথ লে লেগা।'

বলে সে ঘাড় সোজা ক'রে দৃপ্ত ঘোষণার ভঙ্গিতে তাকাল ঝুনিয়ার দিকে। কিন্তু ঝুনিয়া একেবারে নিশ্চুপ। এমন কি নড়েও না।

আরও খানিকক্ষণ এসব কথা বলে ঝুনিয়ার দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল। 'ভালা খাটিয়া পর চলা আও, কাহে উঁহা বৈঠা। হম তো নতুন আদমি নহি।'

বলে সে ঠোঁট কুঁচকে হাসল। কিন্তু ঝুনিয়া এল না। বেচন বুঝল, অনেকদিন পর ঝুনিয়ার সরম হচ্ছে। হবেই তো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল গাহনার পর সেই স্বল্প দিনের জীবনের মধুর ছবি। প্রেমবতী কিশোরী ঝুনিয়ার সেই অবোধ চাউনি। হাসিতে টলটল, অভিমানে ছল ছল সেই চোখ, টকটকে কথা, ফিক্‌ফিকে হাসি, দিল যেন বাহারী ঝরনায় একেবারে আম্লান করে উঠত। হ্যাঁ, জেলে থাকতে ওই মুখ মনে করে তার বিনিদ্র রাত্রি নিঃশব্দে বোবার মতো গুমরে মরত। খা খা করত বুকের মধ্যে আর নিশীথে প্রহরীর বুটের শব্দ বিধৃত হৃৎপিণ্ডে। তখন মুক্তির জন্য পাগল হ'য়ে উঠত সে। সমস্ত বাইরের জীবন তাকে তখনি ডাকত হাতছানি দিয়ে। সে সব ভুলে অন্ধকার সেলের মধ্যে অভিশপ্ত অশরীরীর মতো চার দেয়ালের দিকে দিশেহারা চোখে তাকাত।

আজ সে মুক্ত। আজ সে বস্তিতে। মন তার আজ সাফ হয়ে গেছে। আর ওই তো ঝুনিয়া। ভাবতে ভাবতে কি হল জানি না, বোধ হয় অধীরা অন্ধেরা মহব্বতে

নিজেকে আর সামলে রাখা দায় হ'ল তার। সে আরও কয়েকবার ডেকে যখন সাড়া পেল না, তখন হাসতে হাসতে গিয়ে হাত ধরে টান দিল।

ঝুনিয়া ওই সব লিখাপড়ি ও বেচনের সঙ্গে যাওয়ার বক্তৃতা শুনে ভয়ে এমনিতেই নিঃশব্দে কাঁদছিল। এবার হাত ধরতে ভয় তার দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস তার আটকে এল।

কিন্তু বেচন সেটা বুঝল না। অন্ধ প্রেমাবেগে ঝুনিয়াকে দু'হাতে সাপটে ধরে তার গোঁজরানো মুখে একটা চুমো এঁকে দিল।

কিন্তু বিপাকে ব্যর্থ ঝুনিয়ার গলা দিয়ে রুদ্ধ কান্নাটা আচমকা হাউ মাউ শব্দে বেরিয়ে এল। কেন না, লোকটা যে এমন অভাবিতভাবে তাকে এরকম করবে, এটা মোটেই ভেবে উঠতে পারেনি।

কান্না শুনেই ঘরের ভেতর থেকে বনোয়ারী, 'কা ভইল, কা ভইল' বলে চীৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে রামদেইয়ের গলাও। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকেও লোকজন চড়া গলায় সাড়া দিয়ে উঠল, জেগে উঠল বস্তি। এরকম হঠাৎ শব্দে কুকুরগুলিও ঘেউ ঘেউ শুরু করল।

বেচনের হাত পা এলিয়ে পড়ল। আর তার মুখ দিয়ে খালি বেরিয়ে এল, 'হাই লাও'!

এই 'হাই লাও' কথাটাই একমাত্র ঝুনিয়ার পরিচিত। ওই একটা কথাতেই সে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছে না যে, এ বেচন সে বেচনই আছে।

কিন্তু ততক্ষণে বনোয়ারী বেরিয়ে এসেছে। রামদেই এসেছে, তা' ছাড়া অন্যান্য দু'চারজন।

সকলের প্রশ্নের সামনে বেচনকে মনে হ'ল যেন অপরাধী ধরা পড়ে দাঁড়িয়ে আছে তবু বোকার মতো হেসে সে বলে ফেলল, 'ইয়ে ডর গয়া।'

তখন বনোয়ারী দুষল রামদেইকে, 'তুহকো হম্ কেয়া বোলা? এ লেড়কা কেয়া না কেয়া বনকে আয়া, তো অওরত কেয়সে রহেগা?'

রামদেই বুঝল অন্যরকম। সে খিঁচিয়ে উঠল বনোয়ারীকে, 'ওইসা হোইবেই করতা। জিন্দিগীভর ইস্‌কো এ মরদকো সাথ রহনে পড়েগা কি নহি? মরদ যো ভি হো, কিম্‌লিস্ হো, ডাকু হো চুহা হো। ছোড়, তুম ঘর চলা আও।'

বলে সে বনোয়ারীকে নিয়ে ঘরে চলে গেল। অন্যান্যেরা হাসির চেয়েও বেশি বিস্মিত হ'য়েই ফিরে গেল।

ঝুনিয়া দাঁড়িয়ে রইল তেমনি, মুখ ঢেকে। সে এখন নিঃশব্দে কাঁদছে, ব্যাপারটার জন্য নিজেকে অপরাধি ক'রে সে বড় অপ্রতিভ হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু সে যে অনুপায় হ'য়েছিল।

আর বেচন! অভিমানে বুক ভরে উঠল তার। মহব্বত ভুলে গেছে ঝুনিয়া। বেজায় মন খারাপ ক'রে সে শীতের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে আসতেই আবার তার মনটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। কতদিন বাদে সে আবার নিশীথ রাত্রে আকাশের তলায় দাঁড়িয়েছে। বস্তীর পুরানো কুকুরটা তাকে ঠিক চিনে এসে গায়ে পড়ছে, পা চেটে আদর কাড়াচ্ছে। ওই তো গঙ্গা, একটা অদৃশ্য গহ্বর থেকে যেন ধোয়ার মত কুয়াশা উঠছে। ওই শহরের বড় রাস্তার বিজলী বাতি, কারখানার চিমনি। মনে মনে বলল, 'সব ঠিক হো যায়েগা, হাঁ। ঝুনিয়া, বাপ, মা, পড়শী ঔর কারখানার মজদুর।

কাহে? না, বেচন রাস্তা দেখায়েগা।

ওই একটা চিন্তায় সে মশগুল হয়ে রয়েছে। জীবনে এখন তার একটাই কর্তব্য, যেমন করে হোক, একটা খাঁটি কামনিসের মতো মজদুরের জিন্দীগী বদলে দিতে হবে। সে কামনিস হতে চায়। কেন, তা সঠিক না বুঝলেও একটা বিচিত্র ঝাপসা শুভদিনকে সে কামনা করছে।

কিন্তু এর পরে সকলের কাছে সে এবং তার কাছে সকলে ও নিজেই সে একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল। একেত কথা, পরদিন ভোরবেলা যখন সে টুথপেষ্ট ও ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজছে, তাই কারখানায় বেরুবার মুখে বাপের সঙ্গে তার আবার ঝগড়া লাগল। শুধু বাপ কেন, সারা বস্তীর লোক হাঁ করে তাকিয়ে এ রাজকীয় কায়দায় দাঁত মাজা দেখল। তাদের মতে মানুষেরা চিরকাল ছাই দিয়ে নয় তো দাঁতনে দাঁত মলে। আর এ যে বুরুশ। বনোয়ারী ব'লে গেল।

'বিলাইতি বুরুশ কাঠিসে দাঁত বানাতা! ঠার যা শালা কল্‌সে আ'কর—'

বেচন এসব কথায় কানই দিল না। সে যেমন কাল সকালেও মাজনে দাঁত মেজেছিল, তেমনি মাজতে লাগল। বরং মনটার মধ্যে ছিল না বন্দী জীবনের অবসাদ।

যাই হোক, কারখানা থেকে এলেও সেদিন এবং আরও কয়েকদিন ঝগড়া বিবাদটা চাপা রইল। কারণ বেচন এক জোড়া নতুন ধুতি তার বউকে আর মা'কে দিয়েছে, বাপকে দিয়েছে একটা ধুতি আর কামিজ। তা'ছাড়া খান তিনেক গোটা কামিজ ও পায়জামা দান করেছে সে তার সমবয়সী বস্তির দোস্তদের। অবশ্যি তারা সকলেই স্পিনার, পুরান সহকর্মী।

এতেও বনোয়ারী বলতে ছাড়ল না, 'বড়া তালুকদার আইলান! আধা পয়সাকে বাচ্চা নাই, চাঁদি কা বাপ্ বনতা হ্যায়'। শোনা যায় বেচন হয় তো তখন ঠ্যাং ফাঁক

করে বাড়ির কাউকে বোঝাচ্ছে, "হাঁ, হাঁ, ভাই হম বোল্‌তা, ইস ঘড়ি মজদুর কো রাজ জরুর হোনা চাহি। আঁা, কেয়সে? আচ্ছা, ঠ্যাহ্‌রো।

ব'লে কখনো তারে জেল থেকে নিয়ে আসা তিনটে কেতাব ঘাটতে বসে নয় তো বলে, 'আচ্ছা কাল বাতায়েগা।'

কিন্তু কিছু একটা বাতায় ঠিক তার পরদিন। তার শ্রোতারা অবশ্য দু'একবার বড় বড় জলসাতে, ওই 'মজদুর রাজ' কথাটা শুনেছে, কিন্তু তার অর্থ বোঝেনি। ভেবেছে উপর থেকে একটা কিছু হ'তেও পারে। কিন্তু বেচনের মুখ থেকে কথাটা শুনে সত্যি তারা বিস্মিত হয়। সংশয় ও অবিশ্বাস্য রকমের একটা ভাবের উদয় হয় তাদের। কেউ কেউ স্রেফ হাসে, গালি বকবার সংখ্যাও কম নয়। অর্থাৎ বেচনের প্রতি দু'চার জনের মনে রীতিমত সম্মান আছে। বেশিসংখ্যক সংশয়ান্বিত, অনেকে ভীত আর অবিশ্বাসী ও বিদ্বেষীও কিছু কিছু আছে।

তারপর, এসব জামাকাপড়ের ব্যাপার না মিটতেই বেচনের দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, তেল, সাবান, চুল-গোঁফহীনতা ও পোষাক নিয়ে নিত্যই বনোয়ারীর সঙ্গে মারামারির উপক্রম হ'তে লাগল। এর একটা চূড়ান্ত ঘটনা ঘটল, যেদিন বেচন পাটলুন আর কামিজ পরে একেবারে কারখানার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। এমন কি সে ডিপার্টের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিল। খবর পেয়ে গোরা ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়র, কালা লেবার অপসর, বড় সর্দার আর দুটা দারোয়ান একযোগে তাকে তাড়া ক'রে এল। বেচন যত তাদের বোঝাতে যায় "সে সিরিফ মোলাকাত করনে আয়া" কিন্তু কেউ তাকে বিশ্বাস করল না। তখন সে রেগে চীৎকার করে জানিয়ে দিয়ে এল, 'লেকিন বাইরে সে মোলাকাত করবেই। এই বেইমান মানিজার সাহাব তাকে ধোঁকা দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিল, এরজন্য একদিন তাকে সাজা জরুর নিতে হবে।' ততক্ষণ তাকে ঠেলে বাইরে বার ক'রে দেওয়া হয়েছে।

কালিকাপ্রসাদ বনোয়ারীকে খালি ঠুকে দিল, 'কেয়া বোলা রহা হম? তুহার লেড়কা কো ঘরসে ভাগানে হোগা, নহি তো বঢ়ি হুজ্জোৎ মচেগা।'

বনোয়ারী বস্তিতে ঢুকেই প্রথমে পট করে ভেঙ্গে ফেলল বেচনের টুথব্রাশটা। তেলের শিশিটা ফেলতে গিয়ে দেখল তেল নেই। তবু ফেলে দিল। ফেলে দিল সাবানের বাকসো। তারপর হাতের কাছে চট ক'রে কিছু না পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, "কাহা গয়া" লে আও শালা জেহ্‌লকে বাচ্চাকো।

কিন্তু সেই জেলের বাচ্চা (বনোয়ারীর ভাষায়) তখন কোম্পানির লাইনের মজদুরদের বলছে, 'দেড় সাল কেয়া, জিন্দীগী ভর রহনে সাকতা জেহ্‌লমে, মগর কামিয়ার হোনা চাহি।'

তারপর বস্তিতে ঢুকতে না ঢুকতেই বনোয়ারী তাকে তাড়া ক'রে এল কিন্তু গায়ে হাত তুলতে গিয়েই থমকে গেল এবং ঘুসি বাগিয়ে মার খাওয়ার জন্য ডাকতে লাগল।

বেচন শান্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'দিমাক ঠিক রাখো। কাহে? না, তুম মজদুর হ্যায়।'

রাগের চোটে অজ্ঞান হয় আর কি বনোয়ারী। শেষটায় চামড়ার সুটকেশটা ঘর থেকে এনে বেচনের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলল, 'অভি নিকালো, নেই মাংতা। দেখে'গা কেতনা বড়া কিম্‌লিস্‌ তু বনলে।'

কিন্তু বেচন অপ্রতিভ অথচ নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার পরে বলল, 'আচ্ছা, থোড়া দিন বাদ চলা যায়েগা।'

টুথব্রাশ কিংবা তেল এসব নিয়ে বেচনের ভাবনা ছিল না। কেন না খালি ব্রাশ থাকলে তো হবে না, মাজন চাই। কিন্তু পয়সা নেই। সুতরাং তেল সাবান মাখা তার এমনিই বন্ধ হয়ে গেল। জামা কাপড়ে সাবান না পড়ে সেগুলিও ময়লা হ'য়ে গেছে। চাকচিক্য কমে গেছে তার। এমন কি, ব্লেড নেই, পয়সা নেই, তাই গোঁফও রীতিমত কামানো হয় না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি এখন প্রায় সব সময়েই তার মুখে দেখা যায়।

একটা কাজের খোঁজে সে রোজই এদিকে ওদিকে যায়। কিন্তু এখানকার কোন কারখানা তাকে কাজে নিতে রাজী নয়। সেই এক কথা, কামনিস্‌।

শরীরটাও তার ভাঙতে আরম্ভ করেছে। কোটরে ঢুকেছে চোখ। তা' হলেই বা কি। সে ঠিক দুপুর বেলা নিয়মিত ওই কেতাব তিনখানি নিয়ে বসবে, আর বাচ্চা পড়ুয়ার মতো চেঁচিয়ে পড়বে, 'দুশমন হরবখত নজর রাখতে হৈ কি হমারা সংগঠন কি স্ক্রুপ কাঁহা ঢিলা হ্যায়'। জেয়সে কি বামপন্থা উর দকছিন পন্থা—

থামতে হয়। বাম ও দক্ষিণের ব্যাপারটা মাথার মধ্যে গণ্ডগোল পাকায়। ছোটে নারাইনবাবুর কাছে। তিনি নাকি কামনিস্‌। কিন্তু যা বলেন, বেচনের মাথায় তার চার ভাগের এক ভাগও যদি ঢোকে। সুতরাং কিছুটা তাকে মনগড়া ভাবতেই হয়।

কেতাব তিনখানি ছাড়া তার সুটকেশে কাগজ চাপা আরও দুটি বস্তু ছিল। একটি হিমানীর নতুন কৌটা আর একটা পাওডার। ব্যাপারটা অবশ্য খুবই গোপনীয়। বস্তু দুটি সে ঝুনিয়ার জন্য রেখেছিল। কিন্তু ঝুনিয়ার সঙ্গে তার প্রেমের সন্ধি আজও হ'য়ে ওঠে নি। অবশ্য কান্নাকাটি সে আর করে না। কিন্তু সে মহব্বত তার নেই। সে দেখে ঝুনিয়া একেবারে নিস্পৃহ, বরং তার বাপ মায়ের কথা শুনে শুনে, বেচনের উপর যেন বিরক্ত। এমন কি একদিন বলেও ফেলেছিল, কাঁহে তু কিম্‌লিস্‌ বন্‌

গেইলান? বোঝাতে তো বেচন পারেইনি, উপরন্তু ঝুনিয়া আরও সরে গেছে। বস্ত্র দুটি বেচন তাকে দিয়েছিল, সে নেয়নি। বলে দিয়েছে, মরে গেলেও ওসব সে মাখতে পারবে না, কেননা ততখানি খারাপ অওরত সে নয়। প্রেম অথবা বিরহের বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই বেচনের, তাই চুপ করে থাকে। আর বুকের মধ্যে তার টনটন করে। কিন্তু সে টনটনানির অনুভূতিটা তার কাছে মোটেই পরিষ্কার নয়।

যাক, এখন কাজ খোঁজা আর পড়া ও কোম্পানির লাইন ও বস্তিতে গিয়ে সবাইকে তার কথাটা বলাই একমাত্র কাজ।

ইতিমধ্যে শীত চলে গেছে। বসন্তও বিদায় নিয়েছে। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে আকাশ মাটি তেতে রয়েছে। সব জ্বলছে। এখনো জ্বলছে গঙ্গার ধারে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল।

এতদিন পরে একটা কাজ পেল বেচন। লালাসাহেবের কুড়িটা রিক্সাওয়ালাকে রোজ খুঁজে খুঁজে পয়সা আদায় করার কাজ। ভাল কাজ। বিশ্বাসের কাজ।

কিন্তু হ'লে কি হবে। রিক্সাওয়ালাদের সে বোঝাতে আরম্ভ করল, লালা সাহেব তাদের সিরিফ ঠকাচ্ছে, তারা সবাই একদিন লড়ে যাক। কথাটা লালা শুনেই তাকে বিদায় ক'রে দিল।

তারপরে এক বড়লোকের গদীতে তার চাকরের কাজ হ'ল। সেই বড়লোকটি মাতাল আর রসিক। এমন কি সে বেচনের সঙ্গেও রসিকতা করত। সুযোগ বুঝে বেচন তাকেও জেলের কথা এবং মজদুর রাজ বোঝাতে গেল। ব্যস্! মাতালের রসপূর্ণ ঢলঢলে চোখ একেবারে ছানাবড়া। ভাবল, বুঝি বরবাদ হ'ল তার গদী। গেল কাজটা।

দেখে শুনে বনোয়ারীর আর সহ্য হচ্ছিল না। বেচনের লাইনে বস্তিতে যাওয়া নিয়ে কালিকাপ্রসাদ তাকে রোজ খিঁচোয়, ভাগিয়ে দিতে বলে।

বনোয়ারীর মাথার ঠিক থাকে না। সবচেয়ে রাগ হ'ল তার ওই কেতাব তিনটের উপর। চাবি লাগানো সুটকেশ ভেঙ্গে সে একদিন বার করে ফেলল কেতাব তিনটে। নিজে পড়তে পারে না, নিয়ে গেল কালিকাপ্রসাদের কাছে। কালিকাপ্রসাদও ব্রাহ্মণ বটে, সেও পড়তে জানে না। চৌরাস্তার মোড় থেকে ডেকে নিয়ে আসা হ'ল নারদ পণ্ডিতকে।

নারদ পণ্ডিত দেখল, একটা বইয়ের নাম 'কমিউনিজম'। ভেতরে একটা দাড়িওয়ালা লোকের ছবি, নীচে লেখা রয়েছে 'ঋষি কার্ল মার্কস'। আর একটা বইয়ের নাম 'মার্কসবাদী শিক্ষা'। ভেতরে ছোট ছোট দাড়ি ও গোঁফওয়ালা, টাকওয়ালা

মানুষের ছবি। চাউনিটা চোখা। নীচে লেখা 'মহামতি লেনিন'। তৃতীয়টা 'ভূখা মজদুর', লেখক—রামনরেশ গুপ্ত।

দেখেই নারদ পণ্ডিত বই কটা বিষবৎ মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল, 'ইসকো ছুঁনেসে পাপ হোতা।'

'তুমকো লেড়কা একদম জাহান্নাম মে গয়া।'

কালিকাপ্রসাদ বলল, 'পণ্ডিত, কিম্‌লিস্‌ কিতাব হ্যায় না?'

পণ্ডিত বলল, 'উসসে ভি খারাপ।'

বনোয়ারীর তো গায়ে কাঁটা দিল। বলল, 'কেয়া, মুসলমানি কিতাব?'

ছবিগুলি দেখে ওইরকম অর্থই সে করেছে। পণ্ডিত বলল, 'উসসে ভি খারাপ। ঈশ্বরকে গালি লিখা হ্যায়। লেড়কা একদম বিগড় গয়া।'

আর বলার দরকার ছিল না, রাগে গোঁফ ফুলিয়ে বনোয়ারী বই কটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর হাঁটু মুড়ে বসল যেন, সে এতদিনে সত্যি বেচনকে শায়েস্তা করেছে।

ব্যাপারটাতে দু' একজনের আপত্তি ছিল। কিন্তু পণ্ডিত আর কালিকাপ্রসাদের সামনে বলতে সাহস পেল না।

সে সময়েই এল বেচন। একমুখ দাড়ি, নোংরা পাটলুন, ছেঁড়া জামা। মুখের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে আসছিল,

একবার হো খাড়া হিম্মত সে
কিস্মত লুটো দুনিয়াসে।

কিন্তু লোকজন দেখে থেমে গেল। তারপর ব্যাপারটা বুঝে সে কিন্তু ক্ষেপল না। ছেঁড়া কাগজগুলি দেখিয়ে বনোয়ারীকে জিজ্ঞেস করল, 'কৌন্‌ ফাড়া, তুম্‌?'

বনোয়ারী একটা হাতাহাতির আশঙ্কায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাঁ', তুহার বাপ।'

'এ তো সহিবাত।' ব'লে বেচন সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, তীব্র গম্ভীর গলায় হাত নেড়ে নেড়ে বলল,—

'তুম গলতি কিয়া। কাহেঁ, না মজদুর কো এক বহুত হামদরদী, এক মহাক্রান্তিকারকো কিতাব তুম ফাড় দিয়া। দেখো, আজ দুনিয়ামে—'

বনোয়ারী চেঁচিয়ে উঠল, 'চোপ! চোপরহো।'

বেচন তখন নারদ পণ্ডিতের দিকে ফিরে হাত জোড় করে নমস্তে জানিয়ে বলল, 'পণ্ডিতজী, শুনিয়ে, আপ সমঝেগা।'

পণ্ডিত লাফ দিয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, 'খবরদার সমঝায়গা তো আচ্ছা নহি হোগা, হাঁ!'

বেচন অবাক হ'য়ে বলল, 'হাই লাও।'

বনোয়ারী ভেংচে বলল, 'কেয়া লেগা রে? তু পণ্ডিতজী কো সমঝানে মাংতা? অভি নিকালো শালা, নিকালো।'

শালা কথাটার প্রতিবাদের ইচ্ছা থাকলেও করল না বেচন। কেন না, সে ভীষণ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। কিন্তু এ সময় খেতে চাইলেও পাওয়া যাবে না। সে তার কোটরাগত বুভুক্ষু চোখে তাকিয়ে দেখল, ঝুনিয়া রুটি সেঁকছে। রুটি সেঁকতে সেঁকতে ঝুনিয়া এদিকেই তাকিয়েছিল। বেচনের চোখ পড়তেই, চোখ সরিয়ে নিল সে।

আর কোন কথা না ব'লে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেচন ধীরে ধীরে চলে গেল। এবং সে সত্যিই কিছুদিন বস্তিমুখো হ'লো না। তার কারণ ছিল। কারখানার জনা চল্লিশ লোককে ছাঁটাই করার কথা চলেছে। সে গিয়ে সেখানে ভিড়েছে। তাদের নিয়ে পড়েছে। শিউপূজনবাবু, কামতাপ্রসাদ নওরিনবাবুও এসেছেন। তা হ'লেও বেচন ব্যাপারটাকে তো আর এমনি ছেড়ে দিতে পারে না।

ছাঁটাইয়ের মধ্যে তার মায়ের নামও ছিল। সে জন্য সে একদিন পথে তার মা'কে ধরেছিল, ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য। কিন্তু বনোয়ারী তাকে ইঁট নিয়ে তাড়া করেছিল। বলেছিল, 'শালা, কিম্‌লিস্‌গিরি দেখানে আয়া?' ফের শালা শুনে খানিকটা অভিমান করে'ই চলে গিয়েছিল বেচন!

এখন বেচনের চেহারাটা হয়েছে যেন ভবঘুরে মাতাল পাগল ও ক্ষুধার্ত ভিখিরির মত। বিশ্বাস করা দায়, একদিন শীতের সন্ধ্যায় সে বেশ ফিটফাট পালিশ হয়ে এসেছিল। তার দোস্ত ইয়াররা অবশ্য তাকে খাওয়ায়, যেমন চা আর পান। কোন কোন সময় দুটো লেড়ো বিস্কুট কিংবা দু'পয়সার মুড়ি।

কিন্তু ব্যাপারটা এমনই যে গত রেশন স্ট্রাইকের সাফল্য এবং তার পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে তাকে একটা কিছু করতেই হবে।

কিন্তু শ্রমিক সব সময় তার কথা শোনেই না অবশ্য বেচনকে তারা একেবারে ফালতু মনে করছে না। তবে শিউপূজন কিংবা নওরিনবাবু অর্থাৎ নরেনবাবুর বুদ্ধির কাছে কোম্পানি হার মানলেও মানতে পারে।

বেচন এখানে সেখানে মজুরদের ধরে ঠেট্ হিন্দীতে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কেয়া, তু মধু খানে মাংতা হ্যায় কি নাহি? মাংতা? তব, ইয়ে ভি খেয়াল রাখো, চাক টুটানে পড়েগা, মৌমাছিকে হুল খানে হোগা, সমঝা?'

সমঝাতে গিয়ে অনেকে দুর্বোধ্য নজরে চেয়ে থাকে। কেন না, আর যাই হোক, মৌমাছির হুল্‌ যদি জেল কোম্পানির গেট হয় তা'হলে তো বড় ফ্যাসাদ। তা সে জেল থেকে বেচন যা'ই বনে আসুক। সুতরাং ভয়ও হয় তাদের।

কখনো দেখা যায়, নওরিনবাবু বা কামতাপ্রসাদের সঙ্গে সে রীতিমত তর্ক জুড়েছে এবং হঠাৎ 'আজ দুনিয়ামে মজদুর লড়াই কা রাস্তা' বাতাতে সুরু করেছে।

ওদিকে কালিকাপ্রসাদ তো রোজই বনোয়ারীকে ধম্‌কাচ্ছে যে, সে যেন তুরন্ত তার লেড়কাকে এলাকা থেকে বার ক'রে দেয়। বার করবে কি করে? হারামজাদাকে তো সে কাছেই পাচ্ছে না। আর সুটকেশ ও বেচনের ময়লা হয়ে যাওয়া বিছানা ছাড়া প্রতিশোধ তোলার আর কোন বস্তুও নেই।

এদিকে একদিন সকাল বেলা গণ্ডগোল লেগে গেল। যাকে বলে খলবলি মচে গেল। অর্থাৎ ছাঁটাই নোটিস জারি হয়ে গেল।

বেচন তখন রেল সাইডিং-এর গুমটি ঘরের বারান্দায় ঘুমোচ্ছে, যেন রাতজাগা লোম ওঠা ক্ষুধার্ত নেড়ি কুকুরটা দিনভর ঘুমোচ্ছে।

সাইডিং-এর গেটওয়ালা রামু তাকে ডেকে বলল, 'কা হো মহারাজ, আজ দুনিয়ামে ছাঁটাই নোটিস গির গিয়া।'

হাঁ। বেচন লেটপেট করতে করতে কারখানা গেটের কাছে এসে পড়ল। ছিল গাট্টা গোট্টা, এখন লম্বাতে-ঢেঙা, কিন্তু কারখানার গেটের কাছে কেউ-ই নেই।

বেচন উঁকি দিতে গেল, দারোয়ান তেড়ে এল।

সে বারকয়েক পায়চারি ক'রে মাথা নেড়ে ফের দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন তার বউ প্রসব ব্যথায় ভেতরে কাতরাচ্ছে আর সে ছটফট করছে অকর্মার মতো।

একটু পরেই শিউপূজনবাবু কারখানা থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বেচন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ভীষণ ব্যস্তভাবে সে অন্যদিকে পা চালিয়ে দিল। এ তো বড় মুসকিল! তা হ'লে কিভাবে কাজ হবে?

তারপর টিফিনের সময় মজুররা সব বেরিয়ে এল। সেই সঙ্গেই চল্লিশজন ছাঁটাই মেয়ে ও পুরুষ। তার মধ্যে বেচনের মা-ও ছিল। তারা সব বুক চাপড়ে কোম্পানির মা বাপ তুলে গালাগালি দিচ্ছে।

বেচন মনে মনে বলল, 'ইলোক বুজদিল, কাহে গালি বকতা?' সে একে তাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু কেউই তার কথায় কান দিচ্ছে না।

তখন সে কারখানার সামনে মাইল পোস্টের ৬ ইঞ্চি জায়গার উপর কোন রকমে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, 'আরে ভাগতা কাহা তুঁ লোক? অ্যাঁ হমকো পহ্‌চানতে কি নহি?'

চেনে বই কি? কিন্তু চিনে কি করবে? জনারণ্যের স্রোত বেরিয়েই চলল। বেচন একবার বলল, 'হাই লাও।' সংকীর্ণ জায়গায় তার পা দুটো টলে গেল। তারপর আবার সোজা হ'য়ে সে চীৎকার ক'রে উঠল, 'হম বেচন। হম্ বোলতা, তুলোক ঠার যা। ছাঁটাই জরুর বন্ধ করনে হোগা। দেখো ভাই, তু'লোক মজদুর হ্যায়, এতনা মজদুর হ্যায় কি জিসকা তাগদ ম্যানেজারসে জায়দা হ্যায়। হাঁ, আজ কে দুনিয়ামে ......'

জনারণ্যের স্রোত দ্বীপের মতো এখানে ওখানে সত্যি থমকে গেল। ভিড়ের মধ্যে বনোয়ারীর হাত নিসপিস্ করছে। শুয়ারের বাচ্চাটার চুলের মুঠি ধরে না নামালে চলবে না দেখছি। খুব কিম্‌লিস্‌গিরি হচ্ছে। হারামদাজার জেবমে বোম্ হ্যা কি নেহি?

বেচন বক্তৃতা ছেড়ে মাঝে একবার বলে উঠল, 'নাথুনি, মত যাও। কাহে? না, তুঁ এক বুঢ়া মজদুর।'

কামতাপ্রসাদ আর নওরিনবাবু দূর থেকে তাকে তারিফ করছে, এটা বেচন দেখতে পেল। ফলে তার গলা আরও চড়ল। সে এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল। পা বদলে বলল, 'হম বেচন, জেহ্‌লমে গয়া। কাহে? না রেশন কা হরতাল কিয়া। তু লোক উস বাত ভুল গয়া? তু ভুল গয়া, ঔর কারখানা ছোড়কে চলা যাতা?'

এক পশলা বৃষ্টির পর কাঠফাটা রোদে সবাই নাক-মুখ কুঁচকে দাঁত জীভ্ বের করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবাই ঘিরে ধরছে তাকে। সে ঘামছে আর গায়ের মধ্যে কুটকুট করছে।

কিন্তু সব ভুলে সে বলেই চলল। 'উস ঘড়িকে বাত ইয়াদ করো, ছাঁটাই নোটিস অফিসকে টেবিল প'র জমা কর্ দো। কাহে? মজদুর তু খানা বিনা সব মর জায়গা তো জামানা কৌন বদলেগা।'

একটা সমর্থনসূচক ধ্বনি উঠল। বেচন ঘাম মুছে আবার বলবার উপক্রম করতেই কি একটা ঘটে গেল। সবাই শুনল, একটা চাপা আর্তনাদের গলা 'হাই লাও!' আর ঠিক একটা কাটা কলা গাছের মতো বেচন ঝরে পড়ল মাইল পোস্টের গায়ে।

চারিদিকে একটা রব উঠল, খুন, খুন হো গয়া। অনেকে পালাতে লাগল, কেউ কেউ দিক ভুল করে ছুটোছুটি করতে লাগল।

কিন্তু রামদেইয়ের বিকট চীৎকারটা একটা স্তব্ধতা এনে দিল। বুড়ি রামদেই ছুটে এসে বেচনকে তার কোলে টেনে তুলে নিল। বেচনের তখন চৈতন্য নেই, সে উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে। ফাটা মাথায় রক্ত ফিনকি ছুটছে। রামদেইয়ের রেখাবহুল মুখটা কুঁচকে আটার দলার মতো ছোট হ'য়ে এল আর অন্ধ হয়ে এল চোখ। বলল,

'এ তু কেয়সা বুজদিল কিমলিসোয়া বনকে আয়া, অ্যাঁ? জেহ্‌ল কোম্পানি তুহ্‌কো কেয়া বন দিয়া।'

যাই হোক, কামতাপ্রসাদ বলল, 'ডগদরখানায় যেতে হবে।'

বনোয়ারী একটা অবাক বোকার মতো দাঁড়িয়ে তার বউ আর ছেলের দৃশ্য দেখছিল। তাকে খেঁকিয়ে উঠল রামদেই, 'আরে এ বুজদিল বুড্‌ঢা, তু খাড়া হোকে কা দেখতা, বেটা কো উঠাও।'

কাকে? বেচনকে? যেন এ অভাবিত কথা বনোয়ারী কখনো শোনেনি। এমন কি তার সরম হ'তে লাগল। তবু দুহাতে তুলে নিল বেচনকে।

তারপর ডাক্তারখানা থেকে মাথা সেলাই করে সুঁই দিয়ে বেচনকে নিয়ে বস্তিতে এল তারা। তাদের সঙ্গে অনেক লোক কারখানার মজদুর! তারা কেউই আজ কারখানায় আর যায়নি।

কালিকাপ্রসাদ দেখল এততেও কিছু হল না। তখন সে বনোয়ারীকে ডেকে খেঁকিয়ে উঠল, 'কেয়া, তু ভি কিম্‌লিস্ বন্ গয়া?'

বনোয়ারী বলল, 'আরে রাম রাম।'

কালিকাপ্রসাদ বলল, 'রাম রাম কেয়া! উসকো কাহে লে আয়া?'

বনোয়ারী অপ্রতিভভাবে মাথা চুলকে গোঁফ হাতিয়ে চাপা গলায় বলে ফেলল, 'বাবুসাহেব হাজার হো হম তো এক কিম্‌লিস্‌কো বাপ হ্যায়।'

কালিকাপ্রসাদের রাগের চোটে কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে। বুড়োটার মনে এই ছিল?

গল্প যদি কিছু বলা হয়ে থাকে, তবে তা এখানেই শেষ। তবু আইনভঙ্গ ক'রে আর দুটি কথা লিখছি।

রাত কিছু হয়েছে ; কয়েক পশলা বৃষ্টির পর মেঘলা ভাঙ্গা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে দিক্ দিগন্তে। বর্ষার গঙ্গা জোয়ারের তীব্র স্রোতে ছুটে চলেছে উত্তরাভিমুখে। গঙ্গা যেন ঝক্‌মকে সোনার পাত।

বস্তিতে অনেক লোক এখানে সেখানে তখনও বসে আছে। তারা খবর পেয়েছে যে কোম্পানি আপাতত ছাঁটাই তুলে নিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই বেচনের জ্ঞান হয়েছে। তার কাছে বসে আছে পাশাপাশি রামদেই আর বনোয়ারী। মাটিতে শুয়ে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি। অদূরেই ঝুনিয়া চোখের জলের দাগ নিয়ে বিহ্বলভাবে বসে আছে। পিঙ্গলবর্ণের ভেঙ্গে পড়া খোঁপা ও ময়লা ঘাড়ের কাছে চাঁদের আলো এসে

পড়েছে। রামদেইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'তু কেতনা বড়া কিম্‌লিস্ বন্ গয়া। তু চলা যানেসে, কিস্‌কো যায়েগা। এ রামদেই কা কি নহি?'

বনোয়ারীর গলাটা কেঁপে উঠল কথা বলতে গিয়ে। তবু যুক্তিপূর্ণভাবে সমঝে দিল, 'হমকো তুহকো সাথ জোড় লে। উসকো কেয়া বোল্‌তা, হ্যাঁ হম্‌তো কিম্‌লিস্‌কে বাপ বন্ গয়া! আরে রাম রাম।' গলার স্বরটা যেন টুপ ক'রে ডুবে গেল অতলে।

বেচন কথা বলতে গেল। কিন্তু পারল না। তার বুকের কাছে কি যেন ঠেলে এল, আর চোখ দুটো ভিজে উঠলো। এটা যে কি ব্যাপার, সেটা ঠিক বুঝে ওঠার আগেই বেচন বলে ফেলল, 'অভি কাঁহা বন্ চুকা। কোই রোজ বন্ যায়েগা।'

ব'লে সে দেখলে ঝুনিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর খাটিয়ার উপর বেচনের বুকের কাছে হাতটা এসে পড়েছে। আরও আশ্চর্য হয়ে দেখল বেচন, ঝুনিয়ার ময়লা গায়ে মুখে গাদা গাদা কি সব লেগে রয়েছে চুনের মত। ও! হিমানীর কৌটোটা বোধ হয় সবটুকু লেবড়েছে আর তাই গন্ধ বেরুচ্ছে। বেচনের আর কথাই বেরোয় না।

অনেকক্ষণ পর সে বলল, 'দেখো, আজকাল কি দুনিয়ামে, এক মজদুর আওরৎ রোনেসে—' বনোয়ারী ব'লে উঠল, 'ব্যস ক'রো। বিমারকে টাইমমে উসব বাত নাহি বলেগা, বোল্ দেতা হ্যাঁয়!'

বেচন বাধা পেয়ে বলল, 'হাই লাও!'

কথাটা শুনে ঝুনিয়ার কান্না দ্বিগুণ হয়ে উঠল। কেননা আজ আর তার কোন সন্দেহ ছিল না। আর অবাক জ্যোৎস্না মায়ের মত বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে।